নিরীশ্বরবাদ ও নৈতিকতা: ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দেবব্রত সরদার

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ দীপায়ন পট্টনায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৫

Certified that the Thesis Entitled

I hereby declare that the work which is being presented in the thesis, entitled **"নিরীশ্বরবাদ ও নৈতিকতাঃ ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা"** Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Dipayan Pattanayak, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned By

Supervisor :

Date: 18/06/25

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate: Debabrata Sardar

Date: 18/06/2025

উৎসর্গ

পরমারাধ্য স্বর্গত

পিতামহী তরঙ্গিণী সরদার

ও

মাতামহী রাজবালা সরদার-এর পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রস্তাবনা

মনুষ্যেতর থেকে মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য শুধু তার বিচারশীলতায় নয় বরং এই স্বাতন্ত্র্য নিহিত রয়েছে কিছু নৈতিক গুণ ও সুকুমার প্রবৃত্তির মধ্যে। এমন কিছু মানবিক গুণ মানব হৃদয় হতে উদ্গত হয় যা তাকে প্রাণীত্বের ক্ষুদ্র সীমার উর্ধ্বে নিয়ে যায়। দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও সে আকাঙ্ক্ষা করে দুঃখের চিরবিলুপ্তি ঘটানো। দুঃখ হতে নিবৃত্তিলাভ ও মোক্ষরূপ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন হয় এক নৈতিক আদর্শের সূত্রে যাপিত জীবনকে আবদ্ধ করা। কিন্তু এই নৈতিক অনুশাসনে জীবনকে বাঁধা সহজ কাজ নয় অথচ কাজটি অত্যন্ত জরুরী। তাই জিজ্ঞাসা নৈতিকতার বাঁধনে জীবনকে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোন সূত্র রয়েছে কি? এমন কিছু বিশ্বাস বা কর্মবিধি কি আছে যেগুলি নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ হতে পারে? এই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে আলোচ্য গবেষণা কর্মের সূত্রপাত।

স্নাতক স্তরে নীতিবিদ্যা পাঠের সময় যে বিষয়গুলি আমার মনে বারে বারে নানান প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে তাহল, যে দেশে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উত্থান তাদের নৈতিক আদর্শ যেখানে বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতিলাভ করেছে সেখানে বর্তমান ভারতের প্রেক্ষিতে তার প্রয়োগ কোথায়? কেন আজ মানুষের মধ্যে এত হানাহানি এত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ঘটনা? মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষার বুদ্ধের দেশে আজ নীতিহীনতা, অবিবেক, অসহিষ্ণুতার প্রাধান্য কেন? এছাড়া যখনই নৈতিক অভ্যাসের প্রসঙ্গ আসে সেখানে কোন না কোন ভাবে ধর্ম, অতিন্দ্রীয় সত্তায় বিশ্বাস, আচারসর্বস্বতা, পৌত্তলিকতার প্রসঙ্গ এনে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কিসের জন্য বা কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার বাসনা আমার স্নাতক স্তর থেকে অন্তরে লালিত হয়েছিল। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের

ব্যবধান বিস্তর। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাতে সুযোগ পাওয়ার সুবাদে যার হাত ধরে আমার কিশোর মনের অবদমিত সুপ্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ধৃষ্টতা দেখাতে সাহস পেয়েছিলাম তিনি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় অধ্যাপক দীপায়ন পট্টনায়ক মহাশয়। তিনি আমার কাছে শুধু একজন তত্ত্বাবধায়কই নন একজন অভিভাবকও বটে। তাঁর সান্নিধ্যে এই দীর্ঘ পথ চলার মধ্যে নানা বিষয়ে আমার অজ্ঞতা দূর করার সুযোগ হয়েছে। স্যারের সাহিত্যবোধ এবং দর্শন বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং উৎসাহ সঞ্চার করেছে গবেষণায়। জীবনের নানা পর্যায়ে রোগ-শোক, ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষত একজন ছাত্রকে সাহস সঞ্চার করে জীবনপথে কিভাবে অগ্রসর হতে হয় তার পাঠদানের একজন আদর্শ দৃষ্টান্ত তিনি। তার আশ্রয়-প্রশ্রয়, সহযোগিতা আমাকে চিরঋণী করেছে। নমস্কার ধন্যবাদ এ জাতীয় শব্দের সীমায় তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা যাবে না।

তত্ত্বাবধায়ক এর পাশাপাশি গবেষণা বিষয়ক উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যা হিসেবে মাননীয়া অধ্যাপিকা কুন্তলা ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। নিয়মিতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার মাধ্যমে আমার গবেষণার অগ্রগতি অবলোকন করে নানা বিষয়ে উপদেশ ও ভাবনা প্রদান করে তিনি এই গবেষণা কর্মকে সুসম্পন্ন হতে সহায়তা করেছেন।

এই গবেষণা কর্মে যারা প্রতিনিয়ত সর্বতোভাবে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রতিম ভাস্কর পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছে তারা হল অসীম মাঝি এবং পলাশ প্রামাণিক।

এই গবেষণা কর্ম করার জন্য যারা আমাক প্রতিনিয়ত প্রেরণা জুগিয়েছেন তাদের নাম না বললে অকৃতজ্ঞ প্রতিপন্ন হব তারা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু এবং বর্তমানে তারা কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মনোজ নস্কর এবং ডঃ পৌলমী তালুকদার। এদের উৎসাহ ও প্রেরণা না থাকলে হয়ত গবেষণা কর্মে আসাই হত না। এই কর্মযজ্ঞ সমাপ্তি পর্বে তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

এছাড়া এই গবেষণা কর্ম সম্পাদন হওয়ার মূলে আমার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা নস্করের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনের সকল প্রকার জটিলতাকে তুচ্ছ করে প্রতিনিয়ত গবেষণায় উৎসাহ জুগিয়েছে সর্বতোভাবে পাশে থেকেছে যার বিভিন্ন সময় ত্যাগ, সমর্থন ও মঙ্গল কামনায় এই কাজটি সমাপ্ত হল তার প্রতি আমার অশেষ ভালবাসা জ্ঞাপন করি।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

প্রত্যেকটি গবেষণা কর্ম কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে অগ্রসর হয়ে থাকে এই গবেষণা কর্মটি ও তার ব্যাতিক্রম নয়। আমার এই গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে তা মূলত ঐতিহাসিক সমীক্ষা এবং ধারণাগত বিশ্লেষণ। ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় বিশেষত নিরীশ্বরবাদী দর্শন পরম্পরায় নৈতিকতার ধারণা কিভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে বা উপস্থাপিত হয়েছে তার একটি রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে এই নিবন্ধে। এই কাজটি করতে গিয়ে মূলত ঐতিহাসিক উপাদান সন্ধানের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান যদি একটি দিক হয় তাহলে দ্বিতীয় দিক হলো ধারণাগত বিশ্লেষণ। ঈশ্বরবাদী দর্শনের যে নৈতিকতা বা নৈতিক জীবনের যে উপদেশ তার সূত্র এবং নিরীশ্বরবাদী দর্শনগুলির যে উপদেশ তার সূত্র এই উভয়বিধ সূত্র অনুসরণ করে দেখানো হয়েছে যে নৈতিক জীবনের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের সম্পর্ক কেবল আকস্মিক নাকি আবশ্যিক বা অনিবার্য। এই সমস্ত বিষয়ে একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ বা দার্শনিক বিশ্লেষণ এর পথ গ্রহণ করা হয়েছে এই গবেষণা কর্মে।

বিষয়সূচী

পৃষ্ঠা

ভূমিকা **১-৩৭**

প্রথম অধ্যায়- জড়বাদী চার্বাক পরম্পরায় নৈতিকতা **৩৮-৬২**

১) সূচনা

১.১) চার্বাক পরম্পরায় নানা সম্প্রদায়

১.২) প্রত্যক্ষৈকমাত্রপ্রমাণবাদ

১.২.১) অনুমান,আগমের প্রমাণত্ব নিরসন

১.৩) চার্বাক জড়বাদ

১.৩.১) জড়বাদ ও ভূতচতুষ্টয়বাদ

১.৩.২) যদৃচ্ছবাদও স্বভাববাদ

১.৩.৩) ভূতচৈতন্যবাদ ও দেহাত্মবাদ

১.৪) চার্বাক নীতিতত্ত্ব

১.৪.১) নৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বেদ ও ঈশ্বর অস্বীকার

১.৪.২) রাজাজ্ঞাই নিয়ম

১.৪.৩) স্থুল আত্মসুখবাদী নৈতিকতা

১.৪.৩.১) অপব্যাখ্যার নিরসন

দ্বিতীয় অধ্যায়- নাস্তিক-নৈতিকতার জৈন ঐতিহ্য **৬৩-৮৮**

২.১) সূচনা

২.২) জৈন তত্ত্ববিদ্যা

২.২.১) জৈনের অনেকান্তবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

২.৩) নীতিচিন্তায় ত্রিরত্নের স্থান

২.৩.১) পঞ্চমহাব্রতের আদর্শ

২.৩.২) কিছু অবশ্যপালনীয় কর্তব্য

২.৪) ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি

২.৪.১) ঈশ্বরবিশ্বাস কৈবল্যের পূর্বাঙ্গ নয়

তৃতীয় অধ্যায়- হিতবাদী নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা রূপে বৌদ্ধদর্শন **৮৯-১২৩**

৩.১) সূচনা

৩.২) নৈতিকজীবনের ভিত্তি: আর্যসত্যচতুষ্টয়

৩.২.১) নৈতিকযাপনে অষ্টাঙ্গিকমার্গ

৩.৩) নৈতিকজীবনের প্রতিসঙ্গী হিসেবে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা

৩.৪) নৈতিক জীবনাচারের পরম পরাকাষ্ঠা হিসাবে ব্রহ্মবিহার ভাবনা

৩.৫) বৌদ্ধ ঐতিহ্যে নারীবাদী নৈতিকতা

৩.৬) বৌদ্ধ পরম্পরায় নিরীশ্বরবাদ

৩.৬.১) ঈশ্বর বিষয়ে তথাগতের অভিমত

৩.৬.২) নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় নাগার্জুন

৩.৬.৩) ঈশ্বর খন্ডনে ধর্মকীর্তি

চতুর্থ অধ্যায়- সৃষ্টি ও নৈতিকতার ব্যাখ্যায় সাংখীয় নিরীশ্বরবাদ ১২৪-১৫১

৪.১) সূচনা

৪.২) জগতসৃষ্টির ব্যাখায় সাংখ্যদর্শন

৪.২.১) সৎকার্যবাদ প্রসঙ্গ

৪.২.২.) সাংখ্যের তত্ত্বসকল

৪.২.২.১) সাংখ্যের মূলতত্ত্বদ্বয়: প্রকৃতি ও পুরুষ

৪.২.৩) জগতের অভিব্যক্তি

৪.৩) সৃষ্টিকার্য ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষ

৪.৪) সাংখ্যের নীতিতত্ত্ব

৪.৪.১) তত্ত্বজ্ঞান-ই কৈবল্যলাভের উপায়

৪.৫) বিজ্ঞানভিক্ষুর প্রসঙ্গ এবং তার সংশয় নিরসন

৪.৬) সেশ্বর সাংখ্য ও ঈশ্বরের ধারণার বিকল্প ব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়- পূর্বমীমাংসায় নিরীশ্বরবাদী নৈতিকতা ১৫২-১৬৭

৫.১) সূচনা

৫.২) মীমাংসা দর্শনে নিরীশ্বরবাদ

৫.২.১) কুমারিলের ঈশ্বর অস্বীকৃতি

৫.২.২) ঈশ্বরবাদ খন্ডনে পার্থসারথি

৫.২.৩) ঈশ্বর নিরাকরণে প্রভাকর

৫.২.৪) শব্দের নিত্যতা দ্বারা বেদের নিত্যতা প্রতিষ্ঠা

৫.৩) মীমাংসা দর্শনে নৈতিকতা

৫.৩.১) নৈতিক জীবনাচারে যাগ, হোম, দানের প্রসঙ্গ

৫.৪) ঈশ্বর নন অপূর্ব-ই কর্মফলদাতা

৫.৪.১) প্রভাকরসম্মত নিয়োগ অপূর্বের নামান্তর

উপসংহার **১৬৮-১৮০**

গ্রন্থপঞ্জী **১৮১-১৮৫**

নিরীশ্বরবাদ ও নৈতিকতা: ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা।

ভূমিকা

দর্শন চিন্তার যে পাশ্চাত্য ধারা লক্ষ্য করা যায় তা থেকে দর্শন চিন্তার ভারতীয় ধারাটি নানা কারণে অনন্য। এই অনন্যতা যেমন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমনি উৎসভূমিতেও। যে শব্দটিকে ঘিরে পাশ্চাত্যে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত সেই 'ফিলোসফি'র আক্ষরিক অর্থ জ্ঞানানুরাগ। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কী রহস্য অবগুণ্ঠিত রয়েছে তার উন্মোচন প্রাচীন যুগ থেকে পাশ্চাত্য চিন্তকদের প্রলুব্ধ করেছে, জাগতিক ঘটনারাজি তাদের বিস্মিত করেছে এবং সঞ্চার করেছে জগত রহস্যের জাল ছিন্ন করার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার। এই জিজ্ঞাসা অনেকখানি অহৈতুকী; যাপিত জীবনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। ভারতীয় পরম্পরায় যাকে দর্শন বলা হয় তা কিন্তু ঠিক জ্ঞানানুরাগ বা দর্শনানুরাগ নয়, বরং একপ্রকার অবলোকন বা অন্তর্দৃষ্টিলাভের প্রক্রিয়া যা বৈচিত্র্যের অন্তরালে থাকা মূলতত্ত্বের প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই দার্শনিক মনন অহেতুক বা জীবনবিমুখ নয়। ভারতবর্ষের দর্শন চিন্তার সূত্রপাত যাপিত জীবনের প্রয়োজনকে অবলম্বন করে। সাংসারিক জীবনে নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয় মানুষকে, জরা ব্যাধি মৃত্যুর আশঙ্খা যেমন মানবকে পীড়িত করে তেমনি সংসার জীবনের গ্লানি তাপ তার চিত্তকে ব্যথিত করে। এই দুঃখ যন্ত্রণা দ্বন্দ্বের তাপ হতে মুক্তি পেতে চায় মানুষ। সে সন্ধান করে সেই উপায় যা তাকে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি দেবে। দুঃখ থেকে এই অত্যন্ত মুক্তি কিভাবে সম্ভব তা সন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিক চিন্তার সূচনা ঘটেছে ভারতীয় মনীষীদের ভাবনায়।

কাজেই ভারতীয় পরম্পরায় দর্শন আসলে একপ্রকার জীবন জিজ্ঞাসা। এই জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ধর্মজিজ্ঞাসার জন্ম। সুতরাং ইউরোপীয় পরম্পরায় যেভাবে দর্শনের পৃথক পৃথক শাখা হিসাবে অধিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যা নীতিবিদ্যা এসবের জন্ম হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যে তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আন্বিক্ষীকিবিদ্যা এসবের জন্ম সেভাবে হয়নি। বরং জীবন জিজ্ঞাসার অঙ্গ হিসেবে জন্ম নিয়েছে তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র প্রভৃতি। যেহেতু জীবনজিজ্ঞাসা বা মুমুক্ষুর মুক্তি জিজ্ঞাসা থেকে প্রায় সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের জন্ম তাই ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির প্রতিটি হলো এক একটি মোক্ষশাস্ত্র। 'শাস্ত্র' কথাটি এসেছে 'শাস্' ধাতু থেকে যার অর্থ শাসন বা উপদেশ। শাস্ত্র কিছু বিধি ও নিষেধের মধ্য দিয়ে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান দেয়। তেমনই মোক্ষশাস্ত্রগুলি মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে ভারতীয় দর্শনে জন্ম ধর্মশাস্ত্রের। ধর্ম শব্দটির প্রায়শই সম্প্রদায় বিশেষে আচরিত প্রচারমূলক ধর্মকে বোঝালেও বৈদিক পরম্পরায় ধর্ম নীতিরই বাচক। তাই পাশ্চাত্যে যাকে এথিক্স বলা হয় ভারতীয় পরিভাষায় তা প্রায় ধর্মশাস্ত্রের সমার্থক।

পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যা বা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র উভয়ের লক্ষ্য হল সমাজ জীবনে নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির আচরণকে নৈতিকতার বাঁধনে আবদ্ধ করতে না পারলে সমাজ জীবনও যে সুস্থ মসৃণভাবে চালিত হতে পারে না সেই উপলব্ধি থেকে উভয় শাস্ত্রের জন্ম। এখন প্রশ্ন হল সমাজে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি তার আচরণকে নীতিসম্মত পথে চালিত করবে কেন? অর্থাৎ একজন ব্যক্তির নৈতিক জীবন যাপনের প্রণোদন কি হবে? প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করলে তা হবে এরূপ- নৈতিক বাধ্যতা বোধের উৎস কী? আমি কেন নৈতিক কর্মে নিয়োজিত হব বা একজন ব্যক্তির ধর্মের জীবনযাপনের প্রণোদন কী হবে এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান যেমন পাশ্চাত্য দর্শনে হয়েছে তেমনই ভারতীয় দর্শনেও হয়েছে।

একজন ব্যক্তি তার জীবন কেন নৈতিকভাবে যাপন করবে তার উত্তর দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা একমত হতে পারেননি। পরার্থ প্রবৃত্তিকে নৈতিক কর্ম বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনে। স্থূল সুখবাদী ছাড়া পাশ্চাত্যে প্রায় সকল নৈতিক মতবাদই পরহিতে কর্মকে নৈতিক কর্ম বলে অনুমোদন করেন। তবে ঠিক কেন পরহিতে বা পরকল্যাণে নৈতিক কর্তার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত সেই প্রশ্নে পাশ্চাত্য নীতি-চিন্তকরা একমত হতে পারেননি। এব্যাপারে কর্তব্যবাদীদের (Deontologist) দাবি থেকে উদ্দেশ্যবাদীদের (Teleologist) দাবি যেমন আলাদা, তেমন-ই স্থূল সুখবাদীদের থেকে উপযোগবাদীদের বক্তব্য ও আলাদা। কর্তব্যবাদীরা পরার্থে কর্মকে কর্তব্য বলে মানেনি কিন্তু তা কোন ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়। এই কর্তব্যবাদীদের মধ্যে কান্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কান্টের মতে নৈতিক জীবন হল বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা চালিত জীবন। সুখ শান্তির মত কোন প্রাকৃতিক প্রণোদন (Natural Inclination) নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ হতে পারে না। একদিকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি অন্যদিকে সদিচ্ছা দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ নৈতিক কর্ম করে। এই নৈতিক কর্ম তার কাছে বিবেকের নির্দেশ, এই নির্দেশকে অমান্য করা যায় না শুধুমাত্র কর্তব্য হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে হয়। কাজেই অন্যের জন্য মানুষ যখন কিছু করে তখন সে কোন প্রাপ্তির জন্য ওই কাজে ব্রতী হয় না, কর্তব্যের জন্য ওই কর্তব্য সম্পাদন করে সে।

এই কর্তব্যবাদের বিপরীতে রয়েছে ফলাফল সাপেক্ষবাদ সেখানে ফলের গুরুত্ব বিচার করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। এই ফল কোথাও আত্মসন্তুষ্টি দেয় কোথাও পরসন্তুষ্টি। আত্ম বা পর কার উদ্দেশ্য পূরণ করলে একটি কর্ম নীতিগতভাবে ভালো হবে বা নৈতিক কর্ম হবে এই প্রশ্নে আত্মবাদী থেকে পরবাদী রয়েছে পৃথক অবস্থানে। আত্মবাদীর কাছে আপন সুখ বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সকল কর্মের প্রণোদন হলেও পরবাদী

উপযোগবাদীরা পর সুখের কথা বিচারে রাখেন। উপযোগবাদের যেমন নানারূপ আছে, তেমনই উপযোগের ব্যাখ্যাও সর্বত্র এক নয়। তথাপি পাশ্চাত্য উপযোগবাদীদের প্রায় সবাই সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের আদর্শটিকে অনুমোদন করেন। যা যতবেশী উপযোগী, তা যে ততবেশী গ্রহণযোগ্য এমন একটা ধারণা সাধারণ্যেও প্রচলিত। লৌকিক ধারণা যখন দার্শনিকতত্ত্বের ছত্রছায়া লাভ করে, তখন সেই তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়। পাশ্চাত্য উপযোগবাদের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটেছে। সুখ যে তার ঈপ্সিত সেই সত্যটিকে, মানুষ যেমন লুকোতে পারে না, তেমনি স্থূল আত্মসুখের মধ্যে স্বার্থপর জীবন যাপনও সামাজিক জীব হিসাবে তার অনুমোদন পায় না। অন্যের প্রতি কর্তব্যের দায়ও সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে সমস্ত রকম বাহ্য প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে কর্তব্যের জীবন যাপনের কান্টীয় আদর্শকে মেনে নিতেও সে গররাজি। এই উভয়সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার একটা চেষ্টা সে খুঁজে পায় ইউটিলিটিতত্ত্বে। এই তত্ত্ব আত্মসুখের সঙ্গে পরসুখের এমন এক মেলবন্ধন ঘটাতে চায় যেখানে স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে মানুষকে পরার্থসিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হয়।

নৈতিকতার স্বপক্ষে ভারতীয় দর্শনে কী যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা দেখা যাক। ভারতীয় দর্শনে পরার্থে কর্মের কথা যে গ্রন্থে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে তা হল শ্রীমদ্ভগবত গীতা। নৈষ্কর্মের বিরোধিতা করে গীতাকার কর্মের জীবনযাপনের উপদেশ করেছেন; আর যে কর্মকে তিনি মানুষের আদর্শ কর্ম হিসেবে দেখেছেন তাহল নিষ্কাম কর্ম। ফলের অভিলাষ থেকে মুক্ত হয়ে এবং কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাই হল নিষ্কাম কর্ম। এই আদর্শে অনুষ্ঠিত কর্ম লোকহিতের-ই নামান্তর। এই লোকসংগ্রহের পথই কর্মের গীতোক্ত পথ। সুতরাং পরার্থে কর্মই ভারতীয় ঐতিহ্য। তবে এটি নিছক কর্তব্যের জন্য কর্তব্য রূপ পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবি করাটা ঠিক হবে না। যদিও গীতাকার স্পষ্ট বলেছেন-

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি"।।

কী উদ্দেশ্যে বা কোন অভিলষিত বস্তুকে পাওয়ার লক্ষ্যে নৈতিক বা ধর্মীয় জীবনের অনুগমন ভারতীয় পরম্পরায় তার একটাই উত্তর মোক্ষ বা মুক্তি। ভারতীয় ঐতিহ্যে মোক্ষই নৈতিকতার প্রেরণা মোক্ষই পরম পুরুষার্থ আর ধর্ম বা নৈতিকতা হল তা লাভের উপায়। এ বিষয়ে ঋক্‌বেদে স্পষ্ট ঘোষণা- 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' কাজেই জগতের হিত বা পরার্থে কর্মের অন্যপ্রান্তে যে আত্মমুক্তির মহতী প্রেরণা রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। মোক্ষই সেই পরম লক্ষ্য যা ব্যক্তিকে শুধু বিশেষ বিশেষ কর্মে প্রণোদিত করে না, নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলতে এক কথায় জীবনের নৈতিক ধারাকে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মোক্ষ বড়জোর নৈতিক জীবনের প্রেরণা হতে পারে। একে নৈতিক জীবন-যাপনের স্বপক্ষে বৌদ্ধিক যুক্তি বলে দাবি করা যায় না। প্রথমত, যুক্তি বলতে যদি তর্কশাস্ত্রীয় ভিত্তিকে বোঝায় তাহলে একথা স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় যে মোক্ষ নৈতিক জীবনের ওইরকম যৌক্তিক ভিত্তি হতে পারে না। কেন মানুষ নৈতিক জীবনকে বেছে নেবে তার স্বপক্ষে আদৌ কোন হেতুবাক্য এই উত্তর থেকে পাওয়া যায় না। কাজেই নৈতিক জীবনের বৌদ্ধিক ভিত্তিভূমি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কী হতে পারে তা বিচার্য বিষয়। তবে সে বিচারের পূর্বে একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যায় প্রশ্নটি হল মোক্ষ কি আদৌ ধর্মীয় বা নৈতিক জীবনের একটি প্রেরণা হতে পারে? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক, কারণ বিষয় কোন কাজের প্রেষণা বা প্রেরণা হতে পারে তখনই যদি ওই বিষয়টি আকর্ষণীয় বা মূল্যবান হয়। নৈতিক জীবন বা ধর্মের জীবন এই অর্থে আকর্ষণীয় নয়। প্রশ্ন হল মোক্ষ কি নৈতিক জীবনের তুলনায় আকর্ষণীয় বা মূল্যবান?

প্রশ্নটির আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের ধারণাটি সর্বত্র একরকম নয় তা সত্ত্বেও নানা সম্প্রদায়ের মোক্ষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিন্দুতে এসে মিশে যায়। কিছু সাধারণ মত রয়েছে যেগুলিতে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমত্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন মোক্ষ হল এক উত্তেজনা রহিত, নির্মল এবং অন্তহীন সুখ ও প্রশান্তির অবস্থা। এ হল সর্বাধিক দুঃখ যন্ত্রণার চিরতরে নিরসন। জন্ম মৃত্যু চক্রের চিরসমাপ্তি ঘটে এই মোক্ষে। এ এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ তার চির ইপ্সিত ঈশ্বরাদি পরম লক্ষ্যে উপনীত হয় বা সান্নিধ্য লাভ করে। এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে মোক্ষ তত্ত্বগত এক অবস্থা যাকে নানাভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো সব দিক থেকে বিবেচনা করে মোক্ষকে কী আকর্ষণীয় বলে বর্ণনা করা যায়? শাশ্বত সুখ ও প্রশান্তির জীবন কি ধর্মের জীবন থেকে অধিক আকর্ষণীয়? অবশ্যই নয় সব ক্ষেত্রে তো নয়ই। সুখ প্রশান্তি এসব তখনই অর্থবহ হয় যখন যাপিত জীবনটি প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে, কারণ অসুখের মধ্যেই মানুষ সুখ খোঁজে, অশান্তি থেকে মুক্তির জন্যই শান্তির খোঁজে উন্মুখ হয়। দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেই সন্ধান করে প্রশান্তির। কেউ যদি শাশ্বত সুখের এক জীবন লাভ করে তাহলে সেই জীবন আর আকর্ষণীয় থাকে না। পরিবর্তনহীন সে জীবন একঘেয়ে ক্লান্তিকর পথ চলায় পর্যবসিত হয়। শাশ্বত জীবনের মধ্যে সেই অর্থে কোন চাকচিক্য থাকতে পারেনা। সুতরাং যা শাশ্বত তাই যে আকর্ষণীয় হবে- আমাদের অভিজ্ঞতা সে কথা বলে না। শাশ্বত প্রশান্তির অবস্থা চিরমঙ্গলের অবস্থাও নয়। মূল্যের দিক থেকে বিচার করলেও মোক্ষ ধর্মের থেকে আবশ্যিকভাবে উচ্চতর নয়। যদি মোক্ষকে উচ্চতর বলা হয় তবে প্রশ্ন উঠবে কেন তা উচ্চতর? সম্ভবত এর উত্তরে মোক্ষবাদীরা বলবেন এটিই পরমমূল্য বা লক্ষ্য এর থেকে মূল্যবান কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় ঠিক কি কারণে তারা মোক্ষকে পরম মূল্যের মর্যাদা দেন? কোন অর্থে মোক্ষ শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য বা নিঃশ্রেয়স? কেনই

বা ধর্মকে সেই নিরতিশয় শ্রেয়ের মর্যাদা দেওয়া যাবে না? ধর্মকেই কি পরম মূল্য বলা যায় না? ঘুরে ফিরে উত্তর কিন্তু এক মোক্ষ শাশ্বত সুখের জীবন দেয়, ধর্ম যা দিতে পারেনা। মোক্ষকে লক্ষ্য করে ধর্মকে তার উপায় বলে দাবি করা একটি কুসংস্কার বলে মনে করা হয়। আর এই কুসংস্কারকে হাতিয়ার করেই ধর্মের তুলনায় মোক্ষকে উচ্চতর স্থান দিই আমরা। কিন্তু লক্ষ্যকে উপায়ের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া সব ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে আমরা গান্ধীর কথা ভাবতে পারি, তাঁর রচনায় বাপুজী লক্ষ্য ও উপায়কে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। আবার নৈতিকতা বা ধর্মের পক্ষে যদি যুক্তির কথা ওঠে তাহলে মোক্ষর ক্ষেত্রেই বা সেই যুক্তি দাবি করা হবে না কেন? ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির দাবি পেশ করে মোক্ষের পক্ষে যুক্তির দাবীকে ছাড় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কারণ মোক্ষকে পরম লক্ষ্য হিসেবে চিরকালের জন্য স্থির করে দেওয়া একটি কুসংস্কার বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য গান্ধারীর আবেদন কবিতায় কবি লিখেছেন-

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু

মহারাজ,নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু

ধর্মেই ধর্মের শেষ।

কাজেই নৈতিক জীবনের কোন পূর্বাঙ্গ আছে না কি নৈতিকতা রক্ষা কেবল নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থেই এককথায় তার সদুত্তর দেওয়া সমস্যার। এখানে বলা দরকার নৈতিকতা শব্দটি ভারতীয় দর্শনের কোন মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়নি। ভারতীয় শাস্ত্রে ব্যবহৃত যে শব্দটি নৈতিকতার কাছাকাছি বলে ধরতে পারি সেটি হচ্ছে ধর্ম। তবে ধর্ম একটি বহুমাত্রিক শব্দ। সাধারণ অর্থে যাকে 'Religion' বলা হয় তা থেকে শুরু করে শব্দটির এমন গভীর থেকে গভীরতর অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় যার সঙ্গে পূজা প্রার্থনার ইত্যাদি

প্রক্রিয়ার দূর-দূরান্তের সম্বন্ধও নেই। ঠিক কোথায় ধর্ম নৈতিকতার বাচক তা বুঝে নিতে গেলে শব্দটি ব্যবহারের ইতিহাসকে বিচারে রাখতে হবে। ধর্ম শব্দটি যদিও বহু অর্থে ব্যবহৃত সেই সমস্ত অর্থের মধ্যে কোনটি প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এখন দেখা যাক ধর্ম শব্দটি ভারতীয় ঐতিহ্যে ঠিক কোন কোন অর্থের বাচক হয়।

'ধর্ম' শব্দটির নানা অর্থ

বেদ উপনিষদের যুগ থেকে ভারতবর্ষ যে ধর্মের উত্তরাধিকার লাভ করেছিল সে ধর্ম যেমন সম্প্রদায় ভিত্তিক ছিল না তেমনি ঈশ্বর অভিমুখীও ছিল না; তা ছিল প্রয়োজন ভিত্তিক। দৈহিক আসক্তি এবং প্রজাতি রক্ষার প্রয়োজনে কামকে প্রথম পুরুষার্থ হিসাবে গ্রহণ করে মানুষ। আর এই কাম চরিতার্থ করার জন্য যেহেতু অর্থের প্রয়োজন হয় সেহেতু কাম ও অর্থ এ দুটি মানুষের কাছে মুখ্য পুরুষার্থ হয়ে দাঁড়ায়। সেই অর্থই যে অনর্থের মূল হতে পারে, কামনার রশিতে টান দিতে না পারলে তা যে সুখের পরিবর্তে অসুখ টেনে আনবে, তা অচিরেই উপলব্ধি করে মানুষ। এই উপলব্ধি থেকেই পুরুষার্থ হিসাবে ধর্মকে নির্বাচন করে সে। কাম ও অর্থের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করার পথে এ ছিল প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের এক হিসেবি সিদ্ধান্ত। ক্রমশঃ মানুষের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয় যে শুধুমাত্র অভ্যুদয় বা জাগতিক সুখের সুচারু ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মের ভূমিকা সমাপ্ত হতে পারে না তাই অভ্যুদয়ের পাশাপাশি নিঃশ্রেয়সের ধারণাটি বিকশিত হয়। জাগতিক সুখের সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক আনন্দ লাভের পথ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার শুরু হয় ধর্মের। তবে মোক্ষের উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার যারা করেছেন তাঁদের সংখ্যা কোটিকে গুটিক[১]; সাধারণ

[১] ভট্টাচার্য, কালিদাস, *ভারতীয় সংকৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত*, পৃ. ৩।

ভারতীয়দের কাছে ঐহিক সুখেই ছিল মুখ্য আর ধর্ম ছিল সেই সুখকে নিরবচ্ছিন্ন করে তোলার উপায়। ক্রমশ এই ধর্ম রূপান্তরিত হয় স্বধর্ম, বর্ণধর্ম, রাজধর্ম, দেশধর্মে। স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে জাগতিক জীবনকে ছন্দময় করে তোলার পাশাপাশি অপবর্গ বা পরামুক্তির পথকে মসৃণ করে তোলার দায়বর্তায় ধর্মের উপর। এই ধর্ম, যা একসময় একান্তই জীবনমুখী জগৎমুখী ছিল, তা ক্রমশ পরা-জাগতিক সত্তা অভিমুখী হয়ে ওঠে। ধর্মের এই বিবর্তনকে উপলব্ধি করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন 'ধর্ম' শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন প্রাচীন যুগ থেকে ভারতের ইতিহাসে ঘটে চলেছে তার একটি আনুক্রমিক বিবরণ তুলে ধরা। প্রথমেই একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, 'ধর্ম' একটি ঐতিহ্যশালী বহুল প্রচলিত বহুমাত্রিক শব্দ। বেদ, উপনিষদ থেকে রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা ইত্যাদি স্মৃতি, শ্রুতি ও পুরাণে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে শব্দটি। বৌদ্ধ, জৈন, মীমাংসা ও বেদান্ত ইত্যাদি নাস্তিক্যবাদী ও আস্তিক্যবাদী ঐতিহ্যে ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ সব ব্যবহারে 'ধর্ম' একই অর্থের দ্যোতক হয়নি। কোথাও সদাচার, কোথাও প্রতিশ্রুতি রক্ষা, কোথাও বেদবিহিত কর্ম, কোথাও নৈতিক জীবন-যাপন, কোথাও নীতি, কোথাও গুণ, কোথাও কর্তব্য প্রভৃতি নানা অর্থে 'ধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যে। শব্দটির ওই নানার্থক প্রয়োগের উপর আলোকপাত করা দরকার।

বেদ ও উপনিষদে 'ধর্ম' শব্দের ব্যবহার

প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদের মন্ত্র-ভাগে ধর্মকে 'ঋতং সত্যং' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২] ধর্ম সেখানে প্রাকৃতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহের মতোই সত্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই ধর্মের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– "যো বৈ স ধর্ম: সত্যং বৈতৎ"[৩]

---

[২] শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, *ভারতীয় ধর্মনীতি ও তার কয়েকটি দিক*, অমিতা চ্যাটার্জী সম্পাঃ, পৃ. ২৯।

[৩] বৃহদারন্যক উপনিষদ- ১/৪/১৪।

অর্থাৎ যা ধর্ম, তাই সত্য। ধর্ম ও সত্য যে এক তার উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যকের অন্য একটি মন্ত্রেও– "তস্মাৎ ধর্মাৎ পরং নাস্ত্যথো...ভবতি।"[৪] ঋক্ বেদ সংহিতায়ও বলা হয়েছে- 'ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ...'[৫]। অবশ্য 'ধর্ম' ও 'সত্য' শব্দ দুটির ব্যবহারিক অর্থ গ্রহণ করে সত্যের সাথে ধর্মের কিঞ্চিৎ ব্যবধানও মানা হয়েছে কোথাও কোথাও। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদ যখন উপদেশ করে 'সত্যং বদ। ধর্মং চর...'[৬] তখন আসলে সত্য কথন থেকে আর ধর্মীয় আচরণ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার উপদেশই করা হয়। 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায়, 'যাহা ধারণ করে'। যা ব্যক্তি ও সমাজকে পোষণ ও পালন করে- এককথায় যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে তাই ধর্ম। আর এই অর্থে বিশ্বের প্রধান ধারক হলেন, ব্রহ্মা বা পরমেশ্বের। ঋক্ বেদে পরমেশ্বরের বয়ানে বলা হয়েছে- 'পিতুং ন স্তসং মহো ধর্মাণ তবিষীম'[৭] অর্থাৎ আমি ত্বরান্বিত হয়ে মহান সকলের ধারক। ছান্দোগ্য উপনিষদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- সকল লোক যাতে সম্ভেদ-মিশ্রণ-বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত না হয়, সেজন্য পরমেশ্বরই সেতুস্বরূপ (বাঁধ), তিনিই হলেন ধারক, আর যার সাহায্যে তিনি এই জগতকে ধারণ করেন তাই হল ধর্ম।[৮] এই ধর্ম কেমন করে মনুষ্য সমাজের সার্বত্রিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, তার পরিচয় রয়েছে উপনিষদে। পরমেশ্বর জগতের শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নিয়েও সমাজকে সুষ্ঠভাবে চালানো সম্ভব হচ্ছিল না, তাই তিনি সৃষ্টি করলেন বৈশ্য। অবশেষে বাকি তিন শ্রেণীর পালন ও পোষণের জন্য শূদ্রও সৃষ্টি করলেন

---

[৪] তদেব।

[৫] ঋকবেদ সংহিতা- ৫/৬৩/৭।

[৬] তৈত্তিরীয় উপনিষদ– ১/ ১১/১।

[৭] ঋকবেদ সংহিতা- ১/১৪৮/১।

[৮] শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, *ভারতীয় ধর্মনীতি ও তার কয়েকটি দিক*, অমিতা চ্যাটার্জী সম্পাঃ, পৃ. ৩০।

তিনি।[৯] এই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেও স্রষ্টার সন্তুষ্টি হল না, সমাজে বিশৃঙ্খলা থেকেই গেল। এই অবস্থায় স্রষ্টাকে আবারও বসতে হল সৃষ্টির তপস্যায়। সকলের ভালোর জন্য এবার তিনি সৃষ্টি করলেন ধর্ম।

প্রশ্ন থেকে যায় জগতের শৃঙ্খলা রক্ষায় ধর্মের প্রয়োজন হয় কেন? ওই কাজে ক্ষত্রিয় রাজারাই তো যথেষ্ট। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই তো ক্ষত্রিয়ের কাজ, ওই কাজ সম্পাদন করতে পারলে জগত আপনা আপনি শৃঙ্খলিত হবে। এরকম আশঙ্কার নিরাশ করে উপনিষদে বলা হয়েছে– 'তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্'।[১০] এখানে দ্বিতীয় 'ক্ষত্র' শব্দটির অর্থ হল নিয়ামক। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় রাজাকে ধর্মই নিয়ম-যুক্ত করে। ধর্মই হল ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয়, রাজন্যবর্গের রাজন। ধর্মের মধ্যে রয়েছে এমন এক ক্ষমতা যা দুর্বলকেও বলীয়ান করে-বলবত্তোর শত্রুকে বিজয় করতে সক্ষম করে অর্থাৎ ধর্মই শ্রেষ্ঠ, তদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নেই।

মুনি যাজ্ঞবল্ক্য ধর্মের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "অয়মেব পরমো ধর্মঃ যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্"[১১] অর্থাৎ যোগের দ্বারা আত্মদর্শন পরম বা চরম ধর্ম। এ বাক্যেই ধর্মের চরম লক্ষ্য বা আধ্যাত্মিক ভিত্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা হল আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শনের পথ প্রশস্ত করে দম, অহিংসা, স্বাধ্যায় ও দানের মতো কর্ম। আবার মহানারায়ণ উপনিষদে বলা হয়েছে- "ধর্মে বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি।"[১২] অর্থাৎ ধর্মই সকল জগতের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি। প্রজাগণ শ্রেষ্ঠ ধার্মিক জনের কাছেই যায়, ধর্মের দ্বারা পাপকে বিদূরিত করে।

---

[৯] "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়তঃ।।"- ঋগ্বেদ সংহিতা- ১০/৯০/১২।

[১০] বৃহদারণ্যক উপনিষদ - ৩/ ৪।

[১১] যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা - ১/৮।

[১২] মহানারায়ণ উপনিষদ্- ২২/১।

রামায়ণ ও ধর্মের ধারণা

রামায়ণের সমাজে যে সাধারণ নীতি ধর্ম, তার মধ্যে বেদবিহিত ধর্মই হল প্রধান। রামায়ণে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, অথবা সন্ধ্যা উপাসনার কথা উল্লেখ ছিল। তবে রামায়ণে সাধারণ ধর্ম বলতে 'সত্য'-কে বোঝানো হয়েছে। এই সত্য বলতে শুধুমাত্র সত্য কথা বলাকে বোঝানো হয়নি। এখানে 'সত্য' বলতে ব্যাপক অর্থে বোঝান হয়েছে 'সত্যরক্ষা'। সত্য থেকে সত্যরক্ষা সামান্য পৃথক। সত্য বলতে অহিংসা, ক্ষমা, উপকার, শম, দম, শীল ইত্যাদিকে বোঝান যেতে পারে। আর সত্যরক্ষার সাথে মিশে রয়েছে ক্ষত্রিয়ধর্ম ও বর্ণধর্ম। প্রতিজ্ঞা দিয়ে বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাই বিধেয় বা কর্তব্য। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ধন, মান, প্রাণ সবই ত্যাজ্য। সত্যরক্ষার মধ্যে স্নিগ্ধ সত্যের চেয়েও রয়েছে অনেক বেশী দৃঢ়তা।[১৩]

রামায়ণের কালে ত্রিবর্গবাদ প্রচলিত ছিল। এই ত্রিবর্গ-বাদের প্রথম বর্গটি হল 'ধর্ম'। এখানে 'ধর্ম' বলতে শুধুমাত্র পূজার্চনা, দৈব-সাধনাকে বোঝাত না; বোঝাত এমন এক নিয়ম শৃঙ্খলাকে যা মানুষের মধ্যে সমস্ত জগতের জন্য শুভৈষণা তৈরি করে। মানুষ যেন স্বার্থপর ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে, সমগ্র জগতের মানুষের জন্য শুভ কামনা করতে পারে, এই ছিল প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির আদর্শ। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কতকগুলি চিরন্তন নীতি মেনে চলেন; সেগুলি হল- সত্য, অহিংসা, ঋজুতা, প্রিয়বাদিতা, সমদর্শিতা। এই সব শাশ্বতগুণ ঘনীভূত হয়ে যখন এক চরম মহত্বের জন্ম নেয়, তখনই বুঝতে হবে মানুষ ত্রিবর্গের প্রথম বর্গে স্থিত, অর্থাৎ মানুষটি ধর্মের পথে আছে। যা ভারতীয় ধর্মনীতি তাই রামায়ণের নীতি ধর্ম। যা যা নিজের ভালো লাগে, তা অন্যের হোক অথবা যা নিজের কাছে অপ্রিয়, তা যেন

---

[১৩] ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *রামায়ণের নীতিধর্ম,* অমিতা চ্যাটার্জী সম্পাঃ,পৃ. ৯৯–১০৩।

অন্যের ভাগ্যেও না ঘটে– এইরকম সর্বতোমুখী হিতৈষণা এবং নিজের ওপর সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণই হল ধর্মের চালিকা শক্তি। রামায়ণে এই ধর্মের কথাই বলা হয়েছে।[১৪]

ধর্ম ও মহাভারত

মহাভারতের মূল কথাই হল 'ধর্ম'। একে 'ধর্মশাস্ত্র' বলা হয় আবার 'জয়-শাস্ত্র' ও বলা হয়– "যতো ধর্মস্ততো জয়:"[১৫]। মহাভারত মহাকাব্যে 'ধর্ম' পদটির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়- ধারণ করা, হিতসাধন, কর্তব্য, সদ্‌গুণ, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ইত্যাদি। মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে- ধর্মই সনাতন সুখ। ধর্ম কখনও বিফল হয় না। মহাভারতের শান্তি-পর্বে বলা হয়েছে-

"ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।

যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তঃ স্বধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।"[১৬]

যা ধারণ করে তাই ধর্ম, ধর্মই লোকসকল ধারণ করে। সমাজ যেমন একদিকে কতকগুলি নীতি, বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় ঠিক তেমনই ব্যক্তি কতকগুলি সদ্‌গুণ, নীতি অবলম্বন করে জীবনযাপন করে। ব্যক্তির ধারক ওই সদ্‌গুণসমূহ ধর্ম। মহাভারতের শান্তি পর্বে পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন- "অহিংসা সত্যমক্রোধস্তপো দানং দমো মতিঃ। অনসূয়াপ্যসামর্থ্যমনীর্ষ্যা শীলমেব চ।"[১৭] অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, তপস্যা, দান, ইন্দ্রিয়দমন, বেদার্থ পর্যালোচনা, পরের দোষাবিষ্কার না করা, পরের অনিষ্টসাধনে অসামর্থ্য, ঈর্ষা না করা ও সৎস্বভাব- এগুলিকে রক্ষাই ধর্ম। এগুলিই সনাতন ধর্ম। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'- বক-রূপী ধর্মের এই উপদেশ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে ধর্ম কতখানি গূঢ়

---

[১৪] তদেব, পৃষ্ঠা– ১২৩।

[১৫] ভট্টাচার্য, অমলেশ, *মহাভারতের কথা*, পৃ. ১৪৮।

[১৬] মহাভারত, শান্তিপর্ব- ১১০।

[১৭] তদেব।

ও দুরধিগম্য তত্ত্ব। ধর্মের এই দুরধিগম্যতা স্পষ্ট হয়েছে মহাভারতের শান্তি-পর্বেও সেখানে বলা হয়েছে-

"বিদ্ম চৈবং ন বা বিদ্ম শক্যং বা বেদিতুং ন বা।

অণীয়ান্ ক্ষুরধারায়া গরীয়ানপি পর্বতাৎ।।"[১৮]

আমরা ধর্মের মর্ম জানি বা না জানি কিম্বা জানতে পারি বা না পারি তবে এটুকু বুঝি যে, ধর্ম ক্ষুরের ধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্বত অপেক্ষাও বৃহৎ। মহাভারতের এই বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয় কঠোপনিষদের বহুল প্রচলিত উক্তিটিকে- "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তদকবয়ো বদন্তি"[১৯]

মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে- আচার থেকেই ধর্মের বোধ এসেছে, বেদসমূহ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে, বেদ থেকে যজ্ঞসমূহের সৃষ্টি এবং দেবগণ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। শান্তি-পর্বে পিতামহ ভীষ্ম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম ও আচারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন- বেদ, স্মৃতি ও সদাচার এই তিনটিই ধর্মের জ্ঞাপক, কিন্তু পণ্ডিতেরা অর্থকেও চতুর্থ ধর্ম জ্ঞাপক বলেন। এই জগতে লোকযাত্রা নির্বাহের জন্যই মহর্ষিরা ধর্মের নিয়ম করেছেন, ধর্মানুষ্ঠান করলে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখরূপ উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়ে থাকে।[২০]

ধর্মের সার হল হিতসাধন, প্রাণীগণের হিতসাধনই হল ধর্ম। নিজের মঙ্গলসাধনই কেবল ধর্মের লক্ষ্য নয়, সকলের মঙ্গলসাধন করাই ধর্মের লক্ষ্য। ব্যক্তিকে আত্মহিতার্থে নয়,

---

[১৮] তদেব, শান্তিপর্ব- ১২।

[১৯] কঠোপনিষদ- ১/৩/১৪।

[২০] "সদাচারঃ স্মৃতির্বেদস্ত্রিবিধং ধর্মলক্ষণম্।
চতুর্থমর্থমিত্যাহুঃ কবয়ো ধর্মলক্ষণম্।।
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ।
উভয়ত্র সুখোদর্ক ইহ চৈব পরত্রঃ চ।।" - মহাভারত, শান্তিপর্ব- ২৫১।

পরহিতার্থে কর্ম করতে হবে। মহাভারতের শান্তি-পর্বে জাজলি বলেছেন সর্বভূতের হিতকর সনাতন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন। প্রাণীগণের প্রতি অহিংসা বা বিপদকালে অল্পমাত্র হিংসার সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করাই ধর্ম। জাজলি, যিনি কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সকলের সুহৃদ এবং সকলের হিতানুষ্ঠান করে থাকেন তিনি যথার্থই ধর্মতত্ত্বজ্ঞ।[২১]

মহাভারতের শান্তি-পর্বে বলা হয়েছে বেদে দুরকম ধর্ম নির্দিষ্ট আছে- প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে চিরকাল ধর্মের অনুষ্ঠান করলে সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় আর নিষ্কামভাবে ধর্মের অনুষ্ঠান করলে মোক্ষলাভ হয় এবং জন্মান্তর চক্রে আবর্তিত হতে হয় না। যিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রূপ দুই ধর্মকে জানতে পারেন তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞ, সর্ববেত্তা, সর্বত্যাগী, সত্যপরায়ণ, পবিত্র ও প্রভু। শান্তিপর্বেও তাই বলা হয়েছে-

"দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো নিবৃত্তৌ চ সুভাষিতঃ।।"[২২]

যে দুটি পথে প্রমাণস্বরূপ বেদ রয়েছে, এই সেই দুটি পথ- প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম, এই উভয়ই বেদে সুন্দরভাবে উক্ত আছে।

জীব কর্ম প্রভাবে সংসারপাশে বদ্ধ এবং জ্ঞান প্রভাবে মুক্ত হয়ে থাকে। জীব কর্ম প্রভাবে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে থাকে, কিন্তু জ্ঞান প্রভাবে তার নিত্য অমৃতত্ত্ব লাভ হয়। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কর্মের প্রশংসা করে থাকে, এজন্য বারবার তাদের দেহ পরিগ্রহ করতে হয়। যারা ধর্মানুষ্ঠানে রত থাকেন, তারা কখনো কর্মের প্রশংসা করেন না। কর্মের

---

[২১] "সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।।"- তদেব, শান্তিপর্ব- ২৫৮।

[২২] তদেব, শান্তিপর্ব- ২৪১।

দ্বারা সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু পেতে হয়, কিন্তু যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, শোক নেই এবং যেখানে গেলে আর প্রতিনিবৃত্তি হয় না; জ্ঞান ছাড়া সেই স্থান উপলব্ধ হয় না। লোকের জ্ঞান জাগ্রত হলে তার অন্তরে অব্যক্ত, স্থির, প্রপঞ্চাতীত, অমৃত ও সর্বব্যাপী ব্রহ্মা প্রকাশিত হন। তখন জীবকে আর সুখ-দুঃখ অনুভব করতে হয় না। এই অবস্থায় জীব সর্বভূতের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে থাকে এবং সকলের প্রতি সমানভাবে মিত্র ভাব প্রকাশ করে।

'ধর্ম' শব্দটি যেমন সূক্ষ্ম তেমনি ভীষণ। একে লাভ করা দুঃসাধ্য, আবার অস্বীকার করাও অসাধ্য। পাওয়া, না পাওয়ার মাঝে শক্তির চিরন্তন এক রহস্য গ্রন্থি হল এই 'ধর্ম'। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্র এই রহস্য গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা।

প্রচলিত অর্থে ধর্মের সংজ্ঞা কী? শ্রীকৃষ্ণ এর উত্তরে বলেছেন– "ধারণাদ্ ধর্ম মিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ"[২৩] অর্থাৎ 'ধর্ম' সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে, তাই তাকে 'ধর্ম' বলা হয়। ধর্মরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, ধর্মের দশটি শরীর, যথাক্রমে– যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য, দান, তপস্যা, ও ব্রহ্মচর্য। ধর্মের প্রবেশ পথ পাঁচটি– শান্তি, সমতা, দয়া, অহিংসা, ও অ-মাৎসর্য্য। ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে আবার ছয়টি পায়ে ভর দিয়ে। জন্ম থেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, যৌবনে শোক ও মোহ, এবং বার্ধক্যে জরা ও মৃত্যু।

ধর্ম এমন এক শক্তি, এমন এক বিধান, যা জীবনের সব কিছুর মধ্যে অনুস্যূত থেকেও সবকিছুর উর্ধ্বে এক চিৎশক্তি। জীবনকে ঊর্জিত করে ধরছে এই ধর্ম, কিন্তু জীবন

---

[২৩] তদেব, বনপর্ব- ৬৯/৫৮।

তাকে ধরতে পারছেনা। আধুনিক বইজ্ঞানিকদের ভাষায়, এ যেন জীবনের এক অর্থজেনেসিস (orthogenesis)।[২৪]

"মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ"- যুধিষ্ঠিরের এই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ধর্ম বহুজন অনুস্যূত নৈতিকতার নামান্তর মাত্র। বহুজন যে পথ বরণ করে বা বহুলোকের হিতকাঙ্খা যাতে আছে, সেটাই পথ। এই উপায় বা পথ হল 'ধর্ম', আর উপেয় হল বহুজনের হিতসাধন।[২৫]

গীতা ও মনুসংহিতায় ধর্ম

মনু ধর্মের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন- **"বিদ্বদভিঃ সেবিতঃ সদভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ। হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞতো যো ধর্মস্তং নিবোধত।।"**[২৬] অর্থাৎ সকল সময়ে রাগদ্বেষ শূন্য বেদবিদ সাধু ব্যক্তিগণ যা চিরকাল অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং অন্তঃকরণ যাতে নিঃসঙ্কোচে প্রবৃত্ত হয়ে প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাই ধর্ম। মহাভারতে যা ছিল মহাজন অনুসৃত পথ মনুসংহিতাও তাকে বিদ্বান সাধুগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম হিসাবে দেখেছেন। তবে ঐ কর্ম বা পথ ধর্ম কী না তা বুঝে নেওয়ার একটি মানদন্ড মনুষ্যের হাতে তুলে দিয়েছেন মনু; তা হল অন্তরের সন্তুষ্টি বা প্রসন্নতা। চর্চা বা তাত্ত্বিক অনুশীলন নয়, অনুষ্ঠান বা আচারই মনুর কাছে প্রকৃত ধর্ম মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার একটি শ্লোক বিশেষভাবে স্মরণীয়-

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবানদ্বিজঃ।।"[২৭]

---

[২৪] ভট্টাচার্য্য, অমলেশ, *মহাভারতের কথা*, আর্যভারতী, পৃ. ১৫০।

[২৫] মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম*, ২০০৪, পৃ. ৩৯।

[২৬] মনুসংহিতা- ২/১।

[২৭] তদেব, ১/১০৮।

শ্রুতি উপদিষ্ট এবং স্মৃতি নির্দিষ্ট আচারই পরম ধর্ম। অতএব নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী ত্রৈবর্ণিকের উচিৎ সর্বদা এই আচার রূপ ধর্মে নিরত থাকা।

মনুস্মৃতিতে ধর্মকে চারটি বর্ণে (যথাক্রমে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চারটি আশ্রমে (যথাক্রমে– ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) বিভক্ত করা হয়েছে। এই ধর্ম আবার সামান্য বা সাধারণ এবং বিশেষ ভেদে দ্বিবিধ। যা বর্ণ বা আশ্রম নির্বিশেষে সকলেরই করণীয় তা হল সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্ম বা সামান্য ধর্মই সমগ্রভাবে সমাজ জীবনের ভিত্তি। ধৃতি বা সন্তোষ, ক্ষমা, দম (বিষয় সংস্পর্শেও চিত্তের অবিকার), অস্তেয়, শৌচ বা শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী (শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) সত্য এবং অক্রোধ। মনুসংহিতায় এই দশটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে।[২৮] এগুলি সবই সর্বদেশের, সর্বকালের মনুষ্যমাত্রের ধর্ম। অপরপক্ষে পৃথক পৃথক বর্ণ ও আশ্রমের জন্য যে সকল কর্তব্য বিহিত সেগুলি স্মৃত্যুক্ত বিশেষ ধর্ম বা স্বধর্ম। মনুসংহিতায় নির্দিষ্ট বর্ণের জন্য স্বধর্মের উল্লেখ আছে। এই স্বধর্মের পালন অত্যাবশ্যক, যা থেকে কখনই বিচ্যুত হওয়া যায় না। এ কথা বোঝাতে মনু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তিকেই সমর্থন করে বলেন- "স্ব ধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ"[২৯] অর্থাৎ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী স্বধর্ম পালন করাই হল শ্রেয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র– এই চতুর্বর্ণের স্বধর্ম তাদের নিজ নিজ গুণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য– এগুলি হল 'ব্রাহ্মণের' প্রকৃতির স্বভাবজ কর্ম এবং ব্রাহ্মণদের বৃত্তি হল যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ।[৩০] শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, সম্মুখ যুদ্ধে বিক্রম, দাতৃত্ব ও ঈশ্বর ভাব এই গুলি হল 'ক্ষত্রিয়'

---

[২৮] "ধৃতিঃ ক্ষমাদমোহস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহ।
ধীবিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।" তদেব, ৬/৯২

[২৯] শ্রীমদ্ভগবদগীতা- ৩/৩৫।

[৩০] "অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহৈঞ্চব ব্রাহ্মণানামকল্পয়।।" – তদেব, ১/৮৮।

প্রকৃতির স্বভাবজ ধর্ম এবং ক্ষত্রিয় প্রকৃতির বৃত্তি হল- বিক্রম, দণ্ড ও যুদ্ধ।[৩১] কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এগুলি হল 'বৈশ্য' প্রকৃতির স্বভাবজ ধর্ম এবং বৃত্তি।[৩২] আর শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম হল সেবা ও পরিচর্যা এবং বৃত্তি হল শিল্পাদি।[৩৩] এই চর্তুবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি বর্ণের প্রকৃতি- যজন, অধ্যয়ন ও দান যা সংশ্লিষ্ট বর্ণের সকলের ক্ষেত্রেই সমান।[৩৪] এই স্বধর্ম ভেদ সেই সঙ্গে বর্ণ ভেদের ভিত্তি হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক প্রবণতা- তার গুণ ও কর্ম।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন "চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।"[৩৫] অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের নিজস্ব প্রকৃতির যে ধর্ম তাকেই এখানে নির্দেশ করা হয়েছে। সমাজ মাত্রই গুণ ও কর্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগ আছে। এখানে বক্তব্য হল, ব্রাহ্মণাদি প্রকৃতি ভেদে কার কি বিশেষ ধর্ম বা স্বধর্ম তা তাঁদের স্ব স্ব স্বভাব গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ- ব্রাহ্মণের এই ছয়টি কর্ম, এর মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও সৎপ্রতিগ্রহ- এই তিনটি ব্রাহ্মণের উপজীবিকা বলে নির্দিষ্ট। কিন্তু এই তিনটি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। কেবল দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এগুলি ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যের পক্ষেও যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। প্রজাপতি মনু বলেন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি যেমন প্রজা রক্ষণ নিমিত্ত অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ, তেমনি বৈশ্যের বৃত্তি হল পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য। আর শূদ্রের কর্মবৃত্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন- অন্য তিন বর্ণের

---

[৩১] "প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।।" - তদেব, ১/৮৯।

[৩২] "পশূনাং রক্ষনং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বনিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।।" – তদেব, ১/৯০।

[৩৩] "একমেব তু শূদ্রস্য প্রভূঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।।" – তদেব, ১/৯১।

[৩৪] দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ, *মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম*, পৃ. ৯৩-৯৪।

[৩৫] শ্রীমদ্ভগবদগীতা- ৪/১৩।

সেবা করাই হল শূদ্রের নির্দিষ্ট কর্ম, এর দ্বারাই তাদের পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়। মনু আরও বলেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শুচিতা ও ইন্দ্রিয় সংযম– এগুলি বর্ণ নির্বিশেষে সকল নরনারীর সাধারণ ধর্ম।[৩৬]

এই বর্ণধর্মের সাথে আশ্রম ধর্ম নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বর্ণধর্মের দ্বারা ব্যক্তির সংহতি যে জাতি সেই জাতির জীবন নিয়মিত হত এবং আশ্রম ধর্মদ্বারা জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন সুনির্দিষ্ট হত। এই আশ্রম ধর্ম পালন কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথে একটা লঘু উৎসবের শোভাযাত্রা নয়, বরং একটি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, একটা যজ্ঞ এবং একটা তপশ্চর্যা। এই আশ্রমধর্মের মধ্য দিয়ে মানব ত্যাগ, তপঃ ও সংযম দ্বারা পৃথিবীর মলিনতা বিধৌত করে শুদ্ধপূত হয়ে ক্রমশঃ জীবন সোপানের উচ্চ থেকে উচ্চতর, কঠোর থেকে কঠোরতর পথ অতিক্রম করে অবশেষে অত্যাশ্রমী হন। কাজেই আশ্রম ধর্ম পরিশ্রম সাপেক্ষ বলেই এই ধর্মগুলিকে 'আশ্রম' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এই আশ্রম চতুষ্টয় কি কি এবং মানব জীবনে কখন কোন আশ্রম ধর্ম গ্রহণীয় তা ব্যক্ত করতে জাবাল উপনিষদে বলা হয়েছে– "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভূত্বা বণী ভবেৎ। বণী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।" অর্থাৎ মানব প্রথমে ব্রহ্মচারী হবে, দ্বিতীয় পর্বে গৃহী হবে, তৃতীয় পর্বে বনী বা আরণ্যক হবে এবং চতুর্থ বা চরম পর্বে প্রব্রজ্যা করে সন্ন্যাসী হবে। অতএব মানব জীবনের এই পর্ব চতুষ্টয় হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

বিদ্যাভ্যাসের জন্য যে আর্য মানবকে গুরুগৃহে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করতে হত- তার সাধারণ নাম ছিল ব্রহ্মচারী। বেদের একটি নাম হল ব্রহ্ম। ঐ বেদের চর্য্যকে ব্রহ্মচর্য বলা হত এবং যারা ব্রহ্মের চর্যা করতেন, তাদেরই বলা হত ব্রহ্মচারী। এই ব্রহ্মচারী রূপে

---

[৩৬] দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ, *মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম*, পৃ. ৯৫।

গুরুগৃহে অতিবাহিত করে বিদ্যাভ্যাসের পর দার পরিগ্রহ করে গৃহী হতে হত। মনুসংহিতায় গৃহস্থের পক্ষে দার গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হত।[৩৭] এর পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীকে জীবনের অপরাহ্ণে গৃহ ছেড়ে অরণ্যে আরণ্যক হতে হবে। গ্রাম সুলভ আহার ও যানবাহনাদি পরিচ্ছদ ত্যাগ করে পত্নীকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করে অথবা পত্নীর সাথেই গৃহস্থ বনে গমন করবেন এবং এই অরণ্যে গমন করে তাদের তপস্যা করতে হত পরমপুরুষকে জানবার জন্য। অবশেষে চতুর্থ আশ্রম হল 'সন্ন্যাস'। এই চতুর্থ আশ্রমীর সর্বাপেক্ষা সার্থক নাম 'সন্ন্যাসী'। কারণ এনারা সর্বস্ব 'ন্যাস' করেন। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে কেবল প্রব্রজ্যা করেন। ব্রহ্মচারীর বিশেষ ধর্ম যেমন স্বাধ্যায়, গৃহস্থের ইষ্টাপূর্ত, বানপ্রস্থের তপঃ তেমনি সন্ন্যাসীর বিশেষ ধর্ম 'ন্যাস'।[৩৮]

মনুসংহিতার ন্যায় শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও ধর্মের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গীতা হল কৃষ্ণবচনের সমাহার। এই বচনগুলির লক্ষ্য ধর্মরক্ষা, ধর্ম সংস্থাপনের লক্ষ্যেই যে মর্ত্যে ভগবানের আবির্ভাব, তা তার স্বীয় বচন হতেই স্পষ্ট।[৩৯]

যখন ধর্মের অধঃপতন বা গ্লানির কারণে অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের মূল যে স্বধর্ম তার উদযাপন ব্যাহত হয়। এমত পরিস্থিতিতে দুষ্টদের বিনাশ এবং সাধুদের রক্ষার জন্য এককথায় ধর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই তিনি বারে বারে এই জগতে অবতীর্ণ হবেন বা দেহ ধারণ করবেন একথাই ব্যক্ত করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

ধর্ম সংস্থাপন স্বধর্মের উদযাপনের অপেক্ষা রাখে, কাজেই গীতোক্ত ধর্ম একধরণের স্বধর্ম পালনের অনুশাসন। স্বধর্ম বলতে বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্মকে বুঝতে হবে। প্রতিটি বর্ণের

---

[৩৭] তদেব, পৃ. ২২৩।

[৩৮] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *মনুসংহিতা*, পৃ. ৩১৬।

[৩৯] শ্রীমদ্ভগবদগীতা- ৪/৭-৮।

জন্য নিজ নিজ ধর্ম নির্দিষ্ট রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদগীতায়। তবে এ কথা আগেই বলা হয়েছে স্বধর্ম, বংশ বা কূল কিম্বা গাত্র বর্ণ অনুসারে নির্ধারিত হয় না, হয় গুণ, কর্ম অনুসারে।[৪০] প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে গুণগত কিছু উৎকর্ষতা থাকে, থাকে সঙ্গত কিছু সক্ষমতা তাই নির্ধারণ করে দেয় তার বর্ণ কোনটি হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে বর্ণ ধর্মকে স্বধর্ম বলে গীতাকার বর্ণনা করেছেন তার পরিপূর্ণ উদযাপন পালন তো বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সেই স্বধর্মের উদযাপন কী কাঙ্ক্ষিত এর উত্তরে বলা যায় কেউ যদি স্বীয় ধর্ম পরিপূর্ণ রূপে অনুষ্ঠানে অপারগ হয়, যদি তার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অঙ্গহানি ঘটেও তথাপি সেই ব্যক্তির উচিৎ আপন ধর্ম উদযাপনে মনোনিবেশ করা। যে বর্ণ অপরের জন্য নির্ধারিত তার পরিপূর্ণ উদযাপন অপেক্ষা স্বধর্মে আংশিক উদযাপন ও বিধেয়। কারণ পরধর্ম কখনই কোন ব্যক্তির স্বীয় ধর্ম হতে পারে না। তাই স্বধর্মের অনুষ্ঠানে যদি জীবনও ত্যাগ করতে হয় তথাপি তা পরধর্মের অনুষ্ঠানের তুলনায় শ্রেয়। এই ব্যাপারে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট নির্দেশ-

"শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"[৪১]

এখানে জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে স্বধর্মের প্রতিপালন যা গীতায় অত্যাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে, তা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সহজ কথায় কর্মরূপ ধর্মের অনুষ্ঠান কি কেবল নিয়মের অনুগমন না কি তা ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে ফলদায়ক হয়ে থাকে। স্ব স্ব ধর্মের অনুষ্ঠান যে সমাজে সুস্থিতি ও শান্তির পরিমণ্ডল রচনা করে তা একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা

---

[৪০] তদেব, ৪/১৩।

[৪১] তদেব, ৩/৩৫।

পড়ে। কিন্তু গীতাকার কোনরূপ ফললাভের ঈপ্সায় ধর্মানুষ্ঠানের বিধান দেননি। গীতোক্ত কর্ম- ধর্ম নিষ্কাম বা অনাসক্ত কর্মকে সূচিত করে। সকল রকম আসক্তি শূন্য হয়ে ফলাকাঙ্খা রহিতভাবে আপন আপন কর্ম করার বিধান রয়েছে গীতায়। কাজেই গীতোক্ত কর্ম সকল রকম ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য কর্ম। এমন কি আমার দ্বারা কৃত হচ্ছে এইরূপ মনোভাব পরিত্যাগ করতে বলেছেন গীতাকার। এখানে ফলাভিসন্ধি শূন্যতা এবং কর্তৃত্বাভিমান শূন্যতা হল প্রকৃত কর্মের লক্ষণ।

প্রকৃত ধার্মিক ব্যাক্তি শুধু যে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হবেন বা কর্তৃত্বের অভিমান শূন্য হবেন তাই নয় সুখ- দুঃখ, ভয়, ক্রোধ এই সব চিত্তবৃত্তিগুলি তাকে স্পর্শ করবে না। সুখের প্রতি স্পৃহাহীন, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন এমন স্থিতপ্রজ্ঞ মানবের আদর্শ বর্ণিত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদগীতায়।

মীমাংসা মত

মহর্ষি জৈমিনি তাঁর মীমাংসা-সূত্রে ধর্মের লক্ষণ দিয়েছেন- "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম্মঃ।"[৪২] এই লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলেছেন- ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনং চোদনা। ক্রিয়ার প্রবর্তক বচনের নাম 'চোদনা'। অর্থাৎ প্রবর্তনা বা নিবর্তনর বিধায়ক বেদবাক্য। যার দ্বারা লক্ষিত বা জ্ঞাপিত হয় তাই 'লক্ষণ'। চোদনা লক্ষণ যার তাই চোদনালক্ষণ। চোদনাই লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ যার, তাই চোদনালক্ষণ। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে একমাত্র চোদনাই ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমাণ। সূত্রস্থ 'অর্থ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা অনর্থ বা অনিষ্টের হেতুকে বারণ করা হয়েছে। অনর্থের হেতুভূত কর্ম্ম বেদবিহিত হলেও ধর্ম্ম নয়। শ্যেনযাগাদি শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের উল্লেখ বেদাদি শাস্ত্রে থাকলেও সেগুলি ধর্ম্ম নয়। মীমাংসক প্রভাকরও এমত সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে বৈদিক নির্দেশ

[৪২] জৈমিনি সূত্র- ১/১/২।

বা চোদনাবাক্য, যা অর্থে উপনীত করে (অনর্থে নয়), তা তাদের কার্য অপূর্ব-এর মাধ্যমে ধর্মের জনক হয়। বৈদিক নির্দেশ বলতে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্য কর্মকে বোঝায়। উভয় ক্ষেত্রেই নির্দেশের মধ্যে অনর্থ না থাকলে তা ধর্ম বলে অভিহিত হয়। নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের ক্ষেত্রে সদর্থক অর্থে কোন সদর্থক কল্যাণ বা অর্থ নেই। অর্থাৎ তারা সুখজনক নয়, কিন্তু তারা দুঃখজনকও নয়, এবং এই অর্থে তারা অর্থ অর্থাৎ ধর্ম। যথাযথভাবে এই সব কর্তব্য বা ধর্ম সম্পাদনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তার ফলে তত্ত্ব জ্ঞান হওয়ায় মুক্তিলাভ হয়।

প্রভাকরের মতের বিরোধিতা করে কুমারিল ভট্ট বলেন- যাগাদি কর্ম মাত্রই ধর্ম্ম। তাই ধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় অপূর্বকে বোঝায় না। যাগাদি কর্মই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হল শ্রেয়স্কর অর্থাৎ তা যজমানের পরম পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স লাভে সহায়ক হয়ে কল্যাণের জনক হয়। এ বিষয়ে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্য কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় প্রকার কর্মই শ্রেয়স্কর, তাই ধর্ম্ম। তাই কুমারিল ভট্টের মতে, "চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ" এই সূত্র চোদনা লক্ষণ অনর্থকে বারিত করে না। যেহেতু সমস্ত বৈদিক বাক্য বা নির্দেশই ধর্ম এবং তাই তারা অর্থ, অনর্থ নয়।

লৌগাক্ষি ভাস্কর ধর্ম্মের লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন- যাগাদিরেব ধর্মঃ তল্লক্ষণং বেদপ্রতিপাদ্যঃ প্রয়োজনবদর্থো ধর্ম ইতি।[৪৩] অর্থাৎ যাগ প্রভৃতিই ধর্ম। তার (ধর্ম্মের) লক্ষণ- বেদবিহিত প্রয়োজন বিশিষ্ট শ্রেয়োজনক কর্ম ধর্ম্ম। ধর্মের এই লক্ষণে 'বেদপ্রতিপাদ্য', 'প্রয়োজনবৎ' এবং 'অর্থ' এই তিনটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণস্থ 'প্রয়োজনবৎ' পদটিকে বাদ দিলে যা সপ্রয়োজন এবং বেদে উপদিষ্ট তাই ধর্ম পদবাচ্য হয়;

[৪৩] *অর্থসংগ্রহ-* ১/৪/১।

ফলস্বরূপ স্বর্গাদিফলে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হয়। একইভাবে 'বেদপ্রতিপাদ্য' বর্ণনাটিকে বাদ দিলে সপ্রয়োজন পুরুষের ইষ্ট মাত্রই ধর্ম হয়ে পড়ে; ফলে ভোজনাদিতে ধর্ম লক্ষণের অতিপ্রসঙ্গ হয়। ভোজনাদি সপ্রয়োজন হলেও বেদপ্রতিপাদ্য না হওয়ায় ঐ অতিপ্রসঙ্গ হয়না। অন্যদিকে 'অর্থ' শব্দটি পরিহার করলে বেদপ্রতিপাদ্য সপ্রয়োজন শ্যানযাগাদি ধর্ম লক্ষণাক্রান্ত হয়। অথচ শত্রুবধার্থে অনুষ্ঠিত শ্যানযাগাদি যে ধর্ম নয় তা ইতি পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে 'চোদনালক্ষণঽর্থধর্ম' জৈমিনি-কৃত এই লক্ষণের সঙ্গে 'বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজনবদর্থ ধর্মঃ' লক্ষণটির বিরোধ রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ সূত্রকারের লক্ষণে যে 'চোদনা' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা বেদবাক্য সমূহের একদেশকে বোঝানো হয়েছে; শবরস্বামী যার অর্থ করেছেন যাগের প্রবর্তক বাক্য বা বিধিবাক্য। পক্ষান্তরে লৌগাক্ষি 'চোদনা' শব্দের পরিবর্তে 'বেদ' পদটি ব্যবহার করে মন্ত্র, বিধি, নিষেধ, নামধেয় ও অর্থবাদ সকল বেদবাক্যকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ সূচিত হয়না কারণ সাক্ষাৎভাবে বিধিবাক্য ধর্মের প্রতিপাদক হলেও পরম্পরাক্রমে বেদবাক্য মাত্রই ধর্মের প্রতিপাদক হয়ে থাকে।

বৌদ্ধ মতে ধর্ম

যে দর্শনের অন্যতম মূল গ্রন্থ ধম্মপদ সেখানে ধম্ম বা ধর্মের ধারণাটি যে বিশেষ গুরুত্ব পাবে তা বলাই বাহুল্য। তবে তাই বলে ধম্ম যে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থে বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়। গুণ, স্বভাব, অবস্থা, শীল, নীতি, ধর্মগ্রন্থ, জাগতিক বিধান, সত্য, চৈতসিক পদার্থ, পুণ্য, আচার, সমাধী, প্রজ্ঞা, মার্গ ফল, নির্বাণ, প্রভৃতি নানা অর্থে শব্দটির

ব্যবহার হয়েছে বৌদ্ধ শাস্ত্রে। 'ধম্মপদ' গ্রন্থের মগ্গবগ্গের 'সব্বে ধম্মা অনত্তা'[৪৪] শ্লোকে 'ধর্ম' পদটি সৃষ্ট বস্তু অর্থে, যমকবর্গের 'এসো ধম্মো সনন্তনো'[৪৫] শ্লোকে নীতি অর্থে, ধর্মস্থবর্গের 'যমহি সচচঞ্চ ধম্ম চ'[৪৬] শ্লোকে 'ধর্ম' পদ গুণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরাপর দর্শনে যেমন দম ধৃত্যাদিকে ধার্মিকের গুণ বলা হয়েছে তেমনি ধম্মপদে সত্য, ধর্ম, অহিংসা, দম এই গুণগুলি যার মধ্যে বিদ্যমান তাকে স্থবির বলা হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন ধর্ম অর্থে নৈতিকতাকে বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর 'রত্নাবলী' ও 'সুহৃল্লেখ' গ্রন্থে নৈতিকতার আলোচনা করেছেন। নাগার্জুন 'রত্নাবলী' গ্রন্থে বলেছেন "ধর্মম একান্ত কল্যাণম"[৪৭] অর্থাৎ, ধর্ম হল একান্তভাবে কল্যাণস্বরূপ। যে ব্যক্তি প্রথমে ধর্মাচরণ করেন সেই ব্যক্তি যথাসময়ে অভ্যুদয় (জাগতিক সুখ) প্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন। 'সুহৃল্লেখ' গ্রন্থে নাগার্জুন নৈতিকতাকে পৃথিবীর সাথে তুলনা করেছেন। পৃথিবী যেমন সুস্থ স্থাবর অস্থাবর বস্তুর ভিত্তি স্বরূপ তেমনি নৈতিকতা সমস্ত কিছুর ভিত্তি স্বরূপ। তাই নৈতিকতাকে বিচ্ছিন্নভাবে অপবিত্রতার সাথে অনুশীলন না করে পবিত্রতার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে, অলঙ্ঘনীয়ভাবে চর্চা করা উচিত।

ধম্ম বা ধর্মের এই সকল অর্থ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে শব্দটির দুটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমটি নৈতিক এবং দ্বিতীয়টি আধিবিদ্যক। নৈতিক দিক থেকে 'ধর্ম' একপ্রকার জীবন চর্চাকে নির্দেশ করে। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে ধর্মের জীবন সদ্‌গুণসম্পন্ন নৈতিক জীবন, যার দ্বারা একজন মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। যদিও নির্বাণের স্তর উপলব্ধির স্তর, সেখানে পাপ পুণ্য, ভালো মন্দ– কোন বৈপরীত্যই থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ

---

[৪৪] ধম্মপদ, মার্গবর্গ, গাঁথা ৭।

[৪৫] তদেব, যমকবর্গ গাঁথা ৫।

[৪৬] তদেব, ধর্মস্থবর্গ, গাঁথা ৬।

[৪৭] রত্নাবলী- কারিকা ২।

না ঐ স্তরে উন্নীত হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে পারেন। যে ব্যক্তি অনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকেন তিনি কখনই মুক্তিলাভের অধিকারী হতে পারবেন না। বৌদ্ধধর্মে বলা হয়, যিনি পরম নৈতিক, যার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজের বশীভূত, যিনি মিতাহারী এবং ধর্মপালনে নিযুক্ত– তিনিই নির্বাণ লাভের অধিকারী ব্যক্তি। বুদ্ধদেবের অনুশাসনই হল, সকল পাপকাজ থেকে বিরতি, কুশল কর্মের অনুষ্ঠান এবং আপন চিত্তশুদ্ধি। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা পরম তপস্যা এবং নির্বাণ হল সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যকে মনে আঘাত দিয়ে কোন ব্যক্তি ভিক্ষু হতে পারে না। অপরের নিন্দা না করা, অপরকে আঘাত না করা, নিয়মসমূহের যথাযথ পালন করা, চিত্তকে সুদৃঢ় করা, মিতাহারী হওয়া এবং সর্বদা মনকে যোগযুক্ত রাখা- এই হল বুদ্ধদেবের উপদেশ।[৪৮]

বৌদ্ধ দর্শনে প্রথমেই বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়। বুদ্ধদেব তাঁর ভাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে। তাঁর মতে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বা সম্যক জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যায়। এই জ্ঞান উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রশস্ত। মুক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর করায়ত্ত নয়, মুক্তিকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়াই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অভিনবত্ব। যে শূদ্র শ্রেণীকে সকলে ব্রাহ্মণদের সেবনের কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সেই শূদ্র শ্রেণীরও ব্রাহ্মণদের মতো সমান অধিকার আছে মুক্তিতে। বুদ্ধদেব এই মত প্রচার করে তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় এক ধরণের বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাই বৌদ্ধদর্শনের দিগ্বিজয়ের মূল হেতু।[৪৯]

---

[৪৮] চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, *বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্র*, অমিতা চ্যাটার্জী সম্পাঃ, পৃ. ২৬১ – ২৬২।

[৪৯] তদেব, পৃ. ২৬৪।

'ধর্ম' শব্দটি একটি গভীর আধিবিদ্যক অর্থ বহন করে বৌদ্ধ দর্শনে। 'ধর্ম' শব্দ দ্বারা এখানে সর্ববিধ তত্ত্ব বা পদার্থ সূচীত হয়। এই ধর্মগুলিকে অভিধর্ম কোষে প্রথমে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত– এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যা হেতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন সেই ধর্মগুলি হল সংস্কৃত ধর্ম, এবং যা হেতু বা প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন নয় সেই ধর্মগুলিকে অসংস্কৃত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অসংস্কৃত ধর্মগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। এগুলি হল অনাস্রব অর্থাৎ নির্দোষ। অন্যদিকে সংস্কৃত ধর্মগুলির মধ্যে একমাত্র মার্গ-সত্য হল অনাস্রব এবং অবশিষ্ট সমুদায় সংস্কৃত ধর্মই সাস্রব।[৫০]

অর্থাৎ বলা যেতে পারে বৈভাষিক মতে 'ধর্ম' দুই প্রকার, যথাক্রমে- অনাস্রব ও সাস্রব। আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, ও মার্গ-সত্য– এগুলি হল অনাস্রব ধর্ম। আর হেতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন অবশিষ্ট যত পদার্থ আছে, তারা সকলেই সাস্রব ধর্ম। যেগুলি আস্রবের আশ্রয় সেগুলিই হল সাস্রব।[৫১]

জৈন মতে ধর্ম

জৈন ঐতিহ্যে 'ধর্ম' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ধর্ম' শব্দটি সংস্কৃত জৈন গ্রন্থগুলিতে জৈন উপদেশাবলিকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই সাধারণ অর্থ ছাড়াও পারিভাষিক অর্থে ধর্মকে অনেক ক্ষেত্রেই গতিশীলতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণের সাথে জড়িত যেসব নীতি তাঁদের বোঝাতে গেলেও 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। তেমনি আবার শাশ্বত জীবের প্রসঙ্গেও ধর্ম শব্দটির

---

[৫০] শ্রী অনন্তকুমার তর্কতীর্থ সম্পাঃ *বৈভাষিক দর্শন*, পৃ. ২৫-২৬।

[৫১] তদেব, পৃ. ৫৬।

প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। যেখানে 'ধর্ম' হয়ে দাঁড়িয়েছে জীব ধর্ম। এই অর্থে ধর্ম হল জীবের স্বভাব অনুযায়ী সদাচারের প্রক্রিয়া। ধর্ম এখানে দু প্রকার- প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম। পরবর্তীকালে পৃথক একটি অর্থে 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এই অর্থে সমগ্র জাগতিক ক্রিয়া- প্রক্রিয়ার যে শৃঙ্খলা তার নিয়ন্ত্রকই ধর্ম।[৫২]

সমকালীন ভারতীয় মানস ও ধর্মবোধের বিবর্তন

এপর্যন্ত ধর্ম প্রত্যয়টির বহুমাত্রিক চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। দেখা গেছে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল জীবন তথা সমাজের সুখ, সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই। কিন্তু কালক্রমে ধর্ম তার ইহজাগতিক যোগসূত্রটি হারিয়ে ফেলতে শুরু করে এবং তা পরিণত হয় পারত্রিক মুক্তিলাভের একটি সংকীর্ণ সেতুতে। আর ঐ পারত্রিক অভিযানের যাত্রাপথকে মসৃণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি হয় নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্র। উদযাপনের জটিলতায় ধর্ম যেমন আটকে পড়ে তেমনই তার সমাজ কল্যাণ মূলক দিকটিও অবহেলিত হতে শুরু করে। এই রকম সমাজ বিমুখ কৃচ্ছ্রসাধন সর্বস্ব ব্যক্তি মুক্তির প্রচেষ্টাকে কষাঘাত করে জীবন, সুখ ও সর্বকল্যাণের সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধটিকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সমকালীন ভারতীয় মনীষীদের চিন্তায়।

ধর্মকে তার মানব কল্যাণকারী রূপটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমরা প্রথম লক্ষ্য করি রামমোহনের মধ্যে। এই মানবমুখী ধর্ম যাঁর জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়ে বাঙময় হয়ে ওঠে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মত ও পথের ভিন্নতা যতই থাক সকলের লক্ষ্য যে এক, তাঁর অমৃত কথার মধ্য দিয়ে বারেবারে সেই সত্যটুকু আমাদের বুদ্ধিস্থ করতে চেয়েছেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ। নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পূর্ণ ভূমিতে আরোহণই

[৫২] Olivelle, Patrick, Dharma studies in its semantic, cultural and religious history, page- 177-178.

যে ধর্ম সে কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে ও সাহিত্যে। মানুষ মাত্রই অনন্ত ও পূর্ণ কিন্তু আপনার মধ্যে নিহিত সেই পূর্ণতা ও দেবত্বকে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষের মধ্যে ঐ যে সুপ্ত দেবত্ব তাকে ব্যক্ত করার প্রয়াসই যে ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের অভিভাষণ গুলিতে সেই সুরই অনুরণিত হয়েছে। অন্যদিকে শ্রী অরবিন্দ তাঁর রচনা ও জীবন পথের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মর্ত্যভূমিতে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেই ধর্মের লক্ষ্যপূরণ হবে যার সূত্রপাত ব্যক্তিমুক্তির মধ্য দিয়ে হলেও পরিণতি সর্বমুক্তিতে। নানা ছলে নানা নামে ভগবানের পূজা করলেও আসলে সকলেই যে সত্যেই উপাসক- সত্যই যে প্রকৃত ঈশ্বর- সে কথা বলে আমাদের চমৎকৃত করেন গান্ধী। কোরানের অনুশাসন গুলির নব নব ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে ইসলাম ধর্মের সৃজনশীলতা ও মানবিকতার দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেন ইকবাল। একদিকে জড়বাদ ও অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দ্বিমুখী আক্রমণে দিশেহারা মানব সভ্যতাকে একমাত্র ধর্মই যে পথ দেখাতে পারে, সমস্যাদীর্ণ জগতবাসির কাছে আশার বাণী শোনাতে পারে সে বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ।

তবে ধর্মের ধারণার এই বিবর্তন যার রচনার মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একটু লক্ষ্য করলে ধরা পড়ে ঈশ্বর কেন্দ্রিক আত্মনিগ্রহ সর্বস্ব ধর্মকে মানবিক প্রেম ও আনন্দের এক বহমান ঝর্ণাধারা হিসাবে তুলে ধরার প্রসায় বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব থেকেই শুরু হয়েছে। এই পরম্পরাই অব্যাহত থেকেছে বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ, শ্রী অরবিন্দ থেকে রাধাকৃষ্ণাণ প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৈতিকতার ধারণাটি সমাজকেন্দ্রিক, যেহেতু আচরণের নৈতিক অনৈতিক বিচার সমাজ স্বীকৃত আচরণবিধি বা নীতির ভিত্তিতে করা হয়। কিছু কিছু

আচরণবিধি সর্বজনস্বীকৃত মানব সমাজ মাত্রই সেটি স্বীকার করেন যেমন– 'সত্য কথা বলা উচিত', 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত',যদিও সব ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা যে মঙ্গলজনক এমনটা নাও হতে পারে। সত্য বলার জন্য মানুষের প্রাণনাশের দৃষ্টান্ত আমরা মহাভারতের কৌশিক মুনির ঘটনা থেকে জানতে পারি। সম্প্রদায়, জাতিভেদে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আচরণ বিধি স্বীকার করা হয়। নীতি, ধর্ম এগুলি বিভিন্ন ভারতীয় গ্রন্থে আলোচিত হলেও এদের অর্থ সর্বত্রই এক নয়। নীতি বললেই কোথাও কোথাও নৈতিকতা প্রসঙ্গ আসে, একইভাবে ধর্ম বললে কোথাও কোথাও সমাজ স্বীকৃত ফুল বেলপাতা নৈবেদ্য শাস্ত্রসিদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ বোঝায় আবার কোথাও moral deeds বা নৈতিক কর্ম কে সূচিত করে।

আধুনিক শাস্ত্র বিশারদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী রামায়ণের নীতি ধর্ম প্রবন্ধে নীতি এবং ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নীতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে 'নী' ধাতু থেকে যার অর্থ- যা নিয়ে যায় বা যা টেনে নিয়ে যায়, তাহলে বিশদর্থে নীতি শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় মানুষের তৈরি যে সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা সৎবৃত্তি সদাচার নিজেকে এবং পরকে একটা অধম স্তর থেকে উত্তম স্তরে নিয়ে টেনে নিয়ে যায় সেটাই নীতি। অন্যদিকে ধর্ম শব্দটি এসেছে যে 'ধৃ' ধাতু থেকে যারা অর্থ যা ধারণ করে, ধর্মই মানুষকে ধারণ করে 'ধর্ম ধারয়তে প্রজাঃ'। বিশদর্থে যে সমস্ত গুণ মানুষকে ধারণ করে। ধর্ম শব্দের বিশেষত্ব হলো নীতি শব্দের অন্তর্গত নিয়ম শৃঙ্খলা সদবৃত্তি সদাচার যা অনেকটাই ব্যক্তিগতস্তরে থাকে। সেইগুলি ধর্ম শব্দের প্রয়োগে এক বিশাল ব্যপ্তি নিয়ে ধরা দেয় ধর্ম আসলে একটা বৃহত্তর সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার উপযোগী।

ভারতীয় দর্শনে নীতি নৈতিকতার চর্চা যে ধর্মের ধারণাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে এ পর্যন্ত সেই ধর্মের ধারণাটির উপর আলোকপাত করা হল। এই আলোচনা থেকে

স্পষ্ট হয় যে, ধর্ম একটি বহুমাত্রিক শব্দ যা শাস্ত্র ও দর্শন ভেদে নানা বিষয়ের দ্যোতক হতে পারে। একই সঙ্গে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এই ধর্মের যাপন সর্বত্র ঈশ্বর বিশ্বাসকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। বৈদিক ঐতিহ্যে ধর্ম ছিল সদাচার মাত্র। ভগবতগীতা, রামায়ণ, উপনিষদে ধর্ম ছিল কর্তব্য যা অনেকখানি জীবনকে সৎগুণ সমৃদ্ধ করার একটি প্রয়াস। এখানে নৈতিকতা যতটা নীতির নৈতিকতা (Ethics of Principle) তার তুলনায় বেশি প্রলক্ষণের নৈতিকতা (Ethics of Triads) মনুস্মৃতি, প্রশস্তপাদ ভাষ্য সর্বত্রই এই সৎ গুণের সংখ্যার নিরূপণ গুরুত্ব পেয়েছে। জীবনকে সদগুণ সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যটি যে সর্বত্র ঈশ্বর লাভ তা মনে হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নৈতিক জীবন মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভের পূর্বাঙ্গ আবার কোথাও তা নিছকই জাগতিক সুখ লাভের প্রতিসঙ্গী। এমতাবস্থায় যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে ওঠে তা হল নৈতিক জীবন যাপনের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের বা কোন অতিন্দ্রীয় বৌদ্ধিক সত্তার বিশ্বাস স্থাপনের সম্বন্ধটি কি আকস্মিক নাকি আবশ্যিক? একজন ঈশ্বরবাদী,সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়তাবাদীর নৈতিক জীবন যাপনের মধ্যে কি কোন অসঙ্গতি আছে? নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে নৈতিকতার সম্বন্ধটি ঠিক কিরূপ তার বিচারমূলক বিশ্লেষণ গুরুত্বভাবে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে।

এই গবেষণার অভিমুখ যেহেতু নিরীশ্বরবাদী নৈতিকতা সেহেতু ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায়গুলি ঈশ্বর ধারণা ব্যাতিরেকে নৈতিকতার কিরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই এই সন্দর্ভের মূল আলোচ্য। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে এই আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে ৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভূমিকা এবং উপসংহার।

এই গবেষণা নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'জড়বাদী চার্বাক পরম্পরায় নৈতিকতা'। এই অধ্যায়ে জড়বাদী ভাবনায় নৈতিকতার বিকল্প রূপ কেমন হতে পারে তারই আলোচনা করা হয়েছে। চার্বাকরা যে ধরণের নৈতিকতায় বিশ্বাসী তা একান্তই জড়বাদী ভোগবাদী এবং ইন্দ্রিয়সুখবাদী। ভারতীয় দর্শনের চার্বাক সম্প্রদায় একটি ব্যতিক্রমী অবস্থান নিয়েছে একদিকে আস্তিক্যবাদী ভারতীয় ধারা থেকে তারা যেমন আলাদা তেমনি নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় হতেও ভিন্ন। তারা একাধারে জড়সর্বস্ববাদী, ইন্দ্রিয়সর্বস্ববাদী এবং সুখসর্বস্ববাদী। এরকম জড়সর্বস্ববাদী দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে স্বীকৃত হবে না তা বলাই বাহুল্য। আধ্যাত্মিক সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেও সুখসর্বস্ববাদ এবং আত্মসর্বস্ববাদ গ্রহণ করে কিভাবে নৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব তার অনুসন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'নাস্তিক-নৈতিকতার জৈন ঐতিহ্য'। জৈন দর্শনে আলোচিত যে নীতিতত্ত্ব তা অধিবিদ্যার প্রতিসঙ্গী। জৈনরা যে আধিবিদ্যক মতবাদ গ্রহণ করেন তাকে এককথায় বস্তুবাদী বহুত্ববাদ বা বহুত্ববাদী বস্তুবাদ বলে অভিহিত করা যায়। এই বহুত্ববাদী বস্তুবাদীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা এক ধরণের জ্ঞানতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতাবাদ গ্রহণ করেছেন যাকে স্যাদবাদ নামে অভিহিত করা হয়। এই আপেক্ষিকতাবাদ গ্রহণ করেও তারা কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যদিও আত্মবাদীদের মত তারা নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকেন। জৈনমত অনুসারে পুদগলবন্ধনে আবদ্ধ এই আত্মা স্বরূপত নিত্য মুক্ত। পুদ্গল বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আত্মা বদ্ধ জীবে পরিণত হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বদ্ধজীবকে নৈতিক আচরণে প্রবৃত্ত করে। সেই নৈতিক আচরণ কিভাবে পরিচালিত হয় বা ঐশী সত্তার স্বীকৃতি ব্যতীত সেই নৈতিক আচরণ কিভাবে সম্পাদিত হয় তারই সুলুকসন্ধান করা হবে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধদর্শনে নিরীশ্বরবাদী ভাবনায় নৈতিকতার ব্যাখ্যা কিভাবে হতে পারে তারই আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায় একবাক্যে একথা স্বীকার করেন যে বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন হলো নৈতিকতার আকর। আর্যসত্য থেকে শুরু করে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল, ব্রহ্মবিহারভাবনা, ত্রিরত্ন-এর অভ্যাস [শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা] একথা প্রমাণ করে যে ব্যক্তির মুক্তি বা নির্বাণলাভ তার নিজের উপর নির্ভর করে। প্রতিটি জীবের মধ্যে নির্বাণ লাভ করার সামর্থ্য রয়েছে। কোন মানুষ যদি বুদ্ধদেবের উপলব্ধ পথে কঠোর সাধনা করতে পারেন তাহলে তার নিজের সামর্থ্য দ্বারা সেই ব্যক্তির মুক্তি লাভ সম্ভব এর জন্য কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করা নিরর্থক। ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনায় বৌদ্ধমত নিয়ে একটি অপব্যাখ্যার উল্লেখ এবং তার নিরসনের আলোচনাও রয়েছে এই অধ্যায়ে। বৌদ্ধসম্প্রদায় নিরীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও মহাযানী বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে বলে আপত্তি করা হয়েছে কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করেননি বুদ্ধদেবকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করে পূজার্চনা করেছেন। এটার একটা বিকল্প ব্যাখ্যাও হতে পারে তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বৌদ্ধরা এই ধর্মকে সমাজের কাছে আরও বেশি করে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এবং কৌলিন্য বজায় রাখতে বুদ্ধদেবকে পূজার্চনা করেছেন কিন্তু কোন নিত্য, শাশ্বত, জগৎস্রষ্টা, জগতসংহারক রূপ ঈশ্বরে তারা বিশ্বাস করেননি। এছাড়া মহাযানী বৌদ্ধদের ঈশ্বরখন্ডন প্রসঙ্গে নাগার্জুনকৃত 'ঈশ্বরকর্তৃকত্বনিরাকৃতি' এবং ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থে যে যুক্তির উপস্থাপনা করা হয়েছে তারই আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থাধ্যায়ে সাংখ্যের নৈতিকতা এবং নিরীশ্বরবাদের আলোচনা করা হয়েছে। আপাতভাবে নিরীশ্বরবাদী হিসাবে সাংখ্যের পরিচিতি হলেও প্রাচীন সাংখ্যাচার্যদের কেউ

কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে করা হয়। এমনকি সাংখ্যের সমানতন্ত্র হিসেবে যে যোগ দর্শনের পরিচিতি সেখানে ঈশ্বর বিশ্বাসকে নৈতিক জীবন যাপনের প্রতিসঙ্গী হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তাই সাংখ্যের নৈতিকতা ঈশ্বর বিশ্বাস নিরপেক্ষ বলে অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে নৈতিক জীবনের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের যোগ আবশ্যিক নয় বরং আকস্মিক। প্রথমে একথা মনে রাখতে হবে যে সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, যুক্তিদীপিকা প্রভৃতি উপলব্ধ গ্রন্থগুলিতে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিবরণ রয়েছে সেখানে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। সাংখ্যতত্ত্ববিদ্যায় প্রকৃতি হতে জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে সেখানে প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্যকে গুণবৈষম্য তথা অভিব্যক্তির নিমিত্ত হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। বন্ধন হতে জীবের মুক্তির যে প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে সেখানেও ঐশী করুণার কথা ব্যক্ত হয়নি। এপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত এবং তার অপব্যাখ্যার নিরসনও করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সাংখ্যে জগতের উৎপত্তি ও সাধকের মুক্তির জন্য অতিন্দ্রিয় ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকার না করে জড় জগতের আলোচনার উপর সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছেন। সাংখ্য মতে সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ দুটি তত্ত্ব প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ। মহর্ষি কপিল জগৎ বিষয়ক পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই পঞ্চবিংশতি জ্ঞান লাভ করতে পারলে ব্যক্তির কৈবল্যলাভ অবশ্যম্ভব। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বগুলি হল– পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়– চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়– বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ। পঞ্চতন্মাত্র– রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। পঞ্চমহাভূত– ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ৩টি অন্তকরণ– বুদ্ধি/মহৎ, অহংকার, মন। প্রকৃতি এবং পুরুষ/আত্মা।

পঞ্চম অধ্যায়ে মীমাংসাসম্মত নিরীশ্বরবাদ এবং নৈতিকতার আলোচনা করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শন মূলত কর্মের দর্শন বা কর্মমীমাংসা। কোন কাজ করণীয় বা বিধি কোন কাজ কর্তব্য নয় বরং নিষিদ্ধ তারই পাঠ দেওয়া হয়েছে জৈমিনির দর্শনে। মীমাংসা দর্শন বেদকে একমেবাদ্বিতীয়ম হিসেবে মেনেছে। যা বেদ অনুমোদিত তাই কর্ম বা ধর্ম; আর যা বেদবিহিত নয় তা নিষিদ্ধ বা অধর্ম। এভাবে ধর্মাধর্মের পাঠ বেদ থেকেই গ্রহণ করেছে মীমাংসা সম্প্রদায়। প্রশ্ন হল এভাবে বেদ নির্দিষ্ট পথে জীবনযাপনের প্রণোদন কি? মোক্ষবাদী দর্শন হিসেবে মীমাংসা দর্শনও দুঃখ থেকে একান্তমুক্ত হওয়ায় বৈদিক পথে জীবন যাপন একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু বেদকে ধর্মাধর্ম পাপ-পূণ্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে মান্যতা দেওয়ার হেতু কি? এখানে ন্যায় বৈশেষিকরা হয়তো ঈশ্বর রচিত হওয়ার কারণে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রামাণিক হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু মীমাংসা মতে বেদ অপৌরষেয় এবং নিত্য। বেদ যেমন নিত্য তেমনি তা স্বতঃপ্রমাণ। স্বতঃপ্রমাণ সেই বেদের বিধি ও নিষেধকে মান্যতা দিয়ে জীবনযাপন মীমাংসা মতে মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ। কাজেই এই দর্শনে নৈতিক জীবন যাপন পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস নিরপেক্ষ। কুমারিলভট্ট, প্রভাকর, পার্থসারথি মিশ্র কিভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তিপ্রদান করেছেন তার-ই আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারে ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী দর্শনে নৈতিকতার সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কোন আবশ্যিক সম্পর্ক আছে কিনা বা বিকল্প কোন ব্যাখ্যা আমরা পাই কি না তার আলোচনা রয়েছে। নাস্তিক দর্শনে এই দুইয়ের মধ্যে যে আবশ্যিক সম্পর্ক নেই সে বিষয়ে আভাস দিলে ও আস্তিক নিরীশ্বরবাদী দর্শনে ঈশ্বরবিশ্বাসকে বিকল্প পথ হিসেবে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য মুক্তিলাভ হলে তার উপায় হিসাবে যেমন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা পাই তেমনি ঈশ্বরবিশ্বাস আরেকটি বিকল্প হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু নৈতিকতার সঙ্গে

ঈশ্বরবিশ্বাসের সম্বন্ধ আবশ্যিক এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। যদিও এপ্রসঙ্গে স্বামীজি এবং ঋষি অরবিন্দের ভিন্নমত এখানে উল্লেখিত হয়েছে অতিলৌকিকে বা ঐশী সত্তায় বিশ্বাস ছাড়া কোন মানুষের নৈতিক বাধ্যতাবোধ তৈরী হতে পারে কি না সে বিষয়ে তারা প্রশ্ন রেখেছেন। কোন অলৌকিকের বিশ্বাস ছাড়া পরকল্যাণের আদর্শে মানুষ উদ্বুদ্ধ হতে পারে না বলে স্বামীজীর বিশ্বাস। একথা স্পষ্ট করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন- 'হিতবাদের (বা প্রয়োজনবাদের) আদর্শ মানুষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না। অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি, তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না'।[৫৩]

[৫৩] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ১২৪।

জড়বাদী চার্বাক পরম্পরায় নৈতিকতা

প্রথম অধ্যায়

১. সূচনা- বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের এক আপন বৈশিষ্ট্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দৃষ্টিভেদ এবং সেই সঙ্গে ধর্ম, সাহিত্য এবং দর্শনভাবনায় বৈচিত্র্যের সমাহার ভারতভূমির সংস্কৃতিকে ঐতিহ্যমন্ডিত করে রেখেছে। ভারতীয় দর্শনে নানা সম্প্রদায় এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। ওই সম্প্রদায়গুলি কোনটি আস্তিক তো কোনটি নাস্তিক আবার কোনটি ঈশ্বরবাদী তো কোনটি নিরীশ্বরবাদী তবে বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস থাক বা না থাক ঈশ্বর বিশ্বাসী হোক বা না হোক প্রায় প্রতিটি দর্শনে কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের আলোচনা গুরুত্বলাভ করেছে যেমন প্রমাণ বিষয়ে বা যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় হিসেবে, জগত উৎপত্তির ব্যাখ্যা, নৈতিক জীবন যাপনের পথনির্দেশ বা নীতিশিক্ষা, দুঃখ মুক্তির পথনির্দেশ ইত্যাদি। প্রথাগত আধ্যাত্মবাদী ধারার বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার বিরুদ্ধে সংশয়ের বা প্রশ্নের অবতারণা লক্ষ্য করা যায় চার্বাক দর্শনে। চার্বাকরা প্রচলিত প্রথার বিরোধিতা করে নিরীশ্বরবাদী পরিমন্ডলে নৈতিকতার যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার আলোচনাই এই প্রারম্ভিক অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পাবে।

ভারতীয় সব দর্শন সম্পদায়ই কোন না কোন রূপে আধ্যাত্মবাদে আস্থাশীল তা সে আস্তিক বা নাস্তিক যাই হোক না কেন, এই ধারার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় চার্বাক দর্শনে। চার্বাক সম্প্রদায় প্রথম আধ্যাত্মিকতাবাদের বিরোধিতা করে জড়বাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৈদিক সমাজব্যবস্থায় যে আধ্যাত্মবাদী পরম্পরা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে একসময় মানুষের মনে নানান প্রশ্ন ও সংশয় জন্মাতে শুরু করে সেই সংশয় ও অবিশ্বাসের সূত্র ধরে

জড়বাদী চিন্তাচেতনা থেকে চার্বাক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। চার্বাকের উৎপত্তির সময়কাল নিয়ে বির্তকের অন্ত নেই এতদসত্ত্বেও আনুমানিক ৭০০-৪৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে চার্বাক আদর্শ প্রচারিত হয় বলে ধরা হয়[১]। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, বেদ এবং বৌদ্ধ বিভিন্ন সাহিত্যে চার্বাক দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও নাস্তিক, বার্হস্পত্য, লোকায়ত, দেহাত্মবাদী, অসুরমত, ভূতচৈতন্যবাদী, স্বভাববাদী হিসেবে এই চার্বাককে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্য ছাড়া ও বিভিন্ন বাংলাকাব্য, নাটকে এদের উল্লেখ পাওয়া যায় কাজেই চার্বাক দর্শনের প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।[২]

১.১ চার্বাক পরম্পরায় নানা সম্প্রদায়

কালিক অগ্রগতির সাথে সাথে চার্বাক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকরণের ঘটেছে, বিশেষত বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে চার্বাক অনুগামীরা অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই পরিবর্তনকে বিচারে রেখে বৈতন্ডিক, ধূর্ত, সুশিক্ষিত চার্বাকের নানা গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম সম্প্রদায় ভেদের উল্লেখ শুধু যে লৌকিক বিচারে লক্ষ্য করা যায় তাই নয় প্রামাণিক গ্রন্থে ও এরকম সম্প্রদায়ভেদ স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রমাণ প্রমেয় সংখ্যা নিরূপণ বিষয়ে মঞ্জরীকার তিন ধরণের শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মঞ্জরীকারের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিভিন্ন গ্রন্থে এই সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধে যেমন বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল- ১) বৈতন্ডিক, ২) ধূর্ত, ৩) সুশিক্ষিত।

---

[১] ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, চার্বাক চর্চা, পৃ-৪৪।

[২] তদেব।

বৈতন্ডিক চার্বাক:- বৈতন্ডিক চার্বাক সম্প্রদায়ের মূখ্য উপজীব্য বিষয় বিতন্ডা, পরমত খন্ডনই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কতর্ব্য। স্বতন্ত্র কোন উপদেশ এদের ছিল না। ঈশ্বর পরলোক বেদ এসব স্বীকার করা তো দূরস্ত সর্বজন স্বীকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ে ও তাদের সংশয় ছিল, সর্বত্র সন্দেহ ও সংশয় করা এদের প্রধান উদ্দেশ্য।[৩]

স্থূল/ধূর্ত চার্বাক:- দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত স্থূল চার্বাক সম্প্রদায়। এরা প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলেও অনুমান প্রমাণকে স্বীকার করতেন না। ধূর্ত চার্বাক মতে করতেন প্রমাণ প্রমেয় সংখ্যা এবং তার লক্ষণের নিয়ম করা অসম্ভব। ইন্দ্রিয় সুখলাভ এদের কাছে পরম পুরুষার্থ। অতিন্দ্রীয় সত্তা ঈশ্বর পরলোক জন্মান্তরকে কোন ভাবেই স্বীকার করতেন না এজন্য এদেরকে বিভিন্ন গ্রন্থে ধূর্ত চার্বাক বলে উল্লেখ করা হয়।

সুশিক্ষিত চার্বাক:- এই চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুমানকে স্বীকার করেছেন যদি ও সেই অনুমান প্রমাণের মর্যাদা পাবে কি না তা স্পষ্ট নয়।[৪] অনুমানকে প্রত্যক্ষপূর্বক এবং কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক বলে মনে করতেন। ধূমকে প্রত্যক্ষ করে তার কারণ বহ্নিকে অনুমানের বৈধতা দিলে ও ঈশ্বর, পরলোক পুনর্জন্ম এইরূপ অতিন্দ্রীয় সত্তা বিষয়ক প্রমাণের জন্য অনুমানকে বিবেচনা করেননি তারা। এইরূপ সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায় অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ বলে স্বীকার করেছেন তবে পশুসুলভ ঐহিক, দৈহিক, আত্মকেন্দ্রিক অসংযত সুখের পরিবর্তে সুক্ষ্মতর মানসিক সুখকে পুরুষার্থ বলেছেন। তিনটি চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ভেদ থাকা সত্ত্বে ও নৈতিকতার প্রসঙ্গে ৩টি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

---

[৩] "ন হি লোকয়তে কিঞ্চিৎ কর্তব্যমুপাদশ্যতে, বৈতন্ডিক কথৈবাসৌ ন পুনঃ কশ্চিদাগমঃ"– জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী*, অমিত ভট্টাচার্য (অনুঃ), পৃ. ১৯৯।

[৪] "অশক্য এব প্রমাণ সংখ্যানিয়ম ইতি সুশিক্ষিত চার্বাকাঃ"- তদেব।

১.২ প্রত্যক্ষৈকমাত্রপ্রমাণবাদ

চার্বাক নীতিদর্শনের ভিত্তিভূমি তাদের আধিবিদ্যক মতবাদ অর্থাৎ জড়বাদ। এই জড়বাদ চার্বাকের প্রমাণসম্মত মতবাদের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। চার্বাকের এই প্রমাণতত্ত্ব পরিচিত প্রত্যক্ষৈকমাত্র প্রমাণবাদী হিসাবে। এখানে বলা দরকার যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায়কে প্রমাণ নামে অভিহিত করা হয় ভারতীয় ঐতিহ্যে। এই প্রমাণের স্বরূপ ও সংখ্যা বিষয়ে নানা মত রয়েছে ভারতীয় পরম্পরায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যেমন অপ্রমাণবাদী সম্প্রদায়ের হদিস পাওয়া যায় তেমনি দশপ্রমাণবাদী সম্প্রদায়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য, সম্ভব, চেষ্টা, প্রতিভা ইত্যাদি নানা প্রমাণে আস্থা রেখেছেন নানা সম্প্রদায়। তবে চার্বাক প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণের মর্যাদা দেয়। সংশয় বিপর্যয় মুক্ত জ্ঞানকে প্রমা হিসেবে ধরলে সেই প্রমা লাভের একটি উপায় হতে পারে বলে চার্বাক সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন তা হলো প্রত্যক্ষ। জড়বাদী চার্বাক দর্শন সাক্ষাৎ ইন্দিয়লব্ধ জ্ঞানের সত্যতায় বিশ্বাসী। চার্বাক মতে যা কিছু সাক্ষাত ইন্দ্রিয়গম্য, বোধ্য এবং জ্ঞেয় কেবল তারই সত্যতা আছে এবং যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর তেমন জ্ঞান-ই বিশ্বাসযোগ্য ও অবশ্যস্বীকার্য। সেদিক থেকে চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলেছেন, এজন্য চার্বাকদের প্রত্যক্ষৈকমাত্র প্রমাণবাদী বলা হয়।

১.২.১ অনুমান, আগমের প্রমাণত্ব নিরসন- চার্বাক সম্প্রদায়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ অনুমান উপমান শব্দ প্রভৃতি যথার্থ জ্ঞান লাভের উপায় হতে পারে না। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ অনুভব। আমাদের পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান হয় তা সাক্ষাৎ অনুভব। প্রত্যক্ষ একমাত্র সাক্ষাৎ অনুভব,

প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত হয় না। কিন্তু তারা অনুমান উপমান এবং শব্দকে যর্থাথ জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করেন না। অনুমানের ভিত্তি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান চার্বাকরা স্বীকার করেন না। কারণ ব্যাপ্তিতে ব্যভিচারের আশঙ্কা হলে সেই ব্যভিচার আশঙ্কার নিবৃত্তি হতে পারে না বলে চার্বাকরা মনে করেন। তারা আরো বলেন যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব নয় কেননা যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি ব্যাপ্তি প্রকাশক এই সামান্য বচন কোনোভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ব্যাপ্তিজ্ঞান সংশয়াত্মক, সংশয় থেকে উৎপন্ন যে অনুমিতি জ্ঞান তা সম্ভাবনামূলক এই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক বলা চলে না। পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত চার্বাক অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন যদিও আস্তিক সম্প্রদায় স্বীকৃত অনুমান অপেক্ষা এটি ভিন্ন অর্থের বোধক হয়। চার্বাকরা স্বীকার করেন যে অনুমান প্রমাণ হোক বা না হোক আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনুমানের সাহায্য নিয়ে থাকি যেমন কেউ কিছু বললে কিংবা কোন বিশেষ রকম মুখভঙ্গি করলে তার সাহায্যে সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা অনুমান করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অন্যের মনের খবর পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য চার্বাক মতে অনুমান সঠিক অর্থে প্রমাণ না হলেও তার সম্ভাবনামূলক প্রামাণ্য মানতেই হয়। লোকসমাজে একথা ভেবে অনুমানকে প্রমাণ বলা হয় কিন্তু মনে রাখা দরকার সম্ভবতা ও নিশ্চয়তা এক জিনিস নয়। যা নিশ্চয়জ্ঞানের অব্যর্থ জনক নয় তাকে যথার্থ অর্থে প্রমাণ বলা চলে না। যা নিঃসংশয়ে ও অব্যভিচারীভাবে সম্যক জ্ঞানের জনক, তাকেই প্রমাণ বলা যায়। যা নিশ্চিত এবং অভ্রান্ত ব্যবহারের কারণ তাই সম্যক জ্ঞান বা প্রমা বলে চার্বাকরা মনে করেন। অনুমানের সম্ভাবনামূলক প্রামাণ্য থাকে এবং তার লোকব্যবহারে অনেক সময় প্রয়োজনীয় তা সত্ত্বেও অনুমানকে কোনভাবে প্রমাণ বলা যায় না। কারণ লোকব্যবহারের সাহায্যে প্রমাণ কান্ড গড়ে তোলা যায় না।

আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় আপ্তবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে বৈদিক বাক্য মাত্রই আপ্তবাক্য এবং আপ্তবাক্যই প্রমাণ। চার্বাক মতে বৈদিক বাক্য প্রমাণ নয় কারণ বেদকে তারা স্বীকার করেন না। বেদ বিষয়ে চার্বাকদের অভিমত হলো জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণেরা বেদ রচনা করেছেন এছাড়া বেদের অন্য কোন প্রয়োজন নাই এবং বেদবাক্য যেমন একদিকে দুর্বোধ্য অন্যদিকে পরস্পর বিরোধী ও বটে কোথাও কোথাও তা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে চার্বাকরা দেখিয়েছেন। সুতরাং বৈদিক বাক্য বা শব্দ কখনো প্রমাণ হতে পারে না বলে তারা মনে করেন।

১.৩ চার্বাক জড়বাদ

১.৩.১ জড়বাদ ও ভূতচতুষ্টয়বাদ- চার্বাকদের প্রমেয়তত্ত্ব প্রমাণতত্ত্ব নির্ভর। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষের অগম্য যা কিছু তা অসৎ বলে তারা মনে করেন। প্রত্যক্ষের সীমাই সত্তার সীমা। যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় তাকে চার্বাক দর্শনে সৎ বলে মানা হয়নি। জগত ব্যাপারে কোন নিয়ম কিংবা অলৌকিক বস্তুর কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় বলে অসৎ পদবাচ্য। আত্মা, জন্মান্তর, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্টশক্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষগম্য নয় বলে সৎ নয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি প্রত্যক্ষগম্য স্থুলভূতই সৎ। আকাশকে চার্বাকরা ভূত বলে স্বীকার করেন না। আকাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় বলে অসৎ। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ এই চতুর্ভূত একমাত্র সত্তা। প্রত্যক্ষযোগ্য পরমাণু সমূহের মিশ্রণ থেকেই জাগতিক বস্তুর উৎপত্তি। চার্বাক জড়বাদী হলেও পরমাণুবাদী নন। চতুর্ভূতের মিলনেই জড় এবং চেতন দেহ উৎপন্ন। চারটি ভূত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন দেহে চৈতন্যরূপ একটি নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটায়। দেহই চৈতন্যের জনক। নির্দিষ্ট পরিমাণে সুপারি, চুন, খয়ের একত্রিত করে চিবালে যেমন লাল রং জন্মায় একইভাবে চারটি ভূত বিশেষ পরিমাণে

মিলিত হলে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহকে বাদ দিয়ে চৈতন্য থাকেনা এবং দেহ বিযুক্ত চৈতন্য অসৎ। চতুর্ভূতই মিলিত হয়ে জাগতিক জড় এবং চেতন বস্তুর উৎপত্তি ঘটায় বলে চার্বাকদের এই মতকে জড়সর্বস্ববাদ এবং ভূতচতুষ্টয়বাদ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

১.৩.২ স্বভাববাদ ও যদৃচ্ছবাদ- চার্বাক মতে স্বভাব নিয়ম জগৎ বৈচিত্র্যের একমাত্র নিয়ামক। অর্থাৎ স্বভাব থেকেই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি, স্বভাবের জন্যই বস্তুসমুহের স্থিতি এবং স্বভাব নিয়মেই সেসবের বিলুপ্তি।[৫] স্বভাবই জগতের হেতু বা কারণ এছাড়া অন্য কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। এই স্বভাব বলতে চার্বাক দর্শনে পদার্থ সমূহের প্রতিনিয়ত যে শক্তির প্রকাশ তাকেই বুঝিয়েছেন। ভূতচতুষ্টয়ের অন্তর্নিহিত এই শক্তির নিয়মই স্বভাব নিয়ম। এই স্বভাব নিয়মেই চতুর্ভুতের স্থূল পরমাণু থেকে বৈচিত্র্যময় জগতের তথা চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। মৃৎ-পদার্থের স্বভাবের জন্য মৃত্তিকা থেকে ঘট উৎপন্ন হয়; তন্তু পদার্থের স্বভাবের জন্য তন্তু থেকে পট উৎপন্ন হয়। দৃষ্ট পদার্থের দ্বারা কার্যের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা গেলে অদৃষ্ট ঈশ্বর স্বীকার করা অনাবশ্যক বলে তারা মনে করেন। চার্বাকরা বলেন দৃষ্ট পিতা-মাতার স্বভাবজাত কামতৃপ্তি এবং বংশরক্ষার দায়িত্ব থেকেই প্রাণীর উৎপত্তি এমন ব্যাখ্যাই সঙ্গত। এসব ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের কল্পনা অনাবশ্যক।

চার্বাক মতে বস্তুর স্বভাবই তার গতি ও প্রকৃতির কারণ। অগ্নির উষ্ণতা, কন্টকে তীক্ষ্ণতা, ইক্ষুর মধুরতা, নিমের তিক্ততা, জলের শীতলতা ইত্যাদি কার্য, কর্তা সাপেক্ষ বা কারণ সাপেক্ষ নয়। জগতের সকল কিছুই চতুর্ভূতের স্বভাব নিয়মে উৎপন্ন হয় এবং

---

[৫] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন*, পৃ. ১০২।

তাদের নিজ নিজ ধর্ম পায়। চতুর্ভূত তার নিজ নিজ স্বভাববশেই পরস্পর সংযুক্ত হয়ে এবং এই বৈচিত্র্যময় জগতের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আবার স্বভাব বশেই চতুর্ভূত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জগতের বিনাশ ঘটাবে। জগতের উৎপত্তির ব্যাপারে কোন ঐশী সত্তা হিসাবে ঈশ্বরের স্বীকৃতি না দিয়ে তারা বস্তুর স্বভাবের উপরে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[৬] জগতের ব্যাখ্যায় চার্বাকদের ওই অভিমতকে স্বভাববাদ বলা হয়।

স্বভাববাদের আবার দুটি প্রকার রয়েছে একটি চরমপন্থী অন্যটি নরমপন্থী। নরমপন্থী মতবাদে কার্য ও কারণ এর মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকৃত না হলেও স্বভাবের কারণতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু চরমপন্থী স্বভাববাদে অর্থাৎ যদৃচ্ছাবাদে স্বভাবের কারণতাও অস্বীকৃত।[৭] যদৃচ্ছাবাদ অনুযায়ী জগতের বৈচিত্র্য যদৃচ্ছিক (Mere chance), আকস্মিক (accidental)। আগুনের উষ্ণতা, জলের শীতলতা, ইত্যাদি জাগতিক সকল কিছুই কর্তাবিহীন কারণবিহীন অহেতুক, আকস্মিক। নরমপন্থীদের মতে জগত কার্যকারণ নিয়মের অধীন না হলেও স্বভাব নিয়মের অধীন। যদৃচ্ছাবাদীদের মতে বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক, স্থিতি আকস্মিক, এবং বিলুপ্তিও আকস্মিক। যদৃচ্ছ বা যেমন তেমন ভাবে চতুর্ভুত পরস্পর মিলিত হয়ে এই জগতের উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

১.৩.৩ ভূতচৈতন্যবাদ ও দেহাত্মবাদ- চার্বাকগণ দেহাতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করেন না। আস্তিক সম্প্রদায় বা অধ্যাত্মবাদী সম্প্রদায় আত্মা বলতে দেহাতিরিক্ত এক সত্তার কথা স্বীকার করেছেন। অধ্যাত্মবাদীদের মতে দেহ এবং আত্মা এক নয় দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব আছে। দেহ জড়, আত্মা অজড়। চৈতন্য দেহের গুণ নয় আত্মার গুণ। আত্মার জন্ম নেই মৃত্যুও নেই। কেবলমাত্র চার্বাক সম্প্রদায় এই মতের বিরোধিতা করেছেন।

---

[৬] "স্বভাবঃ জগতঃ কারণম"- তদেব, পৃ. ১০৩।

[৭] তদেব।

দেহাতিরিক্ত আত্মা না মানলেও চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলে তারা স্বীকার করেছেন। এই চৈতন্য অতীন্দ্রিয় আত্মার ধর্ম নয় চৈতন্য হলো প্রত্যক্ষগোচর দেহেরই ধর্ম। সজীব দেহই আত্মা এবং চৈতন্য দেহের গুণ। এই দেহ ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ দ্বারা গঠিত। এই চারটি উপাদানের বিশেষ সংমিশ্রণের ফলে যে দেহ তাতে চৈতন্যরূপ এক নতুন গুণ আবির্ভূত হয়। যদিও চতুর্ভূতের কোনটিতেই চৈতন্য থাকে না, কিন্তু চতুর্ভূতের সংমিশ্রণের ফলে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়।

ধূর্ত চার্বাকগণ দেহকেই আত্মা বললেও সুশিক্ষিত চার্বাক অধ্যাত্ম্যবাদের দিকে কিছুটা এগিয়ে ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনকে আত্মা রূপে গণ্য করেছেন। যেহেতু দেহ অতিরিক্তভাবে কোন ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন এর কল্পনা করা যায় না তাই সুশিক্ষিত চার্বাক মতে দেহই আত্মা। তবে ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন ও ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে যে দেহ তার অতিরিক্ত আর কিছু নেই।

চার্বাকদের এই মতের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি করে বলতে পারেন চতুর্ভূতে পৃথকভাবে চৈতন্য না থাকলে তাদের সংমিশ্রণে চৈতন্যর উৎপত্তি হয় কিভাবে? এই আপত্তির উত্তরে চার্বাকগণ বলেন উপাদান দ্রব্য বা কারণে কোন গুণ উপস্থিত না থাকলেও উৎপন্ন কার্যে সেই গুণ উপস্থিত থাকতে পারে। অনেক সময় উপাদান দ্রব্যের বিশেষ সংমিশ্রণের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যে এক উন্মেষমূলক গুণের আবির্ভাব ঘটে যেমন পান, সুপারি, চুন, খয়ের এদের কোনোটির মধ্যে লাল রং নেই কিন্তু এদের একত্রে চর্বণ করলে সেই মিশ্রিত পদার্থের লাল আভা পাওয়া যায়। এছাড়া চাল গুড় ইত্যাদির মধ্যে মাদকতা শক্তি থাকে না কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সংমিশ্রণ করলে সংমিশ্রিত দ্রব্যে মাদকতা শক্তির উদ্ভব হয়। তেমনি ভূতচতুষ্টয়ের মধ্যে পৃথকভাবে চৈতন্য না থাকলেও এদের সংমিশ্রণের

ফলে দেহে নতুন গুণের আবির্ভাব হয়। কাজেই চার্বাক মতে চৈতন্য দেহ থেকে জাত, দেহকে কেন্দ্র করে চৈতন্যের জন্ম। দেহ বিনষ্ট হলে চৈতন্য ও বিলুপ্ত হয় এবং চতুর্ভূত থেকে উৎপন্ন দেহ চতুর্ভূতেই পরিণত হয়। দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্যের বিনাশ হয়। দেহ ভস্মীভূত হলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনা। দেহাতিরিক্ত আত্মা নেই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা চার্বাকদের এই মত দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ নামে পরিচিত।

১.৪ চার্বাক নীতিতত্ত্ব

ভারতীয় নীতিবিদার আলোচনায় কতকগুলি ধারণা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেগুলি ঈশ্বর বেদ এবং ধর্ম। ভারতীয় দর্শনালোচনায় যেখানেই আমরা নৈতিক আদর্শের আলোচনা পেয়েছি সেখানে কোন না কোন ভাবে এই তিন ধারণার প্রসঙ্গ দেখতে পাই। ঋকবেদে নৈতিক নিয়মকে 'ঋত' বলা হয়েছে এই নিয়মানুসারে ব্যক্তির জীবন এবং বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কোন কোন দর্শন সম্প্রদায়ের মতে বেদে যা উল্লিখিত এবং যা কতর্ব্য কর্ম বলে নিদের্শিত হয়েছে তাই ধর্ম। ধর্মশাস্ত্র প্রবর্তকরা মনে করেন ঈশ্বর উপাসনা, দান, ধ্যান, যজ্ঞানুষ্টান, পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পন, বেদ-উপনিষদরূপ ধর্মগ্রন্থ পাঠ এ সবই ধর্ম। এই জাতীয় কর্ম সম্পাদন করলে যে কোন মানুষ সৎপথে চালিত হতে পারে তাদের জীবন নৈতিক আদর্শাভিমুখী হতে পারে এবং সেই ব্যক্তির জীবদ্দশায় মোক্ষলাভের পথ প্রশস্ত হয়। একইভাবে ভারতীয় দর্শন গুলির নীতিতত্ত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মার ও ঈশ্বরের স্বীকৃতির অপেক্ষায় রাখে। কোন না কোনরূপে আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করে এবং তাকে ইহ ও পরজন্মে কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয় একথা ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশ সম্প্রদায় স্বীকার করে। এই সঙ্গে কর্মফল ভোগ হতে আত্মার চিরতরে মুক্তি ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির

ইস্পিত। কোন কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে নৈতিক জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করে। চার্বাক নীতিতত্ত্ব বেদ ঈশ্বর ধর্মকে নিত্য আত্মাকে পূর্বস্বীকার্য হিসেবে গ্রহণ করে না।

১.৪.১ নৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বেদ ও ঈশ্বর অস্বীকার- নাস্তিক এবং আস্তিক ভারতীয় প্রায় সব দর্শন সম্প্রদায়ই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে বিশ্বাসী সেগুলি হল- ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। কিন্তু চার্বাক দর্শন দুটি পুরুষার্থে আস্থাশীল প্রথমটি কাম দ্বিতীয়টি অর্থ। কামই মানব জীবনের মুখ্য পুরুষার্থ, সেই কাম সিদ্ধির জন্য যেহেতু অর্থের প্রয়োজন তাই অর্থকে তারা দ্বিতীয় পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। সে দিক থেকে চার্বাক দর্শনকে ভারতীয় পরম্পরায় ব্যতিক্রমী দর্শন বলা যায়। ভারতীয় দর্শনে এক সময় ত্রিবর্গের ধারণা প্রচলিত ছিল সেই ত্রিবর্গের মধ্যে যে কাম এবং অর্থ ছিল তা কিন্তু নয় ধর্মও সেখানে স্বীকৃত হত। এই চার্বাক সম্প্রদায় প্রথম ধর্মকে পুরুষার্থ হিসাবে মান্যতা দেননি। সে দিক থেকে ভারতীয় পরম্পরায় চার্বাককে একেবারেই ব্যতিক্রমী দর্শন সম্প্রদায় বলা যায়। ধর্ম ছাড়াও আস্তিক সম্প্রদায়গুলি বেদকে নৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকার করত। এছাড়া কোন কোন দর্শন সম্প্রদায় ঈশ্বরকেও নৈতিক নিয়মের নিয়ামক হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন কিন্তু চার্বাক সম্প্রদায় ধর্ম,বেদ এবং ঈশ্বর এই তিনটি ধারণাকে একেবারেই অস্বীকার করেন। সুতরাং চার্বাকের নৈতিক মতবাদকে বুঝতে গেলে তাদের বেদবিরোধী এবং নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা দরকার।

প্রত্যক্ষবাদী চার্বাক দার্শনিকরা তাদের নীতিতত্ত্বে বলেছেন যে স্বর্গলাভের কামনায় বেদোল্লিখিত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, দ্যান-ধ্যান কখনোই ধর্ম হতে পারে না। এগুলি মিথ্যা প্রবঞ্চনামাত্র। যে বেদকে আদর্শ মানদন্ড হিসাবে গণ্য করে কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করার তাগিদ অনুভব করা হয় সেই বেদ নানা স্ববিরোধী ও অপ্রমাণ দোষে দুষ্ট, চার্বাকরা

ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বলেন না কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব তারা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে জগৎ স্রষ্টারূপে বা জীবের কর্মফল দাতৃরূপে যে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করা হয় তার অস্তিত্ব প্রমাণিত নয়। 'প্রমেয়সিদ্ধি প্রমাণাদ্ধি'– অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় পদার্থের নিশ্চয় বা সিদ্ধি হয়।[৮] চার্বাক স্বীকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর রূপ প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধি হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয় সুতরাং ঈশ্বর স্বীকার করা সম্ভব নয়। চার্বাক দর্শনে অনুমান প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত না হওয়ায় ঈশ্বরের অস্তিত্বও অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে না। তাই চার্বাক মতে ঈশ্বর, পাপ, পূণ্য পরলোক প্রভৃতি অতিন্দ্রিয় পদার্থের কোন অস্তিত্ব নেই।[৯] অপর এক প্রামাণিক গ্রন্থ চার্বাক ষষ্ঠীতে ও বলা হয়েছে– **"দেবশ্চদস্তি সর্বজ্ঞ করুণাভাগবন্ধ্য বাক্। তৎ কি বাগ্ ব্যয়মাত্রান্নঃ কৃতার্থয়তি নার্থিনঃ।**[১০] অর্থাৎ পরম করুণাময় সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি বাস্তবিকই থেকে থাকেন তবে ভক্তের সাধনায় বা কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন না কেন? সংসারী মানুষের জীবনে দুঃখ দিয়ে কেনই বা বেরিতা তৈরী করেন? আর যদি বলা হয় স্ব–স্ব কর্ম-ই ফল নির্ধারণের মানদন্ড তাহলে আর ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি? সেক্ষেত্রে চার্বাকরা মনে করেন যে হিতের প্রাপ্তি এবং অহিতের পরিহার করার জন্য ব্যক্তিকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় কাজেই মঙ্গলময় বা পরম করুণাময় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী এরূপ যে মহৎগুণের আধার হিসেবে ঈশ্বর স্বীকার করার কোন অর্থ হয় না। এছাড়া বার্হস্পত্য সূত্রে ৭৫ নং সূত্রে ও "ঈশ্বরাসিদ্ধে" বলা হয়েছে অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ। এরূপ ঈশ্বরের ধারণাকে নিছক কল্পনা মাত্র বলে ও উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৮] দৃষ্টমনুমানমাপ্ত বচনঞ্চ সর্ব প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয় সিদ্ধির প্রমানাদ্ধি।।- *সাংখ্যকারিকা*-৪।

[৯] "নাস্তি সর্বজ্ঞঃ প্রত্যক্ষগোচরাতিক্রান্তত্বাৎ'- *বার্হস্পত্য সূত্র*-৭৯।

[১০] শাস্ত্রী, পঞ্চানন, *চার্বাক দর্শন*, পৃ. ২।

প্রসঙ্গত উল্লেখ কালক্রমে চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সুশিক্ষিত চার্বাক বলে পরিচিত তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণাতিরিক্ত অনুমান প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাহলে প্রশ্ন সুশিক্ষিত চার্বাকরা কি ঈশ্বর স্বীকার করেন? এর উত্তরে বলা যায় সুশিক্ষিত চার্বাকরা লৌকিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমান স্বীকার করলেও এমন অনুমান স্বীকার করেননি যার দ্বারা অপ্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে। অতিন্দ্রীয় কোন সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে তারা অনুমানকে স্বীকার করেননি বরং কার্য কারণ সম্বন্ধ যুক্ত প্রত্যক্ষের বিষয়াদির মধ্যে একটির প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে আরেকটির অনুমান করার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং এরূপ অনুমান প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর নয় বলে তাদের ও দাবি।

চার্বাকমতে ঈশ্বরোপসনা একটি মানসিক রোগ। বেদে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার যে নিদান দেওয়া হয়েছে তা একপ্রকার প্রতারণার সমান। কিছু সংখ্যক ভন্ড, ধূর্ত, প্রতারক নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য বেদের মত কাল্পনিক ভিত্তিহীন গ্রন্থের রচনা করেছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য দেখিয়েছেন আচার্য বৃহস্পতি কিভাবে বেদ শাস্ত্রকে সমালোচনা করেছেন এবং ভিত্তিহীন বলে প্রতিপাদন করেছেন। আমি তার গ্রন্থ দু-চারটি নিদর্শন দেখাবো-

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদন্ডং ভস্মগুন্ঠনম

বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা।।"

অর্থাৎ অগ্নিহোত্র, বেদ অধ্যায়ন, দন্ডধারণ ভস্মমাখা এই সমস্ত কর্ম বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিগণের উপজীবিকা। বেদ নির্দেশিত যজ্ঞ সম্পর্কে চার্বাক মত হল-

"পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গে জ্যোতিষ্টোম গমিষ্যতি

স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংসতে।।"

জ্যোতিষ্টম যজ্ঞে যে পশু বলি দেওয়া হয় তারা স্বর্গে যায় তাহলে যজমানরা নিজের পিতামাতাকে যজ্ঞে বলি দেয় না কেন? তাহলে পিতামাতার স্বর্গলাভের জন্য আলাদা করে শ্রাদ্ধাদি রূপ মিথ্যা প্রলোভন মূলক কর্ম সম্পাদন করতে হয় না।

"মৃতানপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধচেৎ তৃপ্তিকারণম

নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েত শিখাম্।।"

অর্থাৎ শ্রাদ্ধ যদি মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তির কারণ হয় তাহলে নিভে যাওয়া প্রদীপে তেল দিলে তা আবার জ্বলে উঠত, কিন্তু বাস্তবিক ভাবে এটা সম্ভব নয়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তা ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র বাস্তবিক ভাবে তা কখনোই কোন ভাবে ফলদায়ক নয়।

"ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তার ভন্ডধূর্তনিশাচরা

জর্ঝরী তুর্ফরীত্যাদি পন্ডিতানাং বচঃস্মৃতম।।"

অর্থাৎ ভন্ড ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোকই বেদের রচয়িতা সাধারণ মানুষের অবোধগম্য জঝরী তুর্ফরী ইত্যাদি ধূর্ত পন্ডিতগণের বাক্য।[১১]

এছাড়া সর্বদর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য বেদবিষয়ক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে বেদ বিষয়ক কর্মকান্ডের মধ্যে কিছু স্ববিরোধিতা, আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা মূলক নির্দেশ রয়েছে। যেমন বেদে অগ্নিহোত্র যাগ করার ক্ষেত্রে দুধরণের নির্দেশ আছে (১) সূর্যোদয় হলে অগ্নিহোত্র যাগ করতে পারবে। (২) অন্যত্র বলা আছে সূর্যোদয়ে হোম যাগ করা যায় না,

---

[১১] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (১ম খন্ড), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (সম্পাঃ), পৃ. ১৫।

করলে তার আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয় এটা স্ববিরোধী নির্দেশ বলাই যায়।[১২] আবার জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশুবলী দেওয়া হয়, এই মৃত পশুর মাংস কেবল-ই ব্রাহ্মণদের নৈবেদ্য হিসেবে দান করতে হবে সেগুলি কেবল ব্রাহ্মণরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। যজ্ঞে পশুবলী দেওয়া হয় যজমানদের কল্যাণে এবং মৃত পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়ে থাকে তাহলে সেই পশুর মাংস কেবল ব্রাহ্মণের জন্য নির্ধারিত, যজমানের অধিকার থাকবে না কেন? সর্ব্বোপরি পরম কল্যাণময় ঈশ্বর যদি সবার কল্যাণ চায় তাহলে কোন জীবের প্রাণের বিনিময়ে তিনি কি প্রকৃত সন্তুষ্ট হন? এ প্রশ্ন প্রতিটি নীতি পরায়ণ মানুষের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান পত্নী মৃত অশ্বের শিশ্ন (Sexual organ) গ্রহণ করিবেন– এই ধরণের নির্দেশ ভন্ড অসাধু লোকের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব। সুশিক্ষিত চার্বাক মনে করেন এই নির্দেশ নারী জাতির প্রতি অবমাননা। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পুত্র লাভ হয় এই বিশ্বাস থেকে নারীদের উপর যে নির্দেশ করা হয়েছে তা অমানবিক অপমান জনক। তাছাড়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে ও বহুক্ষেত্রে পুত্র সন্তান তো দূরস্ত কোন সন্তান লাভ হয়নি এমন নিদর্শন ও আছে।

সুতরাং চার্বাকমতে বেদোক্ত ঈশ্বর এবং বেদের কর্তারূপে যে ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়ে থাকে তা ভ্রান্তিমূলক। ঈশ্বরপ্রেম বস্তুত অলীক বা কল্পিত বস্তুতে প্রেম। ঈশ্বরের ধারণা আসলে কল্পনাবিলাস মাত্র। চার্বাকরা মনে করতেন ধূর্ত, ভন্ড, প্রতারকগণ ধর্ম ভাবনাকে পণ্যে পরিণত করেছেন, আর এটি সম্ভব হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাস জনিত মোহের কারণে। মানুষ যদি এই মোহ ত্যাগ করতে পারত তবে হয়ত ধর্মব্যবসা সম্ভব হত না। চার্বাকদের উক্ত বক্তব্যকে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলা যায় না কেননা খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে স্বয়ং কৌটিল্য পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন যে, "রাজকোষে অভাব

---

[১২] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন*, পৃ. ৮২।

ঘটলে নতুন কোন দেবতার আবির্ভাব ঘটাতে হবে"।[১৩] সেজন্য চার্বাকরা সর্বোতভাবে ঈশ্বরের ধারণাকে পরিহার করেছেন, চার্বাক মতে ঈশ্বরের যখন কোন অস্তিত্ব নেই তখন নৈতিকতার আদর্শ রূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা নিতান্তই মুর্খামির পরিচয়। কাজেই ন্যায়নিষ্টতা, নীতিপরায়ণতার সঙ্গে ঈশ্বর কোন ভাবেই সম্পৃক্ত হতে পারেনা। চার্বাকরা অতিন্দ্রীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও জগতের পালক হিসেবে, বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।[১৪]

১.৪.২ রাজাজ্ঞাই নিয়ম- রাজাই শাসক হবার জন্য তিনি দুর্জনকে শাস্তি দেন, সৎজনকে বা সুজনকে যথোপযুক্ত সম্মান ও যথার্থ প্রাপ্য দেন। রাজাই পালক, রক্ষক ও পরিচালক হিসেবে সাধারণ মানুষের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করে থাকেন। তার অনুগ্রহে মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারী হন আবার তিনি ক্রুদ্ধ হলে বিনাশ অনিবার্য। রাজাকে ঈশ্বর রূপে স্বীকৃতি দানের জন্য অনুমান লব্ধ প্রমাণের প্রয়োজন নেই প্রত্যক্ষ দ্বারা তা প্রমাণিত। চার্বাক মনে করেন যে দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী কার্যসিদ্ধির জন্য যিনি বিবিধ রূপ ধারণ করতে পারে তাকে ঈশ্বর বললে অত্যুক্তি হয় না। এজন্য চার্বাক মতে দেশের রাজাই হল ঈশ্বর।[১৫]

এক্ষেত্রে অবশ্য যারা চার্বাক বিরোধী দর্শন সম্প্রদায় বা যারা ঈশ্বরবাদী তারা আপত্তি করে বলতে পারেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। রাজার পক্ষে সমগ্র জগতের উপাদান কারণের জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। আর উপাদান কারণের জ্ঞান না থাকলে কার্যের ব্যাখ্যা করা বা কার্যের কর্তা হওয়া সম্ভব হয় না।

---

[১৩] গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত, *চার্বাক দর্শন*, পৃ. ৬৪।

[১৪] লোকসিদ্ধো ভবেদ রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ- *চার্বাক ষষ্ঠী*-৫৮।

[১৫] "লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরত্ব"- *বাহস্পত্য সূত্র*-৮৫।

জগতের উপাদান কারণ পরমাণু সমুহ প্রত্যক্ষের অগোচর হওয়ায় স্বীকার করতে হবে যে সৃষ্টির আদিতে দ্ব্যনুকাদির কর্তা কেউ আছেন যিনি উপাদান কারণের স্রষ্টা বা অধিষ্ঠাতা তিনিই ঈশ্বর। অল্পজ্ঞ একদেশদর্শী রাজাই কখনোই জগতের কর্তা হতে পারেন না। চার্বাকরা অবশ্য শুধু এই কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সম্মত ছিলেন না। চার্বাকরা মনে করতেন স্বভাব নিয়মের দ্বারা জগতের সৃষ্টিও বিনাশ হয়। স্বভাবাতিরিক্ত কোন কর্তার স্বীকৃতি এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। **"স্বভাবো জগতঃ কারণম। স্বভাববাদেব জগৎ বৈচিত্র্যম উৎপদ্যতে। স্বভাবতো বিলয়ং যাতি। স্বভাব এব হেতুঃ। স্বাভাবিকং জগদিদম্"**[১৬] অর্থাৎ স্বভাব জগতের কারণ, এই স্বভাব হইতেই জগত বৈচিত্রের উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয়, স্বভাব নিয়মেই ভূতচতুষ্টয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থুল পরমাণু হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি। স্বভাব নিয়মেই জড় চৈতন্যময় এই জগৎ বৈচিত্রের উদ্ভব। চার্বাক দর্শনের পূর্বে সাংখ্য দর্শনে ও স্বভাববাদের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। সাংখ্য দর্শনে জগতের উৎপত্তি এবং জগতের বৈচিত্র্যের কারণ হিসেবে স্বভাবের স্বীকৃতি দিয়েছেন। উপাদান কারণের স্বভাবের দ্বারা জগৎ ও জগতের বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কপিল সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ১১৫ এর শ্লোকে বলা হয়েছে যে "উপাদান নিয়মাৎ"– অর্থাৎ কার্য উপাদানে সুপ্ত অবস্থায় বা সংগুপ্ত থাকে বলে উৎপাদনের জন্য উপাদান গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত। যেমন ঘটের জন্য মৃত্তিকা গ্রহণ করে, অগ্নি নয়, পটের জন্য সুতো গ্রহণ করে, জল নয়।

ঈশ্বর বিশ্বাসী চার্বাক বিরোধী সম্প্রদায় আরো প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, চার্বাকরা যে সুখের কথা বলেছেন তা যদি বাস্তবিক ভাবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে জগৎ সংসারে উশৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি না মেনে নেওয়া হয় তাহলে

---

[১৬] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন*, পৃ. ১০২।

পুণ্যাত্মার সুখ এবং পাপীর শাস্তি বিধান করবেন কে? কিসের জন্য মানুষ পাপ কাজ থেকে বিরত হবে আর কিজন্যই বা মানুষ পুণ্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করবেন? এর উত্তরে চার্বাকদের অভিমত রাজাই দেশের কর্তা। রাজাই দন্ডনীতির নির্ধারক। তিনি কর্ম অনুযায়ী ফলদান করবেন। নিরীশ্বরবাদী হলে ও চার্বাকরা কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ব্যাতীত চার্বাকরা সমাজ সংসারে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। চার্বাকরা সুস্থ সুন্দর মর্যাদা সম্পন্ন জীবন ধারণের জন্য বাস্তবিক মানবের অতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় অতিমানবের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।

চার্বাক দর্শনে রাজার মান্যতা দেবার কারণ হল রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর আস্থা স্থাপন। চার্বাকগণ বিশ্বাস করেন যে রাজাই হল দন্ড মুন্ডের কর্তা। তিনি সকল মানুষের সুখ দুঃখের বিষয়টি বিচার বিবেচনা করবেন। তিনি এমন নীতি প্রণয়ণ করবেন যাতে সবার সুখ লাভ হবে। আবার যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরী করে দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন তাদের শাস্তি ও দেবেন। চার্বাকগণ রাজার নীতি ততটাই গ্রহণযোগ্যতার স্তরে রেখেছেন যত দূর অবধি তিনি অপরের সুখলাভের কথা ভেবেছেন এবং সেই ভাবনার দ্বারা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে থাকেন। সুতরাং চার্বাক দর্শনে রাজা যেমন প্রজাদের সুখের চিন্তা করে রাজকার্য চালানোর মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্টা করেছেন তেমনি সাধারণ মানুষও ইন্দ্রিয় সুখ ও সংযত সুখ লাভে প্রবৃত্ত হয়ে রাজাদেশ পালনের মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপন করেছেন।

১.৪.৩ স্থুল আত্মসুখবাদী নৈতিকতা- জড়বাদী চার্বাক নীতিতত্ত্বে সুখভোগকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করা হয়েছে।[১৭] কাম একমাত্র পুরুষার্থ, এই কাম বলতে কেবল

[১৭] "কাম এবৈক পুরুষার্থঃ"- *বার্হস্পত্য সূত্র*-৬৫।

যৌনসুখ একথা জোর দিয়ে বলা যায় না তবে মূলত ইন্দ্রিয় সুখকে কাম শব্দের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন এরা; অন্তত তাদের নানা উক্তি থেকে একথা বিবক্ষিত হয়। দেহ সম্ভোগ বা ইন্দ্রিয় সুখই জীবের চরম লক্ষ্য বা পুরুষার্থ। চার্বাক মতে স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য এসব মানব জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না কেননা এগুলি ধূর্ত পুরোহিতদের সৃষ্টি, এগুলি কাল্পনিক বিষয়মাত্র। মৃত্যুর পর জীবদেহ চতুর্ভূতে বিলীন হয়ে যায় সুতরাং মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ পরলোক প্রাপ্তির ধারণা অবান্তর। "যতদিন বাঁচ সুখে বাঁচ"- একথার দ্বারা মূলত ঐ ইন্দ্রিয় সুখকে নির্দেশ করা হয়েছে, একই ভাবে কালকের হরিণের তুলনায় আজকের কপোত শ্রেয় এ ধরণের উক্তি দ্রুত রসনা তৃপ্তি চার্বাকের ঈপ্সিত একথা স্পষ্ট হয়।

অবশ্য সুখলাভ মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ একথা যে কেবল চার্বাকগণ বলেছেন এমন নয়, বৈদিকযুগে ঋষিগণ– "স্বর্গকামো যজেত", "পুত্রকামো যজেত" এই সব বাক্যদ্বারাও সুখলাভই যে মানব জীবনের কাঙ্খিত বিষয় সেকথা বুঝিয়েছেন। তাছাড়া সুখকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে মান্যতা না দিলেও তা যে সকল সম্প্রদায়ের ঈপ্সিত তার পরিচয় পাওয়া যায় বর্গসমূহের তালিকায় কামকে অন্যতম বর্গ হিসাবে স্বীকার করা দ্বারা। একসময়ের মোক্ষের ধারণা প্রচলিত ছিল না, সে সময় ত্রিবর্গের কথা বলা হত এবং তার মধ্যে কামের উল্লেখ ছিল পরবর্তীকালে পুরুষার্থ হিসাবে মোক্ষের ধারণা প্রচলিত হয় এবং চতুর্বর্গের ধারণা প্রসার লাভ করে। তবে সেই মোক্ষ সাধারণ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, মুমুক্ষ-র সংখ্যা ছিল কোটিকে গুটিক। এমনকি পুরুষার্থ বিন্যাসে প্রথমে ধর্মের উল্লেখ করা হলেও সেই ধর্মের সার্থকতা অর্থ এবং কামের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে। ধর্মের মূল্য অনেকখানি পরতঃ। সব সম্প্রদায়ের কাছে সুখ-ই অন্যতম কাম্য স্বতঃমূল্যবান বস্তু। সেই সুখলাভ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে অর্থ ও ধর্মের অবতারণা। জীববৃত্তি নির্বাহ না হলে আধ্যাত্মিক উত্তরণ যে অসম্ভব সেই সহজ সত্যটি আস্তিক নাস্তিক কোন দার্শনিক সম্প্রদায়

অস্বীকার করেনি। রজগুণের স্ফূর্তি না ঘটলে যে কোনো রূপ অগ্রগতি সম্ভব হয় না সেই বিবেচনা বিবেকানন্দ-র মতো সন্ন্যাসী ও স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন, "খালি পেটে ধর্ম হয় না", "গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো" এই ধরনের উক্তি সেই সহজ সত্যটিকে ইঙ্গিত করে। চার্বাক দর্শনে যেমন দৈহিক সুখভোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তেমনি এরিষ্টপাস থেকে এপিকিউরাস প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তকদের ভাবনায় ও স্থুল সুখলাভ জীবনের লক্ষ্য মনে করা হয়েছে। একই মতাদর্শের প্রতিধ্বনি আমরা পেয়ে থাকি বেন্থামীয় সুখবাদের মধ্য। স্থুলসুখ ও পরিমাণগত ভাবে অধিক সুখের আদর্শ উপযোগবাদী জেরেমী বেন্থাম দ্বারা ও সমর্থিত হয়েছে। বেন্থাম সুখের পরিমাপ নির্ধারক সাতটি মানের কথা উল্লেখ করেছেন যাকে সুখের সপ্তমান হিসেবে আমরা জানি সেগুলি হল- ১) তীব্রতা ২) স্থায়িত্ব ৩) নৈকট্য ৪) নিশ্চয়তা ৫) বিশুদ্ধি ৬) উর্বরতা ৭) বিস্তৃতি। ভবিষ্যতের সুখ অপেক্ষা বর্তমানের সুখ, দূরের সুখ অপেক্ষা কাছের সুখ যে বেশি কাম্য সেকথা সুখের নৈকট্য ধারণা দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। নিশ্চয়তা দ্বারা একথা সূচিত হয় অনিশ্চিত সুখ অপেক্ষা নিশ্চিত সুখ অধিকতর কাম্য। চার্বাক দর্শনের সঙ্গে বেন্থামের সুখের নৈকট্য ও নিশ্চয়তা বিষয়ক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

চার্বাক মতে কাম্যবস্তু মানুষের প্রেয়। প্রেয়বস্তু লাভ করার পর মানুষ যে সুখ পায় তার থেকে বেশী আনন্দদায়ক আর কিছু হতে পারে না। চার্বাকগণ মনে করতেন দেহধারণ এবং তার পরবর্তী জীবনযাত্রার মূল উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয় সুখলাভ। ইহ জাগতিক সমস্ত প্রকার সুখ সম্ভোগ হল বেঁচে থাকার লক্ষ্য ও আদর্শ। চার্বাকগণ দৈহিকসুখ বা 'কাম' এবং কামের সাধন নিমিত্ত 'অর্থ' লাভকে জীবনের পুরুষার্থ হিসেবে বিবেচনা করতেন। যদি ও সুখলাভের ক্ষেত্রে চার্বাক নীতিতত্ত্ব বিশেষ এক স্বতন্ত্র নীতি দ্বারা পরিচালিত ছিল। চার্বাকগণ বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবন সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা দুঃখকে

সর্বাত্মক পরিহার করে সুখলাভে প্রবৃত্ত হবেন। দুঃখ মিশ্রিত বলে সুখকে উপেক্ষা করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। অবর্জনীয় বা অনপনেয় হিসাবে কোন দুঃখ যদি সুখের সঙ্গে এসে পড়ে তাহলে সেই রূপ দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে সুখলাভে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়। যেমন মাছে কাঁটা থাকে বলে মৎস্য প্রিয় মানুষ মাছ পরিত্যাগ করে না তেমনি দুঃখ মিশ্রিত থাকে বলে সুখের প্রতি অনীহা প্রদর্শন মূর্খতার-ই সমান ।

ভোগবাদী চার্বাকরা ভোগীর সুখ ক্ষণিক বলে তাকে পরিত্যাগ বা অবহেলা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তারা ক্ষণকে মিথ্যা বলেননি। বাগানে যে ফুল ফোটে তার স্থায়িত্ব অপেক্ষা বাড়িতে সাজিয়ে রাখা কৃত্রিম ফুলের স্থায়িত্ব বেশী, তাই ক্ষণিক হলে ও বাগানের ফোটা ফুল থেকে যে সুরভি লাভ তাকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। চার্বাকরা অনিশ্চিত সুখলাভ অপেক্ষা নিশ্চিত সুখলাভে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষপাতী; আগামী কাল অনিশ্চিত ময়ূরলাভের সম্ভাবনা আছে বলে আজকের নিশ্চিত কপোত লাভের সুখ থেকে বঞ্চিত না হবার পক্ষপাতী।[১৮] 'যদতীতং তন্নতে'– অতীত তোমার নয়, ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস কোরো না, কেবল বর্তমান কে প্রত্যক্ষ কর, উপলব্ধি কর এবং যথাসম্ভব উপভোগ কর।

সুখবাদী চার্বাক ইহজাগতিক সুখলাভকে জীবনের পরম পুরুষার্থ বললেও সুখলাভের পদ্ধতি সুখের প্রকৃতি কেমন হবে সে সম্বন্ধে অভিন্ন মত ছিলেন না। চার্বাক একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক, স্থুল/অসংযত, সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়োপভোগ জন্য সুখকেই পরম পুরুষার্থ বলেছেন তাঁরা মনে করতেন যদিও এইরূপ সুখ একান্তই পশুধর্মী হলেও ইন্দ্রিয়সুখ বা শরীরের সুখলাভের জন্য এরূপ সুখ থেকেও তারা বঞ্চিত হতে রাজী ছিলেন না। তবে অসংযত সুখ

---

[১৮] 'যদতীতং তন্নতে'– অতীত তোমার নয়, ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস কর না, কেবল বর্তমানকে প্রত্যক্ষ কর, উপলব্ধি কর এবং যথাসম্ভব উপভোগ কর- শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন*, পৃ. ১৩৮।

যে সমাজের পক্ষে বিপদজনক তা স্বীকার করেছিলেন সুশিক্ষিত চার্বাকরা। সুখভোগের আকাঙ্খাকে সংযত করতে না পারলে সুখভোগ এবং ভোগজনিত তৃপ্তি পরাহত হবে। পশুসুলভ সুখ সুখ পদবাচ্য নয়। একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক সুখকে পরিত্যাগ করতে না পারলে সামাজিককর্তব্য এবং সামাজিকসম্পর্ক বজায় রেখে জীবন যাপন করা অসম্ভব। সুশিক্ষিত শ্রেণীর চার্বাকগণ উদার, বহুজনোপভোগ্য সংযত সুখ লাভের পক্ষপাতী ছিলেন।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে আরো এক শ্রেণীর শিক্ষিত চার্বাক উপনিষদের ঋষিদের সুরে বলেছেন যে– 'ভূমৈব সুখম'– অর্থাৎ ভূমা বা আনন্দই হল সুখ। সুখ দুঃখের মিশ্রণ এই মানব জীবনে দুঃখকে পরিহার করে যে সুখ সেই সুখের নাম 'ভূমা' বা 'আনন্দ'। জীব মাত্রেরই জৈবিক প্রয়োজনে নানা রকম আকাঙ্খা থাকে, জৈবিক প্রয়োজনে যে আকাঙ্খা তার পরিতৃপ্তি আছে কিন্ত আনন্দের আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি নেই। এই শ্রেণীর চার্বাক জৈবিক সুখকে সুখ বলে স্বীকার করেন না তাঁরা উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে একই সুরে বলেছেন যে– "নাল্পে সুখমস্তি ভূমাত্বের বিজিজ্ঞামিতব্যঃ" অর্থাৎ অল্প সীমায়িত জৈবিক সুখ সুখই নয়, অসীম আনন্দ পরিতৃপ্তিহীন আনন্দময় সুখই ভূমা। এই ভূমা বা আনন্দ লাভ মানুষের পুরুষার্থ হওয়া উচিত।[১৯] একটি বিষয় উল্লেখ না করলে চার্বাক সুখবাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেটি হল- চার্বাকদের স্থুল আত্মসুখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অপরাপর ভারতীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে তা যে সর্বত্র খুব যুক্তিযুক্তভাবে করা হয়েছে তা নয় বহুক্ষেত্রে চার্বাকের অভিমত বলে এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ ও খন্ডন হয়েছে যেগুলি আদৌ চার্বাক সম্মত নয়। যেমন- "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃত পিবেৎ"। এরূপ একটি শ্লোকের দৃষ্টান্ত আমরা পেয়ে থাকি এই শ্লোকের সূত্রধরে

---

[১৯] তদেব, পৃ. ১৩৯।

জনমানসে এইরূপ ধারণা প্রচলিত হয়ে আছে যে চার্বাক দর্শনে অসংযত আত্মসুখের কথা বলে যা সমাজের পক্ষে বিপদজ্জনক।

১.৪.৩.১ অপব্যাখ্যার নিরসন- বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে সোসিয়লিজম (Socialism) মত চার্বাকদের "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃত পিবেৎ" এ নিয়ে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু জিনিসটা প্রকৃতপক্ষে যে কি তার খোঁজ আমাদের দেশে খুব কম লোকই রাখত। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই এক কথাতেই যেমন সমস্ত চার্বাক দর্শনের বিশদ তাৎপর্য আমাদের বুঝিয়ে রাখা হয়েছে, সেই রকম সমস্ত ধনী লোকের ধন সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেবার নাম যে Socialism সেই ধারণা আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে তখনও প্রায় বদ্ধমূল হয়েছিল।[২০]

আমাদের জানতে হবে যে 'ঋণ করে ঘি খাওয়ার' কথাটা কিভাবে চার্বাক দর্শনে এল। এটি কি সংযোজিত শব্দ না কি চার্বাকরা প্রকৃত-ই এরকম চরম সুখবাদী ছিলেন? খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সায়ন মাধবাচার্য সর্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে শ্লোকটির উত্থাপন করেছেন এভাবে "যাবদ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ" অর্থাৎ যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে; প্রয়োজনে ধার করে ঘি খাবে ছাই হয়ে যাওয়া দেহ কোথায় থেকে আবার ফিরে আসবে। মাধবাচার্য এটাও উল্লেখ করেন যে উক্ত শ্লোকটি বৃহস্পতি আচার্যের, কিন্তু কোন উদাহরণ দিয়ে বা স্থানোল্লেখ করে দেখাতে পারেননি যে এটি বৃহস্পতি বলেছেন।

---

[২০] ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, পৃ. ২৯০।

আবার সায়ন মাধবাচার্য নিজেই সর্বদর্শনসংগ্রহের গোড়ায় এই শ্লোকটিকে ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে– 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচর ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"। অর্থাৎ যতকাল জীবিত থাকবে ততকাল সুখে জীবন অতিবাহিত করবে মৃত্যুর অগোচর বা বিনাশ রহিত কিছু নেই ভস্মীভূত দেহ পুনরায় আগমন কি কারণে করিবে? এক্ষেত্রে সায়ণ মাধব কোথাও বৃহস্পতি আচার্যের নাম করেননি এই শ্লোকটিকে একটি লোকগাথা বলে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে হয়ত শ্লোকে ইচ্ছাকৃত ভাবে তিনি বিকৃত করেছিলেন অথবা চার্বাক সুখবাদের চরমতম আকার বোঝাতে এমন 'ঋণং কৃত্বা' শব্দের সংযোজন ঘটিয়েছেন। এই শ্লোকটি প্রথম পাওয়া যায় বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ নামে একটি উপপুরাণে। রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা এই উপপুরণটিকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের বলে শনাক্ত করেছেন। তাহলে সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের প্রায় হাজার বছর আগের গ্রন্থ হল বিষ্ণুধর্মোত্তর উপপুরাণ সেখানে বলা আছে– ধন হরণ করার ইচ্ছায় ধূর্তরা এইভাবে মোহিত লোকদের প্রতারণা করে। যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে মৃত্যুর অগোচর কিছুই নেই, ছাই হয়ে যাওয়া প্রাণহীন দেহ কোথা থেকে আবার ফিরে আসবে? দান আহুতি আচার দেবতা ঋষি কিছুই নেই।[২১] দ্বাদশ শতক থেকে উক্ত শ্লোকটির বিকৃতি শুরু হয়। জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্র গুণরত্ন ব্রাহ্মণ্যধারার কবি শ্রীহর্ষ এনাদের অভিমত হল সায়ন মাধবাচার্য শ্লোকটিকে বিকৃত করেন,একমাত্র সায়ণ মাধব 'ঋণ করে ঘি খাওয়া' এরূপ উদ্ধৃতি করেছেন। আর উপপুরাণ যদি শ্লোকটির আদি উৎস হয় তাহলে এটা পরিষ্কার যে কোন

[২১] "মুগ্ধা এবং প্রতার্ণন্তে ধূর্তের ধন জিহীর্ষয়া যাবদ জীবং সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোর অগোচরম ভস্মীভূতস্য শান্তস্য পুনরাগমং কুতঃ নাস্তি দত্তং হুতং চেষ্টং ন দেবা ঋষয়ো ন চ"- *বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ*-১/১০৮।

যথাযথ চার্বাক উৎস থেকে শ্লোকটি পাওয়া যায়নি সুতরাং চার্বাক নীতি তত্ত্বের এই বিকৃতি সহজেই বাতিল যোগ্য।[২২]

[২২] ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, পৃ-২৯১।

নাস্তিক-নৈতিকতার জৈন ঐতিহ্য

২.১ সূচনা- ভারতীয় ঐতিহ্যে নাস্তিক্যবাদী ধারার যে সকল দর্শনে নীতি নৈতিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম একটি হল জৈন দর্শন। একদিকে বৈদিক ব্রহ্মবাদকে যেমন এই দর্শন অস্বীকার করে তেমনি বেদবিহিত মতে ও পথে কর্মকরার ধারাকে ও অমান্য করে। তথাপি মুক্তিবাদ ও কর্মবাদের চিরায়ত ভারতীয় ধারাটি অক্ষুণ্ণ এই দর্শনে। কী ব্রহ্ম কী ঈশ্বর কী অতিন্দ্রীয়তত্ত্ব কোনকিছুকেই পূর্বস্বীকার্য হিসেবে না মেনেও যে নৈতিক জীবনযাপন করা যেতে পারে তার পাঠ দেয় এই দর্শন। এই নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক দর্শনে নীতি নৈতিকতাকে যেভাবে দেখানো হয়েছে তার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

প্রতিটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের নীতিবিদ্যক আলোচনার মুখ্য বিষয় হল মুক্তি। যদিও এই মুক্তির প্রকৃতি এবং মুক্তি লাভের উপায় নিয়ে ভিন্নমত প্রচলিত। এতদসত্ত্বেও ভারতীয় সবসম্প্রদায় মুক্তি বলতে জীবনের অসারতা উপলব্ধি এবং আত্মার স্বরূপে অবস্থানকেই বুঝিয়েছেন। আত্মার প্রকৃতি বা স্বরূপ এবং মুক্তিলাভের উপায় বা সাধন বিষয়ে নানা মতপার্থক্য থাকলেও মুক্তিলাভের জন্য কর্মসম্পাদন যে একমাত্র পথ সে বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে সবসম্প্রদায় সহমত পোষণ করেছেন। এই কর্ম বলতে প্রায় সকল দর্শনে অবশ্য নিষ্কাম কর্মকেই বোঝানো হয়েছে। ফলের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে এবং কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে এই নিষ্কাম কার্যসম্পাদনের কথা বলা হয়েছে ভগবদগীতায়। অন্যদিকে মীমাংসা দর্শনে বেদবিহিত কর্মকেই প্রকৃত কর্ম বলা হয়েছে। জৈনদর্শনও নীতিমার্গের দর্শন, তাদের সমগ্র দর্শন আলোচনার বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে মুক্তিলাভ এবং নৈতিক জীবন চর্চার প্রসঙ্গ।

জৈনদর্শনে অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা অপেক্ষা নীতিবিদ্যার আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে অনেকবেশী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এই নীতি দর্শনের পরিচয় প্রদান করা এবং তা যে অতিন্দ্রীয় সত্তায় বিশ্বাসের অপেক্ষা রাখে না সেই বিষয়টি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা যাক।

'জৈন' শব্দটি এসেছে 'জিন' শব্দ থেকে যার অর্থ জয় করা বা জয়ী। 'যিনি সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করিয়া সকল তত্ত্ব জয় করিয়াছেন তিনিই জিন"।[১] অন্যভাবে বললে "রাগ দ্বেষ, (কর্মসন্যাসময়,) বিক্ষেপ ও আচরণ মুক্ত যে তত্ত্বজ্ঞানী তিনিই জিন"।[২] 'জৈন' এই নামের মধ্যে রয়েছে আদর্শপথ অনুসরণের দ্বারা জীবনযাপনের নির্দেশনা। জাগতিক বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য ভিক্ষুর মুক্তি লাভের সহায়ক। অহংসত্তার বিসর্জন এবং সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবার মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তির মুক্তিলাভের সম্ভাবনা।

২.২ জৈন তত্ত্ববিদ্যা

জৈন দর্শনের নৈতিক ভাবধারা আধ্যাত্মিক পটভূমিতে ব্যাখ্যা করা হলেও জৈন নীতিতত্ত্বের সঙ্গে জৈন অধিবিদ্যক আলোচনা ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত। তাই জৈন নৈতিকতাকে বুঝতে গেলে জৈন অধিবিদ্যাকে বিশেষত জৈন পদার্থতত্ত্ব বা জগৎতত্ত্বকে জানতে হবে। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন শাখা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্ব বিষয়ক ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পদার্থের প্রকৃত ধর্মকে তত্ত্ব বলা হয়। তত্ত্বজ্ঞান তখনোই হয় যখন অবিপরীতভাবে বা যথাভুত ভাবে পদার্থের

---

[১] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (অনুঃ), পৃ. ৬২।

[২] "রাগদ্বেষাদি দোষান বা কর্মশত্রুন জয়তীতি জিনঃ" ভট্টাচার্য, অভিজিৎ, *জৈন দর্শনের রূপরেখা*, পৃ. ৩।

প্রকৃত ধর্ম উদ্ভাসিত হয়। যে পদার্থ যেমন তাকে তেমন ভাবে জানলে তত্ত্বের জ্ঞান হয়।[৩] তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে জৈনদর্শনে ভিন্নমত প্রচলিত। জৈনদর্শনে ৫ প্রকার তত্ত্বের কথা স্বীকার করেছেন– আকাশ, ধর্ম, অধর্ম, কাল এবং পুদগল। উমাস্বাতী তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে সাতটি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন– "জীবাজীবাস্রববন্ধসম্বরনির্জরামোক্ষাস্তত্ত্বম্। ১/৪"। জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জরা ও মোক্ষ কোথাও কোথাও এই ৭টি ছাড়া ও পাপ ও পুণ্য এই দুইটি সহযোগে মোট ৯টি তত্ত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

জীব- জৈনমতে জীব হল চেতনস্বভাব, জ্ঞাতা, স্বনির্ভর অনাদি। জৈনশাস্ত্রে জীবকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জীব অনন্তজ্ঞান, অনন্তপ্রজ্ঞা, অনন্ত শক্তি, এবং অনন্ত আনন্দের অধিকারী। অনন্তচতুষ্টয় সম্পন্ন জীব সকল প্রকার বাহ্যহেতু জনিত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় তাকে মুক্তজীব বলে গণ্য করা হয়। জীব যখন মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে 'কেবলী' হয় তখন এই মুক্তজীব এই চারটি অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। জীব জাগতিক অজ্ঞানতা ও অপূর্ণতার আবরণে আবৃত থাকে বলে নিজের অনন্ত ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারে না। জীবের আদর্শ অবস্থা থেকে বিচ্যুতি হওয়ার কারণ হল পুদগলের সাথে নিজের স্বাভাবিক পার্থক্য বুঝতে না পারা এবং নিজেকে কর্মপুদগলের আবরণে আবৃত করা অর্থাৎ একপ্রকার অজীবের সাথে মিশ্রিত করে ফেলা। যে জীব যত বেশী এই অজ্ঞানতা বা অপূর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে সে তত বেশি পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হবে।

---

[৩] "যোহর্থো যথা ব্যবস্থিতস্তস্যার্থস্য তথা ভাবো ভবনং তত্ত্বমুচ্যতে"- সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), পৃ.৭৮।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জীবের বদ্ধাবস্থার মাত্রার উপর নির্ভর করে মোক্ষ লাভের কোন স্তরে জীবের বর্তমান অবস্থিতি। এই বিচারে জৈনগণ জীবকে দুভাগে ভাগ করেছে– (১) স্থাবর (২) ত্রস।

'ত্রস' জীবকে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যানুসারে একেন্দ্রিয়, দ্বিন্দ্রিয় এভাবে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হিসাবে বিভক্ত করা হয়। জীব তার আচরণের দ্বারা পুদগলমুক্তির মাধ্যমে তার অবস্থার পরিবর্তন এবং নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করতে পারে। তাই জীব অবশ্যই সক্রিয়।

অজীব- জীব ছাড়া বিশ্বের বাকি সমস্তই অজীব। অজীব মোক্ষ লাভের অনুপোযুক্ত। এই অজীব ৫ প্রকার- পুদগল, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, কাল। প্রথম চারটি অস্তিকায় কারণ এরা ত্রিকালে ব্যাপ্ত। কাল হল অনস্তিকায় কিন্তু নিত্য। কারণ কাল কোন স্থান ব্যেপে থাকে না তাই অনস্তিকায়।

আস্রব- উমাবতী বর্ণিত তৃতীয় তত্ত্বটি হল আস্রব -"কায়বাঙ্মনঃকর্মযোগঃ স আস্রবঃ"[৪]। জীবের কামনা বাসনার ফলে কর্ম পুদগল আত্মায় প্রবেশ করে জীব বা আত্মাকে বদ্ধ করে। জীবের এই বন্ধন দশাকে আস্রব বলে। সিক্ত বস্ত্র যেমন তার সমগ্র অংশ দিয়ে বায়ুবাহিত ধূলি কণাকে গ্রহণ করে তেমন কষায়রূপ জলে সিক্ত আত্মা আস্রব আনীত কর্মকে নিজের সম্পূর্ণ অবয়বের দ্বারা গ্রহণ করে। অন্যভাবে বললে উত্তপ্ত লৌহ পিন্ডকে জলে ফেললে যেমন নিঃশেষে জল কণাকে শোষণ করে তেমনি কষায়োঞ্চ/কষায়গ্রস্থ জীব যোগানীত কর্ম সকল দিক থেকে গ্রহণ করে। কষায় বলতে ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রূপ আসক্তিপূর্ণ কর্মকে বোঝানো হয়।[৫] কতিপয়

---

[৪] *তত্ত্বার্থসূত্র*– ৬/১।

[৫] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), পৃ. ৯৩।

জৈন দার্শনিক মনে করেণ যে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি পুরুষকে বিষয়ামুখী করে তাকেই আস্রব বলে। 'আস্রবয়তি পুরুষম"[৬]। আস্রব শুভ এবং অশুভ ভেদে দুই প্রকার (১) শুভ) (২) অশুভ। যা পুণ্যের হেতু তাই শুভ আস্রব এবং যা পাপের হেতু তা অশুভ আস্রব।

বন্ধ- "মিথ্যাদর্শনাবিরতিপ্রমাদকষায়যোগাবন্ধহেতব। ৮/১" জীবে, অজীব পুদগলের প্রবেশের ফলে বন্ধনদশা সৃষ্টি হয়। অনন্ত অবয়বযুক্ত পুদগলসমূহ সুক্ষ্মভাবে জীবের শরীরে প্রবেশ করে অণু-দ্ব্যণুকাদি ক্রমে কর্মরূপে পরিণতি লাভের সামর্থ্য অর্জন করে। মিথ্যাদর্শন বা সম্যকদর্শনের অভাব, অবিরতি বা সম্যকচরিত্রের অভাব, প্রমাদ বা অমনোযোগ কষায় বা আবেগ এবং যোগ বা কর্ম এদের জন্য জীব পরমাণুসমুহ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয় একেই বলে বন্ধ। উমাস্বাতী তত্ত্বার্থসূত্রে বন্ধের লক্ষণ করেছেন এভাবে– "সকষায়ত্বাজ্জীবঃ কর্মনো যোগ্য পুদগলানাদত্তে স বন্ধঃ। ৮/২"

সম্বর- "আস্রব নিরোধঃ সম্বরঃ। ৯/১" সম্বর শব্দের অর্থ হল সংবরণ বা নিয়ন্ত্রণ করা। জীবকে কর্মপুদগল সংযোগ থেকে রোধ করাকে সম্বর বলা হয়। সম্বর হল আস্রব প্রতিরোধকারী মানসিক শক্তি। জৈনমতে আত্মায় কর্মপ্রবাহের অবাধ প্রবেশ হল বন্ধনের কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মায় কর্মানুপ্রবেশ রুদ্ধ করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার যথার্থ স্বরূপ যে শুদ্ধজীব তা অপ্রকাশিত রয়ে যায়। সম্বর আত্মায় কর্মপ্রবাহকে প্রতিরোধ করে। গুপ্তি, সমিতি, প্রভৃতি যে যে উপায়ের দ্বারা আত্মায় কর্মের প্রবেশ প্রতিহত করা সম্ভব হয় তারই নাম সম্বর।

নির্জরা- "সগুপ্তিসমিতিধর্মানুপ্রেক্ষাপরিষহ জয়চারিত্রৈঃ তপসানির্জরা চ। ৯/২" জীব যখন কর্মপুদগল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায় তখন তার অনুসৃত পথ হল নির্জরা। সেই অর্থে

---

[৬] তদেব, পৃ. ৯৫।

নির্জরা একটি পথ বা ক্রিয়া যা অনুযায়ী জীবকে কর্মপুদগল থেকে মুক্ত করা সম্ভব। স্পঞ্জকে জলমুক্ত করার জন্য যেমন পেষণের দরকার হয় তেমনি জীবের পুদগল মুক্তির জন্য নির্জরা রূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। নির্জরা ২ প্রকার যথা- ১। বিপাকজ- এই প্রকার নির্জরায় কোন প্রচেষ্টা ব্যতীতই নিদিষ্ট সময় উপস্থিত হলে জীব পুদগল মুক্ত হয়। ২। অবিপাকজ- এই নির্জরার ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীব পুদগল মুক্ত হয়। এই প্রচেষ্টা হল তপস্যা। সর্বপ্রকার ক্লেশ ও ত্যাগ সাধনের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ করাই অবিপাকজ নির্জরা। এই তপস্যা বলতে গুপ্তি, সমিতি, ধর্মানুপ্রেক্ষা, পরিষহ পালনের কথা বলা হয়েছে।

মোক্ষ- "মোহক্ষয়াজজ্ঞানদর্শনাবরণান্তরায়ক্ষয়াচ্চ কেবলম। ১০/১" মোক্ষ হল বদ্ধাবস্থা থেকে জীবের মুক্তি। মোক্ষ জীবের মুক্ত ও আদর্শ অবস্থান। কর্মপুদগলের অন্তিম অংশটি যখন জীব থেকে বিযুক্ত হয় তখনই মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়। এই স্তরে জীব জ্ঞানাবরক, দর্শনাবরক, জাগতিক কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সম্যক দর্শন, জ্ঞান, চারিত্রের অধিকারী হয়।

২.২.১ জৈনের অনেকান্তবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি- অনেকান্তবাদের ধারণা থেকে জৈনদের নৈতিক আদর্শের পরিচয় পাই। অনেকান্তবাদ বহুত্ববাদকে গুরুত্ব দেয়। অন্য সকল মতাদর্শের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা, বিশ্বাসজ্ঞাপন করা, বিপরীত ও বিরুদ্ধ মতবাদ গুলিকে বিচার বিবেচনা করার শিক্ষা জৈনধর্মে পাওয়া যায়। জৈন বহুত্ববাদকে গুরুত্ব দেবার জন্য সত্য ও বাস্তবতাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। অনেকান্তবাদী হওয়ার জন্যই এমন মুক্তমনস্ক হওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়। জৈনরা জগতের সৃষ্টি ও সংহার কর্তা রূপে কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করতেন না। এমনকি মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তির ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে জৈনগণ কোনভাবে সমর্থন করেননি। জৈনমতে প্রতিটি জীবের মধ্য অনন্ত সম্ভাবনা

লুকিয়ে আছে। অনন্ত আনন্দ, অনন্তশক্তি, অনন্ত শুদ্ধজ্ঞান, অনন্ত অন্তর্দৃষ্টি এরূপ অনন্ত অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে যদি সঠিক পরিচর্যা করেন তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের যোগ্যতায় 'কেবলজ্ঞান' লাভ করতে সক্ষম। জৈনধর্মে দেহধারী পুণ্যাত্মাকে 'অরিহন্ত' (বিজয়ী) এবং দেহহীন পুণ্যাত্মাকে 'সিদ্ধ' (মুক্তাত্মা) বলে অভিহিত করেছেন। যে সকল অরিহন্ত অন্যব্যক্তিদের মুক্তিলাভে সহায়তা করেন তাদেরকে তীর্থঙ্কর বলে অভিহিত করেছেন জৈনরা। জৈনরা মুক্তিলাভের জন্য কোন অতিন্দ্রীয় সত্তায় বিশ্বাস অপেক্ষা তীর্থঙ্করদের নির্দেশিত পথ অবলম্বনে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। জৈনমতে তীর্থঙ্করদের উপর বিশ্বাস রেখে ব্যক্তির কঠোর সাধনাই মুক্তির একমাত্র পথ।

২.৩ নীতিচিন্তায় ত্রিরত্নের স্থান

জৈন মতে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-নির্জ্ঞান, সংসারী নির্বিশেষে যে কোন মানুষ স্বচেষ্টায় মোক্ষ লাভের পথ সুগম করতে পারে। কেবলজ্ঞানীও হয়ে উঠতে পারেন। এর জন্য কোন অতিন্দ্রিয় সত্তার উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। মুক্তির জন্য জৈনদর্শনে নিষ্টার সঙ্গে ত্রিরত্ন পালনের নির্দেশ দিয়েছেন উমাস্বাতি তত্ত্বার্থসূত্রে বলেছেন– সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্র এই তিনটি রত্ন মিলিত ভাবে মুক্তির সাধন।[৭] এই ত্রিরত্নের আলোচনার মধ্যেই ঈশ্বর নিরপেক্ষভাবে আমরা নৈতিক আদর্শের নিদর্শন পাই কি না সেটাই আলোচনা করা যাক–

সম্যকদর্শন- উমাস্বাতী তত্ত্বার্থ সূত্রে সম্যক দর্শন বলতে "তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগদর্শনম্"-কে বুঝিয়েছেন। জীব থেকে মোক্ষ পর্যন্ত যে কয়টি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন সেই নিরূপিত তত্ত্বের

[৭] 'সম্যকদর্শনজ্ঞানচরিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"- *তত্ত্বার্থসূত্র*, ১/১।

প্রতি শ্রদ্ধাকেই সম্যক দর্শন বলা হয়।[৮] অন্যভাবে বললে, "জীব প্রভৃতিতত্ত্ব যে রূপে অবস্থিত অর্হৎগণ সেভাবে তাহাদের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তত্ত্বের বিরুদ্ধ অর্থের প্রতি অভিনিবেশ পরিত্যাগ-ই সম্যকদর্শন"।[৯] জৈনকথিত তত্ত্বের প্রতিই প্রীতিদর্শন হল সম্যক দর্শন। এই তত্ত্বজ্ঞান স্বভাব হতে অথবা গুরুর শিক্ষা হতে লাভ করা সম্ভব বলে জৈন সম্প্রদায় মনে করতেন। জৈন দর্শনে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলা হয় 'কেবলী'। যারা তত্ত্ব বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং জাগতিক বিষয়ের বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন এরূপ পুরুষ হলেন 'জিন' বা 'কেবলী' বা 'তীর্থঙ্কর'। এদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার কথা জৈন দর্শনে বলা হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে পথানুসরণ করে মুক্তি ঘটেছে সেই পথের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেই পথ অনুসরণের কথা ও বলা হয়েছে জৈন নীতিশাস্ত্রে। মুক্তির জন্য জৈনরা কোন অতিন্দ্রিয় সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সাধনার দ্বারা যারা মুক্তি পেয়েছে তাদের নির্দেশিত পথের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

যদিও সম্যকদর্শন বা শ্রদ্ধা বলতে কোথাও অন্ধবিশ্বাসকে বোঝাননি, তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বলতে ব্যক্তির যুক্তি, বিচারবিশ্লেষণ ও মননের দ্বারা শ্রদ্ধেয় বিষয়কে গ্রহণ করা বুঝিয়েছেন। এর দ্বারা ঈশ্বর তথা অতিলৌকিকে বিশ্বাস বা আস্থাজ্ঞাপন যে শ্রদ্ধা নয় সেকথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সম্যক দর্শন বলতে এক্ষেত্রে বিচারসম্মত শ্রদ্ধাকেই বোঝায়। সুতরাং জৈন দর্শনে কুসংস্কার মুক্ত হয়ে বৌদ্ধিক বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সাধনার মাধ্যমে মুক্তিলাভের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যে অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন জৈন পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'মুদা', জৈন মতে মুক্তিকামী ব্যক্তিকে তিন ধরণের 'মুদা' থেকে দূরে

---

[৮] তদেব, ১/২।

[৯] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (সম্পাঃ), পৃ. ৬২।

থাকতে হয়– (১) লোকমুদা, (২) দেবমুদা, (৩) পাষন্ডীমুদা। লোকমুদা হল সাধারণ লৌকিক বিশ্বাস, দেবমুদা হল কল্পিত ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং পাষন্ডীমুদা হল পাষন্ডে বিশ্বাস।[১০] এই ত্রিবিধ অন্ধবিশ্বাস থেকে মনকে মুক্ত করতে পারলে সম্যক শ্রদ্ধা বা সম্যক দর্শনের অধিকারী হওয়া যায়। তীর্থঙ্করদের উপদেশ সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ ও অনুশীলন করলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। সাধারণ মানুষ যতই তীর্থঙ্করদের উপদিষ্ট তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করবেন ততই তারা তীর্থঙ্করদের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হবেন, ততই সাধক সম্যক দর্শনকে আত্মস্থ করতে পারবেন।

সম্যক জ্ঞান- তত্ত্বগুলি যে রূপে অবস্থিত সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে মোহ ও সংশয় ও বিপর্যয় মুক্ত হয়ে সেভাবে তত্ত্বগুলিকে জানাই হল সম্যক জ্ঞান। সম্যক জ্ঞানকে মোহমুক্ত ও সংশয়রহিত হতে হবে। সরলগদ্যে শ্রুতসাগরসুরি সম্যক জ্ঞান পদটিকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে– "যেন যেন প্রকারেণ জীবদয়ঃ পদার্থাব্যবস্থিতা বর্তন্তে তেন তেন প্রকারেণ মোহসংশয় বিপর্যয় রহিতং পরিজ্ঞান সম্যগ্‌জ্ঞানম"[১১]। জীব প্রভৃতি পদার্থ যে স্বরূপে অবস্থিত অর্থাৎ তাদের যে যথার্থরূপ বা তত্ত্ব যা সমস্ত মোহ ও সংশয় হতে মুক্ত হয়ে তাদের যথার্থ স্বরূপকে যথাযথভাবে জানাই সম্যকজ্ঞান।[১২] সম্যকজ্ঞান ৫ প্রকার যথা- ১) মতি, ২) শ্রুত, ৩) অবধি, ৪) কেবল, ৫) মনঃপর্যায়[১৩]।

---

[১০] চক্রবর্তী, মালবিকা, *নৈতিকতা ও নিরীশ্বরবাদ*, পৃ. ৫২।

[১১] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (দ্বিতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), পৃ. ৬৬।

[১২] "যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্ বিস্তরেণ বা।
যোঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং মনীষিঃ।।"- তদেব, পৃ. ৬৩।

[১৩] "মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্যায় কেবলানি জ্ঞানম্।"- *তত্ত্বার্থসূত্র*, ১/৯।

১) মতি- জ্ঞানাবরণ কর্ম যা আত্মাকে আচ্ছাদিত রাখে এরূপ আবরণ অপসৃত হলে যে যথাযথ মনন হয় তার নাম 'মতি'। ঘটের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হলে প্রথম যে মননাত্মক জ্ঞান হয় তাকে বলে মতি। মতি জ্ঞান স্মৃতি জ্ঞান থেকে ভিন্ন কারণ স্মৃতি কেবল অতীত কালীন পদার্থ বিষয়ক হয়। কোন প্রেক্ষাগৃহে নাটক দেখতে বসে দর্শক যবনিকা অপসারণের অব্যবহিত পূর্বে কোন পাত্র বা পাত্রী আসছেন এধরণের ঔৎসুক্যবশত যবনিকায় মনোব্যাপারপূর্বক দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেন, মতি সেরকম প্রথমক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান। মতি জ্ঞান অনুমানাত্মক, মতি জ্ঞান হল পরোক্ষজ্ঞান। এই জ্ঞান বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হওয়ায় এটি ইন্দ্রিয় নির্ভরশীল জ্ঞান। মানসপ্রত্যক্ষ, প্রত্যভিজ্ঞা, অনুমিতি প্রভৃতি মতি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

২) **শ্রুত**- জ্ঞানের আবরণের অধিকতর ক্ষয় হলে মতি থেকে উৎপন্ন হয় যে স্পষ্ট জ্ঞান তাকেই শ্রুত বলে। শ্রুত জ্ঞান চিহ্ন প্রতীক বা শব্দের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আপ্ত বা বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির বাক্য থেকে শ্রুত জ্ঞান হয়। শ্রুত জ্ঞানের পূর্বে মতি জ্ঞান স্বীকার করতে হয়। মতি জ্ঞানে যা প্রাথমিক, শ্রুত জ্ঞানে তা স্পষ্ট।[১৪] শ্রুত জ্ঞান শব্দজ্ঞান।

৩) **অবধি-** সম্যক দর্শনের দ্বারা জ্ঞানের আবরণ ক্ষয় হলে অবিচ্ছিন্ন বস্তু বিষয়ক জ্ঞান অর্জিত হয় যার নাম অবধি। এই অবধি জ্ঞান স্থান, কাল ও অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই অবধি জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বস্তু আবৃত বা দূরস্থ হলেও সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। অবধি জ্ঞান সাক্ষাতজ্ঞান, দূরস্থিত বস্তু প্রত্যক্ষ (Clairvoyance) ও দূরস্থিত শব্দের শ্রবণ (Clairaudience) অবধি জ্ঞানের ক্ষেত্রে হয়।

---

[১৪] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (দ্বিতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), পৃ. ৬৭।

৪) **মনঃপর্যায়**- কোন ব্যক্তির ঘৃণা, ঈর্ষাদির ক্ষয় হলে অপরের মনোগত (Telepathy) বিষয়ের যে স্পষ্ট জ্ঞান হয় তাকে মনঃপর্যায় বলে। মনঃপর্যায় হল অন্যের চিন্তাবিষয়ক সাক্ষাত জ্ঞান। অন্যব্যক্তির বর্তমান ও অতীত চিন্তাবিষয়ক সাক্ষাত জ্ঞান হল মনঃপর্যায়।

৫) **কেবল**- যে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে শ্রমণরা সদাব্যাপৃত সেই নির্বাধ স্বয়ংপ্রকাশিত স্পষ্টজ্ঞানকে 'কেবল জ্ঞান' বলা হয়। সম্যক চরিত্রের দ্বারা সকল জ্ঞানাবরণের ক্ষয় হলে তবেই কেবল জ্ঞান অর্জিত হয়। তখন দেশ বা বস্তুর বাধা না থাকায় জীব সর্বজ্ঞ হয়। এটি মোক্ষ সাধনীভূত তত্ত্বজ্ঞান। কেবলজ্ঞান কেবলমাত্র বন্ধনহীন শুদ্ধ আত্মার হয়ে থাকে। কেবলজ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ছাড়া হয়ে থাকে। এই জ্ঞানকে অনুভব করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। এই পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে মতি, শ্রুত হল পরোক্ষ জ্ঞান বাকি অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান।[১৫]

সম্যক চরিত্র- জৈনসম্মত ত্রিরত্নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল সম্যক চরিত্র। যে কর্মের জন্য ব্যক্তিকে সংসার দশায় আবদ্ধ হয়ে কষ্ট পেতে হয় সেই কর্মের উচ্ছেদ বা নিবৃত্তির জন্য যেরূপ কর্মের অনুশীলন করা হয় তাকে বলা হয় সম্যক চরিত্র। জৈন দর্শনে হিতকর কর্মের অনুশীলন এবং অহিতকর কর্মের পরিত্যাগকে সম্যক চরিত্র বুঝিয়েছেন। যে সমস্ত কর্মের জন্য সংসারে বার বার আসা যাওয়া করতে হয় এইরূপ কর্মের উচ্ছেদে যত্নবান, শ্রদ্ধাবান ও জ্ঞানবান পুরুষ পাপকর্মের নিবৃত্তির জন্য যেরূপ কর্মের অনুশীলনে রত থাকেন তাকেই সম্যক চরিত্র বলে। অর্হৎ এগুলিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

---

[১৫] S, Radhakrishnan, *Indian Philosophy* (Vol-1), J.N Mohanty (ed.), Page- 243-244.

সর্বথবিদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চরিত্রমুচ্যতে
কীর্ত্তিতং তদাহিংসাদিব্রতভেদেন পঞ্চধা
অহিংসাসূনৃতাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।[১৬]

যেনতেন প্রকারেণ পাপসংসর্গ ত্যাগ করাকে সম্যক চরিত্র বলে মনে করা হয়েছে। সম্যক চরিত্র গঠন আসলে এমন এক প্রকার আদর্শ জীবনযাপনের ইঙ্গিত বহন করে যা সাধকের মুক্তির জন্য যেমন অতিপ্রয়োজন একই ভাবে আদর্শ সমাজ গঠনের সহায়ক ।কারণ এই সম্যক চরিত্র গঠনের মধ্যেও জৈন সম্মত নৈতিক ভাবধারার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। জৈন নীতিতত্ত্বে সম্যকচরিত্র পালনের জন্য কতকগুলি আচরণ পালনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল– ক) পঞ্চমহাব্রত খ) গুপ্তি গ) সমিতি ঘ) ধর্মপালন ঙ) অনুপ্রেক্ষা চ) পরিষহ

২.৩.১ পঞ্চমহাব্রতের আদর্শ- সম্যক চরিত্র লাভের জন্যে সাধক বা জৈন পরিভাষায় যাদের শ্রমণ বলা হয় তাদেরকে পঞ্চমহাব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চমহাব্রত হল 'অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ'। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

অহিংসা- 'অনবধানতা' বা 'প্রমত্ততা'বশত চর এবং অচর পদার্থের প্রাণহানি না করাকে বলা হয় অহিংসা। অহিংসার সদর্থক ও নঞর্থক দুভাবে ব্যাখ্যা হতে পারে। সদর্থক দৃষ্টিতে অহিংসা বলতে প্রতিটি জীবের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাকে বোঝান হয়েছে। নঞর্থক দৃষ্টিতে বড় বা ছোট বা অতিসূক্ষাতিসূক্ষ্ম জীবের ক্ষতিসাধন না করাই অহিংসা। জৈনগণ জগতের প্রতিটি জীবের প্রতি বিন্দুমাত্র হিংসা প্রদর্শন না করাকে জীবনের পরমাদর্শ হিসাবে গণ্য করেছেন। জৈনগণ যে কোন ধরণের জীবের প্রতি প্রেমদান, অকৃত্রিম ভালোবাসাদানে বিশ্বাসী। কারণ

[১৬] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (সম্পাঃ), পৃ. ৬৪।

তাঁরা বিশ্বাস করতেন সর্বজীবে প্রেমদানের মাধ্যমে নিজের জীবন ও অন্যের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। প্রতিটি জীবের মধ্যে সমান সম্ভাবনা আছে। যে কোন জীব কঠোর সাধনার দ্বারা তীর্থঙ্কর স্তরে পৌঁছতে পারেন কাজেই কোন জীবহত্যা করার অর্থ হল তাঁর মধ্যেকার অনন্ত সম্ভাবনাকে হত্যা করা, তার অধিকারকে বিনষ্ট করা যা জৈন দর্শনে কোনভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। অহিংসাব্রত বিষয়ে জৈনগণ এতটাই কঠোর যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কোন অতিসুক্ষ্ম জীবের যাতে মৃত্যু না ঘটে তার জন্য নাসিকায় একখন্ড বস্ত্র বা নাসিকাজালিকা ব্যবহার করতেন। জৈনগণ বিশ্বাস করেন যে, অহিংসা জীবের কায়িক, বাচিক, মানসিক কর্মকে শুদ্ধ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মঠবাসী, সন্ন্যাসীদের জন্য অহিংসাব্রত কঠোরভাবে পালন করার নির্দেশ দিলেও গৃহীদের জন্য অহিংসা ব্রতের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। কারণ খাদ্য-খাদক সম্পর্ককে জৈনগণ স্বীকার করেছেন।

সত্য- পঞ্চমহাব্রতের দ্বিতীয় ব্রতটি হল সত্য বা 'সুনৃত'। প্রিয়, হিতকর মধুর যথার্থ বাক্য প্রয়োগ কে সুনৃত হলা হয়েছে। জৈনগণ শুধুমাত্র মিথ্যাভাষণ পরিহারকে সত্য বলে বোঝায়নি, যা মিথ্যা নয় অথচ অন্যের কাছে মনোগ্রাহী ও কল্যাণকর হয় সেটাই সত্য। কোন অপ্রিয় সত্য কথায় যদি কেউ আঘাত পায় তাহলে সেরকম সত্যকে বিরত রেখে এমনভাবে উপস্থাপন করা দরকার যাতে তথ্যটির পরিবেশন করা যায় আবার সত্যবচনও প্রকাশিত হয়। সত্যকে সর্বদাই অহিংসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। যে সত্য বাচনিক ভাবে হিংসাত্মক তা জৈনমতে সমর্থনীয় নয়। জৈনগণ মনে করেন সত্যব্রত উৎযাপন করতে হলে ক্রোধ, লোভ, ভয়কে জয় করতে হবে।

অস্তেয়- যাহা কোন ব্যক্তি দান করে নাই তাহা গ্রহণ না করাকে বলা হয় 'অস্তেয়'। বলপূর্বক অথবা কৌশলে কোনকিছু সম্পদ আত্মসাৎ না করাই অস্তেয়। অস্তেয় বলতে অচৌর্য বৃত্তিকে বুঝিয়েছেন। জৈনগণ যেহেতু সংযত জীবনযাপনে বিশ্বাসী তাই অন্যের সানন্দে দানব্যতীত কোন অবস্থাতেই অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত না করার পক্ষপাতী ছিলেন। জীবনে বাঁচতে গেলে প্রতিটি মানুষের সম্পদ বা অর্থের প্রয়োজন এরূপ বাস্তব সত্যকে তাঁরা স্বীকার করেছেন, সেক্ষেত্রে কারোর অর্থহরণ করার অর্থই হল তার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা পরোক্ষভাবে তার জীবন ধারণের অধিকার কেড়ে নেওয়া যা হিংসার-ই নামান্তর। কাজেই অস্তেয়ব্রতও অহিংসাব্রতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ব্রহ্মচর্য- সাধারণভাবে ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে 'ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। তবে জৈন দর্শনে ব্রহ্মচর্য কথাটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কায়িক বাচনিক ও মানসিক ভাবে কঠোর সংযমকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়েছে। তাই পূর্ণমাত্রায় ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করতে হলে বাহ্য-অন্তর, সুক্ষ-স্থুল, সাক্ষাৎ-অসাক্ষাৎ যাবতীয় অসংযমকে দূর করতে হবে। জৈনমতে ১৮ প্রকার ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলা হয়েছে।[১৭] মন, বাক্য, দেহ দ্বারা কৃত, অনুমত ও কারিত দিব্যবিষয়ভোগ সমূহের ত্যাগ এবং একই প্রকারে ঔদরিক বিষয়ভোগ সমূহের ত্যাগকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়। তত্ত্বার্থসূত্রের টীকাকার– বিষয়ের ভোগস্পৃহাকে কাম বলেছেন। এই কাম ২ ধরণের যথা– দিব্য ও ঔদরিক, যা শরীরান্তর তা দিব্য এবং যা শরীরের দ্বারা সেব্য তা ঔদরিক। এই দিব্য ও ঐদরিক আবার স্বয়ংকৃত অনুমত ও কারিত ভেদে বিভক্ত হয়ে সর্বসাকূল্যে ৬ প্রকার। এরা

[১৭] তদেব, পৃ. ৬৪।

আবার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভেদে মোট আঠারো প্রকার। উক্ত ১৮ প্রকার বিষয়ভোগ ত্যাগকে ব্রহ্মচর্য ব্রত বলা হয়।

অপরিগ্রহ- পঞ্চম মহাব্রত হল অপরিগ্রহ। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি মোহত্যাগকে অপরিগ্রহ বলা হয়। জৈনমতে শ্রমনগণ কেবলমাত্র জাগতিক বিষয় নয়, নিজ দেহ মনের প্রবৃত্তিকে কখনো নিজের মনে করবেন না। কেননা অজীব মাত্রই জীবকে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে। অনেক সময় মনোজগতের অসৎ কাল্পনিক বিষয়ে ও আগ্রহ সঞ্চারিত হয়ে চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, সেগুলি পরিহার করতে হবে। সকল ভাব বস্তুর প্রতি ইচ্ছার অবসান হলে তবে অপরিগ্রহ ব্রত পালিত হচ্ছে বলে বিবেচ্য।

জৈন সম্প্রদায়গণ মনে করতেন যে পঞ্চমহাব্রত পালন করার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কিছু মানবিক গুণাবলীর সাহায্য নেওয়া হয় যাকে বলা হয় ভাবনা। পঞ্চমহাব্রত এই ভাবনার দ্বারা ভাবিত হলে গতিপ্রাপ্ত হয়।[১৮] পঞ্চমহাব্রতের সঙ্গে কোন কোন ভাবনা সংশ্লিষ্ট তা আলোচনা করা যাক– অহিংসা ব্রত পালন করার ক্ষেত্রে ৫ ধরণের ভাবনা ব্যবহার হয়। বাক্‌গুপ্তি মনোগুপ্তি, ঈর্ষাসমিতি, আদানসমিতি ও আলোকিত পানভোজন।[১৯] বিষয় সমূহের ইন্দ্রিয়ের যে প্রবৃত্তি হয় তার থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করাকে গুপ্তি বলে।[২০] কাজেই বাচনিক ও মানসিক ভাবে সংযত হওয়াই অহিংসাব্রতের সহায়ক। অপর প্রাণীকে কষ্ট না দিয়ে যথাযথ ভাবে জীবন ও জীবিকার পরিপালনকে সমিতি বলা হয়। জল এবং অন্নগ্রহণের পূর্বে যথাযথ ভাবে দেখে যদি তার মধ্য কোন প্রাণী থাকে তাহলে তাকে বাদ দিয়ে ভিন্ন জল ও অন্নগ্রহণ করাকে বলা

---

[১৮] তদেব, পৃ. ৬৫।

[১৯] *তত্ত্বার্থসূত্র,* ৭/৪।

[২০] "সম্যকযোগনিগ্রহগুপ্তি"- তদেব, ৯/৪।

হয় আলোকিত পানভোজন। সত্য বা সুনৃত ব্রত পালন করার ক্ষেত্রে ৫ ধরণের ভাবনা অভ্যাস করতে হয়– হাসি, লোভ, ভয়, ক্রোধের পরিহার এবং বিবেচনা প্রসূতবাক্য প্রয়োগ।[২১] অস্তেয় ব্রত পালন করার ক্ষেত্রে ভাবনাপঞ্চক হল– (১) শূন্য গিরিগুহায় বসবাস, (২) অন্যের পরিত্যক্ত স্থানে বসতি (৩) অপরের কাছে বারংবার কোন বিষয় চেয়ে অনুরোধ না করা (৪) বর্ণ ধর্ম ভেদ না করে বসবাস (৫) আচার মেনে অন্ন ও জল গ্রহণ করা। ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের ক্ষেত্রে ভাবনা পঞ্চক হল– ১) নারীর প্রতি আসক্তি উদ্রেককারী কথা শ্রবণে বিরতি। ২) নারীর মনোহর অঙ্গদর্শন ত্যাগ। ৩) উপরোক্ত দুটি বিষয়ে স্মরণ না করা। ৪) শক্তিবর্ধক রসত্যাগ। ৫) শরীরের সংস্কার ত্যাগ (নারী, পশু এবং পৌরুষত্বহীন ব্যক্তি যে বিছানাপত্র ব্যবহার করে সেগুলি পরিত্যাগ করা)। অপরিগ্রহব্রতের ভাবনা পঞ্চক হল- পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে রাগ দ্বেষ বর্জন।

জৈন নীতিতত্ত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য যেহেতু যাপিত জীবনের উন্নতি সাধন এবং মুক্তিলাভ সেহেতু জৈন শ্রমণ ছাড়া ও গৃহী বা সাধারণ সংসারী মানুষদের সুবিধার্থে পঞ্চমহাব্রত গুলিকে শিথিল করে তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। গৃহীদের এই সাধারণ ব্রতসমূহকে বলা হল পঞ্চঅনুব্রত। জৈন অনুব্রত আসলে মহাব্রতের ক্ষুদ্র সংস্করণ সাতাশটি কোমল কর্মনীতি অনুব্রত নামে পরিচিত।

২.৩.২ কিছু অবশ্য পালনীয় কর্তব্য- মুক্তিকামী ব্যক্তিকে পঞ্চমহাব্রত ছাড়াও আরো কতকগুলি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে হয় সেগুলি হল-

---

[২১] তদেব, ৭/৫।

গুপ্তি- "সম্যগযোগনিগ্রহো গুপ্তি"[২২] অর্থাৎ বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়ের যে প্রবৃত্তি হয় তার থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করাকে গুপ্তি বলা হয়। মুক্তির জন্য জৈনগণ বাচনিক, মানসিক ও শারীরিক ভাবে যে সংযমের কথা বলেছেন তাই গুপ্তি। এই তিনপ্রকার সংযমী কার্যকলাপ যোগসাধনা ও মুক্তির সহায়ক। গুপ্তি তিনধরণের যথা–

১। কায়গুপ্তিঃ- জৈনমতে শ্রমণ ও গৃহীদের ক্ষেত্রে চলাফেরা করার সময় এমনকি ওঠা বসার ক্ষেত্রে ও শারীরিক সংযম প্রয়োজন। এই সংযম-ই আমাদের শিখিয়ে দেবে কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় এই ধরণের শারীরিক সংযম-ই হল কায়গুপ্তি।

২। বাক্‌গুপ্তি – বাচনিকভাবে সংযম হল বাক্‌গুপ্তি। সর্বদাই মিতভাষী হওয়া বাঞ্চনীয় প্রয়োজনে নিশ্চুপ থাকা সমর্থনীয়। কিন্তু কোন ভাবেই অপ্রয়োজনীয় অতিভাষণ সমর্থনযোগ্য নয়। মুক্তিকামী ব্যক্তির জন্য বাক্‌গুপ্তি বা ভাষার সংযম অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যকর্ম বলে জৈনগণ মনে করেন।

৩। মনোগুপ্তিঃ- জৈনগণ মানসিক বা মনোগুপ্তি বলতে কঠোর ভাবে মানসিক সংযমের কথা বলেছেন। যা কিছু খারাপ(Evil) বা অনিষ্টকর চিন্তা বা ইচ্ছা, এমনকি যা ভাল মন্দ মিশ্রিত সেই জাতীয় চিন্তা বা ইচ্ছা সেগুলিকে ত্যাগ করে যা সবার জন্য মঙ্গলজনক ও হিতকর চিন্তা বা ইচ্ছা তারই প্রতিপালন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

---

[২২] *তত্ত্বার্থসূত্র*, ৯/৪।

সমিতি- প্রাণীপীড়া পরিত্যাগ করে সম্যক ভাবে জীবনযাপন করাই হল সমিতি। এই সমিতির মধ্য দিয়ে মুক্তিকামী ব্যক্তিকে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য করা থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেয়। জৈনগণ ৫ ধরণের সমিতি পালনের কথা বলেছেন–

১। ঈর্ষাসমিতিঃ- পথ চলার সময় অসাবধানতা বশত কোন জীবহত্যা যাতে না হয়, কীট পতঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব ও যাতে পদদলিত না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

২। ভাষাসমিতিঃ- সংযতবাক হতে হবে। অতিকথন, অবান্তরকথন যাতে অন্যের কষ্টের, বিরক্তের কারণ না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া। সর্বদা সংশয়মুক্ত, হিতকর, সত্য কথা বলা প্রয়োজন।

৩। এষণাসমিতিঃ- জীবনে চলার পথে খুব সচেতন ভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হবে। যা কিছু ভ্রান্ত সেগুলি পরিত্যাগ করে কর্মসম্পাদন-ই হল এষণা সমিতি।

৪। আদাননিক্ষেপ সমিতিঃ- অসতর্কতাবশত অতিক্ষুদ্র জীবাণু যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য নাক, মুখ, পদতল ইত্যাদিতে বিশেষ ধরণের আচ্ছাদন ব্যবহার করতে হবে। কোন কিছু গ্রহণ করা অথবা স্থান পরিবর্তন করার সময় সেই স্থানটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনে ধুলোমুক্ত করে নিতে হবে যাতে সেখানকার অতিসূক্ষ্ম জীব যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

৫। উৎসর্গসমিতিঃ অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ফেলার আগে ঐ স্থানটি যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরিত্যাগ করাই উৎসর্গ সমিতি।[২৩] এছাড়া কফ, মূত্র ও মলত্যাগ করার আগে সযত্নে দেখে নিতে হবে যে সেটি প্রাণী বর্জিত স্থান কিনা এর নাম হল উৎসর্গ সমিতি।[২৪]

ধর্মপালন – জৈন দর্শনে দশপ্রকার ধর্মপালন মুক্তিকামী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক বলে বিবেচিত। এই দশপ্রকার ধর্মপালনের দ্বারা যেমন ব্যক্তি চরিত্র গঠন হয় তেমনি এর দ্বারা গৃহী ও শ্রমণদের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। এই দশপ্রকার ধর্মপালন হল– ১। ক্ষমা– Forbearance ২। মার্দব/কোমলতা– Softness ৩। আন্তরিকতা– Sincerity ৪। শৌ– absence of greed ৫। সত্য– Truthfulness ৬। সংযম– Restraint ৭। তপ/তপস্যা– Penance ৮। ত্যাগ– Renunciation ৯। অকিঞ্চন– Absence of a feeling of ownership ১০। ব্রহ্মচর্য– Studentship

অনুপ্রেক্ষা (Deep reflection)- যখন জীব বাহ্য জগতের কর্ম পুদগলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হবার পরিস্থিত সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে অনুপ্রেক্ষা সেই বন্ধনদশা সৃষ্টিকারী কর্মপুদগল থেকে জীবকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। সে অর্থে অনুপ্রেক্ষা সম্বররূপে বর্ণিত হয়ে থাকে। জৈন দর্শনে ১২টি অনুপ্রেক্ষা পালনের কথা বলেছেন - ১। অনিত্য– Trasient ২। অসরণ– Helpless ৩। সংসর– World of transmigration ৪। একত্ব– Soleness ৫। অন্যত্ব– Separateness ৬। অসূচিত্ব– Impurity ৭। আস্রব– Fundamental verity

---

[২৩] উমাস্বাতী, *তত্ত্বার্থসূত্র*, কে. কে দীক্ষিত (অনুঃ), পৃ. ৩১৩।

[২৪] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (তৃতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), পৃ. ১০৯।

designated inflow ৮। সম্বর- Fundamental verity designated protection ৯। নির্জরা- Fundamental verity designated cleansing off ১০। বোধিদূর্লভ- The fact that right thought and conduct is difficult of achievement ১১। ধর্ম-সাক্ষাতত্ত্ব- The fact that religious message has been well delivered ১২। অনুপ্রেক্ষা- deep reflection

পরিষহ- প্রতিকূল পরিস্থিতি যেমন ঠান্ডা, গরম, ক্ষুধা, পিপাসা সহ্য করার জন্য সহনশীল ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজন। এই প্রকার সহ্য ক্ষমতা বা তপকে পরীষহ বলে। ২২ প্রকার পরীষহ বা সহ্য ক্ষমতা অর্জন করার কথা জৈন দর্শনে বর্ণিত হয়েছে। ১। Ksudha- hunger ২। Trsa- Thirst ৩। Sita- Cold ৪। Usna- hot ৫। Damśamaśaka- gadflies and mosanitos ৬। Nagnatva- Nakedness ৭। Arati- distaste ৮। Stri- Woman ৯। Carya- Moving ১০। Nisadya- Seating ১১। Sayya- Bedding ১২। Ākrośa- Harsh Words ১৩। Vadha- Beating and Threatening ১৪। Yācanā - Begging ১৫। Alābh- Non-receipt ১৬। Roga- Disease ১৭। Trnasparsa- The touch of grass ১৮। Mala- Dirt ১৯। Satkara puraskara- Honour and reward ২০। Prajna- Miraculous Intellect ২১। Ajnana- Ignorance ২২। Adarsana- non-vision

২.৪ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি

উপনিষদে ঈশ্বরের আলোচনা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে যুক্তিপ্রদান করা হয়েছে তা আস্তিক দর্শনগুলিকে অনেক বেশী সমৃদ্ধ করেছে বলে মনে করা হয়। উপনিষদের মত ন্যায়দর্শনেও আমরা ঈশ্বরের স্বপক্ষে নানা যুক্তির নিদর্শন পেয়ে থাকি। যা ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের ঈশ্বরালোচনার মানদন্ড বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে উপনিষদে ও ন্যায়াদিদর্শনে যে ধরণের যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি খন্ডন করে জৈন দর্শনে কিভাবে নিরীশ্বরবাদ প্রতিপাদন করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক–

১। কার্য-কারণ তত্ত্বকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে একথা স্বীকার করতে হবে যে প্রত্যেক কার্যের একটি কারণ আছে। ঈশ্বরবাদীরা মনে করেন জগৎ একটি কার্য তার কারণ হল ঈশ্বর। জৈনগণ মনে করেন এই যুক্তি যথার্থ নয় কারণ প্রত্যেক কার্য একটি নির্দিষ্ট কালেই ঘটে থাকে, সৃষ্টির পূর্বে ঐ কার্যের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জগৎ কোন নির্দিষ্ট কালে সৃষ্ট একথা বলা যায় না। জগৎ সৃষ্টির কোন আদি নেই। জগৎ যদি অনাদি হয় তাহলে তার কর্তা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

২। জগৎ সৃষ্টির পিছনে কারণ হিসেবে যদি ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় তাহলে জৈনদের যুক্তি হল ঈশ্বরেরও কারণ আছে একথা বলতে হবে। জগতের পূর্ববর্তী কারণ ঈশ্বর, ঈশ্বরের পূর্ববর্তী কারণ কি তার পূর্ববর্তী কারণ এভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ ঘটে কাজেই জগতের কারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা যথার্থ নয়।

৩। ঈশ্বর বিশ্বাসীরা মনে করেন প্রত্যেক অবয়ব বিশিষ্ট বস্তু গঠনের জন্য একজন কর্তার প্রয়োজন। এই জগৎ যেহেতু অবয়ব বিশিষ্ট কাজেই তার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। জৈনরা বলেন যে, ঈশ্বর যদি অবয়ব বিশিষ্ট জগতের কর্তা হন তাহলে তাঁরও (ঈশ্বরের) অবয়ব থাকার কথা। যেমন মাটির তৈরী জিনিসের নির্মাতা হিসেবে দেহধারী কুম্ভকারের প্রয়োজন হয় তেমনি দেহধারী ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিৎ। কিন্তু ঈশ্বরবাদীরা সেই প্রমাণ দিতে পারেননি।

৪। যারা ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান সবকিছুর স্রষ্টা বলে অভিহিত করেন তাদের বিরুদ্ধে জৈনমত হল ঈশ্বর যদি জগতের যাবতীয় বিষয়ের স্রষ্টা হন তাহলে কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, সূত্রধর এদের প্রয়োজন হয় কেন? এদের উপস্থিতি এবং প্রয়োজন এটাই প্রমাণ করে যে ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা বা সর্বশক্তিমান নয়। আর যদি বলা হয় যে ঈশ্বর অদৃষ্টের সাহায্যে মানুষের পাপ-পূণ্য বিচার করে সৃষ্টি কর্মে নিযুক্ত করে তাহলে বলতে হয় যে ঈশ্বরও অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান একথা আর বলা যায় না।

৫। ঈশ্বরবাদীরা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর হল নিত্য, পূর্ণ, মুক্ত। জৈনরা এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেছেন যে বন্ধনদশা থাকলে তবেই তার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আগে বন্ধন দশা তারপর মুক্তির প্রসঙ্গ। আগে অপূর্ণ তার থেকে পূর্ণতা অর্জন করতে হয় কাজেই নিত্যপূর্ণ, নিত্যমুক্ত শব্দগুলি অর্থহীন।

৬। জৈনগণ ঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, প্রত্যেক কার্যের পিছনে কর্তার একটি অভিপ্রায় থাকে ঈশ্বর যদি জগতের কর্তা হয় তাহলে কোন অভিপ্রায়ে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করেছেন? তিনি তো পূর্ণ হওয়ায় কোনরূপ অভাব বোধ তার থাকতে পারে না। তাহলে

কোন অভাব পূরণের জন্য তিনি জগতের সৃষ্টি করেছেন? যদি বলা হয় ইচ্ছাবশত তিনি জগতের সৃষ্টি করেছেন তাহলে বলতে হবে যে জগত তো নিয়ম শৃঙ্গলার অধীন সেখানে ইচ্ছার কোন স্থান থাকতে পারে না। আবার যদি বলা হয় যে করুণাবশত জগতের সৃষ্টি করেছেন তাহলে বলতে হয় করুণাবশত সৃষ্টিরফল যে জগৎ সেখানে এত অমঙ্গল, হিংসা বিদ্বেষ কেন? তার সমাধান-ই বা ঈশ্বর করেননি কেন?[২৫]

এছাড়াও স্যাদবাদমঞ্জরী ও ষড়দর্শন সমুচ্চয়ের টীকা তর্করহস্যদীপিকা প্রভৃতিতে জৈনরা ঈশ্বর খন্ডনের জন্য কিছু যুক্তির অবতারণা করেছেন–

১। ন্যায়বৈশেষিকরা বলেছেন ঘটাদি কার্য যেমন সকর্তৃক বা কর্তৃজন্য তেমনি দ্বণ্যুকাদি কার্য সকর্তৃক আর এই কর্তা যেহেতু সচেতন না হয়ে পারেন না তাই জগত সৃষ্টির সচেতন কর্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এর বিরোধিতা করেত গিয়ে জৈন তার্কিক গুণরত্ন দেখিয়েছেন যে, 'বুদ্ধিমানকর্তা'র সংগে 'কার্যসম্পন্নতা'র মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্পর্ক নেই। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা দ্বারা মাটির পাত্র তৈরী করেন ঈশ্বর ও পরমাণু সংযোগে বস্তুজগত সৃষ্টি করে ন্যায়-বৈশেষিকদের এই যুক্তি মেনে নিয়ে ঈশ্বরকে কুম্ভকারের সমতুল্য বলতে হয়। কুম্ভকার যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকার সম্পর্কে জ্ঞান, কার্য-সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা নিয়ে দেহবিশিষ্ট হয়ে কার্যসম্পন্ন করেন। জগতের কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান, কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা সহকারে দেহবিশিষ্ট হয়ে কার্য সম্পন্ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর বন্ধনের অধীন কর্তা হয়ে পড়বে, যার সৃষ্টি শর্তাধীন। জগৎ কার্য হলে তার

[২৫] S, Radhakrishnan, *Indian Philosophy* (Vol-1), J.N Mohanty (ed.), Page 275-277.

কারণ অবশ্যই থাকবে কিন্তু তা হলেও সেই কারণ হিসাবে কোন ঐশ্বরিক সত্তা সূচিত হয় না। কেননা কার্য হওয়া ও 'বুদ্ধিমান কারণ থাকার মধ্যে' কোন অনিবার্য বা ব্যাপ্তি সম্পর্ক নেই। জগতের কারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যে কোন হেতু ভ্রান্ত হবে কেননা সহযোগী উদাহরণ কুম্ভকার সর্বদাই দেহবিশিষ্ট ও অ-সর্বজ্ঞ কারণকে নির্দেশ করবে।

২। গুণরত্নের মতে জগতের কারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের কোন যথার্থ ব্যাখ্যা নেই, ঈশ্বর যদি জ্ঞানের জন্য জগতের সৃষ্টি করেন তাহলে যোগীদেরও জগত সৃষ্টি করতে পারা উচিত কারণ তারা সাধনার দ্বারা জ্ঞানী হন। কিন্তু বাস্তবিক ভাবে সেটা প্রমাণিত নয়। যদি বলা হয় জ্ঞান, ইচ্ছা,ক্ষমতা দ্বারা তিনি জগতের কারণ তাহলে বলতে হয় এগুলির আধার হিসেবে দেহের প্রয়োজন কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে নিরবয়ব বলেছেন যা এই ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।[২৬]

২.৪.১ ঈশ্বরবিশ্বাস কৈবল্যের পূর্বাঙ্গ নয়- ন্যায়বৈশেষিক, উপনিষদের ঈশ্বরতত্ত্বকে খন্ডন করলেও মুক্তি যে মানব জীবনের পরমকাম্য বা পরমপুরুষার্থ সে বিষয়ে জৈনগণ কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তির ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে জৈনগণ কোনভাবে সমর্থন করেননি। জৈনমতে প্রতিটি জীবের মধ্য অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। অনন্তআনন্দ, অনন্তশক্তি, অনন্ত শুদ্ধজ্ঞান, অনন্ত অন্তর্দৃষ্টি এরূপ অনন্ত অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে যদি সঠিক পরিচর্যা করে তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের যোগ্যতায় 'কেবলজ্ঞান' লাভ করতে পারবেন। জৈনদর্শনে ব্যক্তির মুক্তির জন্য অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পরিচর্যা করার জন্য প্রথমেই যে বিষয়ে

---

[২৬] ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৩।

আলোকপাত করা হয়েছে সেটি হল চারিত্রিক উন্নতি সাধন। ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য সৎগুণের অধিকারী হতে হবে, অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, স্নেহ, মায়া, মমতা রূপ গুণের চর্চা করতে হবে। কায়িক বাচনিক ও মানসিক ভাবে সৎকর্ম করতে হবে। সৎকর্ম সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি সাধন হলে সংসার চক্রে আবদ্ধ হবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। জৈনদর্শনে অতিন্দ্রিয় সত্তা ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা অপেক্ষা ব্যক্তিসত্তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে দিয়ে নৈতিক ভাবধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তবে এক্ষেত্রে ঈশ্বরে গুরুত্বারোপকে অস্বীকার করলে ও জৈনগণ মুক্তির জন্য তীর্থঙ্করদের পথপ্রদর্শক বা গুরু বলে স্বীকার করেছেন। জৈনগণ মনে করেন তীর্থঙ্কররা ও একসময়ে দোষগুণ বিশিষ্ট সাধারণ মানুষের মত ছিলেন। কঠোর সাধনা দ্বারা তারা মুক্তিলাভে সক্ষম হয়েছেন। কেবল মুক্তি লাভ করেই যে তারা তৃপ্ত হয়েছেন এমন নয়, সমস্ত জীবের মুক্তিলাভের জন্য, আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছেন। বিভিন্ন উপদেশের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তীর্থঙ্করদের উপদেশ ও নির্দেশিত পথ অবলম্বন করলে যে কোন সাধারণ মানুষ নিজেদের চরিত্রগঠন, আত্মিক উন্নতিসাধন এবং মুক্তিলাভ করতে পারবে বলে জৈনগণ বিশ্বাস করেন।

জৈনধর্মাবলম্বী সাধকরা তীর্থঙ্করদের উদ্দেশ্যে আরাধনা করতেন। শুধু তাই নয় অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায়, সাধু এই পাঁচ ধরণের তীর্থঙ্করদের বন্দনা ও পূজার্চনা করতেন। জৈনরা এই পাঁচ ধরণের তীর্থঙ্করদের মূর্তি নির্মাণ করে পূজার্চনা ও করেন। এখানে জৈনদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, জৈনরা যেহেতু নিরীশ্বরবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী তাহলে তীর্থঙ্করদের ঈশ্বর জ্ঞানে পূজার্চনা করার মধ্যে দিয়ে তারা কি ঈশ্বরবাদীদের ন্যায় ঈশ্বর

নির্ভর হয়ে পড়ছেন? এক্ষেত্রে জৈনদের ব্যাখ্যা হল– ঈশ্বরবাদীরা যেমন ঈশ্বর বলতে এক চিরমুক্ত, অনাদি অনন্ত, শ্বাশত সত্তার ধারণা বুঝিয়েছেন জৈনগণ সেরূপ ধারণা পোষণ করেননি। জৈনমতে তীর্থঙ্কর হলেন এমন এক পুরুষ যিনি নিজের মধ্যে থাকা অনন্ত সম্ভাবনা কে পরিচর্চা করে সকল আবরণের উন্মোচন ঘটিয়ে মুক্ত হয়েছেন। যিনি স্ব-প্রচেষ্টায় মুক্তি লাভ করেছেন তিনি তো পূজিত হবেন। তিনি অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন হিসাবে থাকবেন। সাধারণ মানুষ এমন মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য অনুরূপ কর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত রাখবেন। তীর্থঙ্করগণ তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পূজিত হয়ে থাকেন কোন অতিন্দ্রীয় অলৌকিক সত্তা হিসেবে নয়। সুতরাং জৈনগণ মনে করেন যে, মুক্তিলাভের জন্য ব্যক্তিকে স্বয়ং তৎপর হতে হয়। মানুষ স্ব-চেষ্টাতেই মোক্ষার্জন করে, মুক্তির জন্য অলৌকিক ঈশ্বর সাধনা নিষ্প্রয়োজন।[২৭]

[২৭] S, Radhakrishnan, *Indian Philosophy* (Vol-1), J.N Mohanty (ed.), page 277.

হিতবাদী নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা রূপে বৌদ্ধদর্শন

৩.১ সূচনা- ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা আধিবিদ্যক আলোচনার সূত্রেই বিকশিত হতে দেখা যায়। বৌদ্ধ পরম্পরায় নীতি আলোচনার ক্ষেত্রে অধিবিদ্যা কখনোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধদেবের মূল লক্ষ্য কোন দর্শন প্রতিষ্ঠা করা নয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল জগতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে সেই পথের সন্ধান দেওয়া। কাজেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ অপেক্ষা দুঃখ থেকে কিভাবে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় সেই পথের সন্ধানে অধিক উৎসাহী ছিলেন তিনি। বুদ্ধ মনে করতেন মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্যই হল দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটানো, তাই তিনি দুঃখ সংক্রান্ত সমস্যা ও সেই সমস্যার সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন দুঃখ পীড়িত মানুষের কাছে তত্ত্বালোচনা নিছক মূর্খামির পরিচয়।

বেদ, উপনিষদ থেকে শুরু করে সকল ভারতীয় দর্শনে দুঃখের আলোচনা আমরা পেয়ে থাকি। দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মানুষের যে আকুলতা, এবং তার থেকে রেহাই পাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা একথা প্রমাণ করে যে দুঃখকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। এক দুঃখ যেতে না যেতেই অন্য এক দুঃখ এসে মানুষকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে। অনন্ত দুঃখে তাপিত মানুষ শাস্ত্রপাঠ ও অন্যান্য নির্দেশ পালন করতেই থাকে।[১] তাহলে প্রশ্ন হল এই দুঃখের কারণ কি? ভারতীয় প্রায় সকল শাস্ত্রে এমন কি বৌদ্ধ দর্শনেও অবিদ্যা বা অযর্থাথ জ্ঞান কে দুঃখের মূল বলে অভিহিত করা হয়েছে। অবিদ্যা বলতে বোঝায় আর্যসত্য চতুষ্টয়ের জ্ঞানের অভাবকে। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের

---

[১] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সঞ্জিত কুমার সাধুখা (সম্পাঃ), পৃ. ৭৪।

উপদেশ কালে উল্লেখ করেছেন যে– 'অবিদ্যা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মলা। হে ভিক্ষুগণ তোমরা এই মলা বর্জন করিয়া নির্মল হও'।[২] কাজেই অবিদ্যাকে জয় করে আর্যসত্য চতুষ্টয়ের যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারলে দুঃখ থেকে মুক্তি সম্ভব।

৩.২ নৈতিকজীবনের ভিত্তি আর্যসত্যচতুষ্টয়

আর্যসত্য কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল- 'আর্য' অর্থাৎ যা অসৎ নয়, বা সৎ। এবং 'সত্য' অর্থাৎ যা ভ্রমের পথে চালিত করে না। এই আর্যসত্য চতুষ্টয় হল– (১) দুঃখ (২) দুঃখ সমুদয় (৩) দুঃখের নিবৃত্তি (৪) দুঃখ নিবৃত্তির পথ।

১) দুঃখ- গভীর সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভের পর গৌতম বুদ্ধ জগৎ সম্পর্কে যে পরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তারমধ্যে প্রথমোপলব্ধি ছিল জগৎ দুঃখময়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যখন বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে দুঃখ আর্যসত্য কি? বুদ্ধদেব উত্তরে জানালেন যে, জাতি, জরা, ব্যাধি, মরণ শোক, বিলাপ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস, ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।[৩] জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু বাসনাসঞ্জাত সবই দুঃখময়। মানব জীবন কামনা বাসনায় কষ্টকিত, না পাওয়ার বেদনায় জর্জরিত। এই জগতে বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই। প্রতিটি সুখই দুঃখমিশ্রিত। সব সুখই প্রচ্ছন্ন দুঃখেরই নামান্তর।

কেবল বৌদ্ধ দর্শনে নয়, ভারতীয় দর্শনের প্রায় সকল শাস্ত্রেই জগৎ সংসার যে দুঃখাত্মক সে বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন সেক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যে হয়ত কোথাও

---

[২] "ততো মলা মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং।
এতুগ মলং পহত্বান নিম্মলা হোথ ভিকখবো।।"- ধম্মপদ, মলবগ্গ সূত্ত- ২৪৩।

[৩] ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাঃ), *দীঘনিকায়,* মহাসতিপঠান সূত্ত, পৃ. ৩৫৯।

ভিন্নতা রয়েছে। যেমন সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে– চেতন পুরুষ অর্থাৎ আত্মা পূর্বোক্ত শরীরাদিতে বার্ধক্য ও মরণ নিবদ্ধ দুঃখ অনুভব করেন কেননা বুদ্ধ্যাদির সহিত উহার ভেদজ্ঞান থাকে না। অতএব দুঃখটি স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ সংসার দশাতে দুঃখ ভোগ অপরিহার্য।[৪] ন্যায়সূত্রের প্রথম খন্ডে মহর্ষি গৌতম বলেছেন যে, দুঃখের অবসানেই আমাদের মুক্তি হয়।[৫]

দুঃখাত্মক আলোচনা দিয়ে শুরু করার জন্য অনেকেই বৌদ্ধদর্শনকে দুঃখবাদী বা নৈরাশ্যবাদী দর্শন বলে সমালোচনা করেছেন। একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে বুদ্ধদেব দুঃখকে মনুষ্যজীবনের ধ্রুবসত্য বলে উল্লেখ করলেও একে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করেননি। জগৎ দুঃখময় একথার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, দুঃখ জীবনের একটি চরম সত্য তবে যথাযথ উপায়ে জীবন অতিবাহিত করলে দুঃখকে জীবন থেকে পরিহার করা সম্ভব। আর্যসত্যের মাধ্যমে দুঃখকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাননি বরং এই জগতে যা রূঢ় বা বাস্তব সত্য তা মানুষের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কামনা বাসনায় নিমজ্জিত মানুষের সামনে বাস্তব সত্যের উন্মোচন ঘটিয়ে সত্যের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তথাগত। বৌদ্ধদর্শন কোনভাবে নৈরাশ্যবাদী বা দুঃখাত্মক নয় কারণ সেখানে দুঃখের কথা যেমন বলা হয়েছে তার সাথে সাথেই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ বা উপায় ও নির্দেশিত হয়েছে।

২) দুঃখের সমুদয়- ভিক্ষুগণ গৌতম বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন যে দুঃখের কারণ কি বা দুঃখ উৎপত্তির আর্যসত্য কি? বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন যে– 'তৃষ্ণাই' হল দুঃখ উৎপত্তির কারণ। এই তৃষ্ণাই জীবকূলকে পুনর্জন্মের অভিমুখে চালিত করে। যা কিছু ভোগ, আনন্দ, রাগযুক্ত যা স্থান থেকে

---

[৪] "তত্র জরা-মরণ-কৃতং দুঃখংপ্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্য-বিনিবৃত্তে স্তস্মা-দ্দুখং স্বভাবেন।।"- সাংখ্যকারিকা- ৫৫।

[৫] "তদত্যন্তবিমোক্ষোপবর্গঃ।" ন্যায়সূত্র- ১/১/২২।

স্থানান্তরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা অনুভব করে তাই তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন কোথায় স্থিত হয়? উত্তরে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, যা কিছু আনন্দপ্রদ সেই তৃষ্ণা সেইখানে উৎপন্ন হয়ে সেখানেই স্থিত হয়। মানব শরীরে ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন ইহারা আনন্দপ্রদ ইহাতেই তৃষ্ণার উৎপত্তি ও স্থিতি হয়।[৬] এছাড়া ও মগ্গবগ্গে এবং দীঘনিকায়ে ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ বাক্য হল পঞ্চস্কন্ধ হল সকল দুঃখের কারণ এইজ্ঞান যখন মানুষ লাভ করবেন তখন তিনি সব দুঃখ হতে নিবৃত্তি লাভ করতে সক্ষম হবেন।[৭]

জগতের প্রতিটি ঘটনা বা কার্য কোন না কোন কারণ বা কারণ শৃঙ্খল থেকেই উৎপন্ন জগৎ বিষয়ক কার্যকারণ তত্ত্বকে বৌদ্ধগণ অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করেছেন। দুঃখ যেহেতু কার্য তার কারণ অবশ্যই থাকবে। দুঃখের কারণ প্রত্যয়োপনিবন্ধন ও হেতুপোনিবন্ধন ভেদে দ্বিবিধ।

ক) প্রত্যয়োপনিবন্ধন- কারণ সমবায় বা কারণ শৃঙ্খল থেকে যখন স্বাভাবিকভাবে কার্যের উৎপত্তি হয় তখন তাকে প্রত্যয়োপনিবন্ধন হেতু বলা হয়। 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হল কারণ সমবায়। যেমন বীজ নামক হেতু থেকে অঙ্কুর নামক কার্যটি ছয় প্রকার ধাতুর সমবায়ে উৎপাদিত হয়। 'পৃথিবী' এর থেকে অঙ্কুরের কাঠিন্য ও গন্ধ উৎপন্ন হয়, 'জল' এর থেকে অঙ্কুরের রস উৎপন্ন হয়, 'তেজ' এর থেকে রূপ ও উষ্ণতা উৎপন্ন হয়, বায়ু থেকে স্পর্শ ও চলন উৎপন্ন হয়। আকাশ থেকে শব্দ ও অবকাশ এবং ঋতু ধাতু থেকে যথোপযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

---

[৬] ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাঃ), *দীঘনিকায়,* মহাসতিপঠান সূত্ত, পৃ. ৩৬০।

[৭] "সববে সঙ্খারা দুকখাতি যদা পঞ্ঞায় পসসতি।
অথ নিবিন্দতি দুকখে এস মগগো বিসুদ্ধিয়া।।" *ধম্মপদ,* মগ্গবগ্গো সূত্ত- ২৭৮।

খ) হেতুপনিবন্ধন- কোন নির্দিষ্ট কারণ থেকে নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন হলে তাকে হেতুপনিবন্ধন বলা হয়। যেমন অঙ্কুর থেকে কান্ড → নাল → গর্ভ → শূক → ফুল → ফল হয় এক্ষেত্রে অলৌকিক কোন চেতন কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। কারণের থেকে কার্যোৎপত্তির মূল কথা হল কার্যোৎপত্তি কারণ সমবায় থেকে (প্রত্যয়োপনিবন্ধন) অথবা নির্দিষ্ট কোন কারণ থেকে হতে পারে। (হেতুপনিবন্ধন)। কার্যোৎপত্তির মূলে কোন চেতন কর্তার অস্তিত্ব নেই।[৮]

কেবলমাত্র বাহ্যিক ঘটনা বা কার্য্যোৎপত্তির ক্ষেত্রে নয় আধাত্মিক বা অন্তর জগতের ক্ষেত্রে ও হেতুপনিবন্ধন ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ ভেদে দুটি কারণ রয়েছে বুঝতে হবে। দুঃখের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে টীকাকার মাধবাচার্য দেখিয়েছেন যে, বিষয় ক্ষণিক হলেও সেই বিষয়কে স্থির বলে বিবেচনা করাই হল অবিদ্যা। এই অবিদ্যা → সংস্কার → বিজ্ঞান → নামরূপ (দেহ, মন) → ষড়ায়তন (ছয়টি ইন্দ্রিয়) → স্পর্শ (বিষয়সম্বন্ধ) → বেদনা (সুখ দুঃখানুভূতি) → তৃষ্ণা → উপাদান (আসক্তি) → ভব (জন্মানোর আকাঙ্খা) → জাতি → জরামরণ। কার্য কারণ নিয়মের এই বারোটি অঙ্গকে বৌদ্ধ দর্শনে ভবচক্র বলা হয়। এই ভবচক্র জীবকে বারবার সংসার দশায় আবর্তিত করে। দুঃখের কারণ যে অবিদ্যা এই অবিদ্যাকে দুঃখ রূপ কার্য সংগঠিত করে চলেছে। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উভয়ক্ষেত্রে কার্য কারণের জ্ঞানাভাব সমান। কারণ ঘটলে কার্যোৎপত্তি নিশ্চিত, এর জন্য অন্য কোন চেতন কর্তার আশ্রয় নিষ্প্রয়োজন।[৯]

৩) দুঃখ নিরোধঃ- কার্য মাত্রই যেহেতু কারণ জন্য সেহেতু কারণকে নিবৃত্ত করলে কার্যের ও নিবৃত্তি সম্ভব। দুঃখ যদি কার্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে তার কারণ হিসাবে বুদ্ধদেব 'তৃষ্ণা' কে

---

[৮] সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (দ্বিতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), পৃ. ১৩৬।

[৯] তদেব, পৃ. ১৪২।

নির্দেশ করেছেন। ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেবের নির্দেশ হল, যে কারণে তৃষ্ণার উৎপত্তি সেই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, ত্যাগ, নিরোধ জন্মালে তৃষ্ণার নিবৃত্তি সম্ভব এবং তৃষ্ণা দূরীভূত হলে দুঃখ দূরীভূত হবে। বুদ্ধদেব আরো বলেন যে, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন নামক অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়ের প্রতি যে কামনা, বাসনা, লোভ আসক্তি জন্মায় সেগুলি হল তৃষ্ণা এই বাহ্য বিষয়ের প্রতি অনাকাঙ্খিত আসক্তি জয় করতে পারলে আমাদের দুঃখ নিরোধ সম্ভব।[১০] দুঃখ ও তার কারণের নিরোধ হলে তবেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হলে মুক্তি সম্ভব। নিরোধের মার্গ হল তত্ত্বজ্ঞান। চারটি ভাবনা দ্বারা সমৃদ্ধ হলে তবে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। সেই চারটি ভাবনা হল– (১) সর্বংক্ষণিকং ক্ষণিকম্ (২) সর্বং দুঃখং দুঃখম্ (৩) সর্ব স্বলক্ষণং স্বলক্ষণম্ (৪) সর্বং শূন্যং শূন্যমিতি।

৪) দুঃখ নিরোধ মার্গ- দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য বুদ্ধদেব যে মার্গের কথা বলেছেন তা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। তিনি তার শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন যে তোমরা মার্গ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অষ্টাঙ্গিক মার্গকে অবলম্বন কর কারণ ইহা মারের প্রমোহনকারী[১১]।

৩.২.১ নৈতিকযাপনে অষ্টাঙ্গিক মার্গ- ১) সম্যক দৃষ্টি- আর্যসত্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান যা অবিদ্যাকে নাশ করে। ২) সম্যক সংকল্প- আর্যসত্য জ্ঞানের আলোকে জীবনকে নিয়ন্ত্রণের ও কর্ম করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা। ৩) সম্যক বাক্- বাচনিক সংযম ও যথাযথ বাক্য প্রয়োগ। মিথ্যাভাষণ থেকে

---

[১০] ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাঃ), *দীঘনিকায়,* পৃ. ৩৬১।

[১১] "মগগানটঠঙ্গিকো সেটঠো সচ্চানং চতুরো পদা
বিরাগো সেটঠোধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চকখুমা।"- *ধম্মপদ,* ২৭৩ সূত্ত।
এবং
"এসো ব বগগো নহথঞঞো দসসনসস বিসুদ্ধিয়া
এতং হি তুমহে পটিপজ্জথ মারসসেতং পমোহনং।"- *ধম্মপদ,* ২৭৪ সূত্ত।

বিরতি, কঠোর ও আঘাত পাবে এমন বাক্য প্রয়োগ না করা। অবান্তর অপ্রয়োজনীয় বাক্য ব্যবহার না করা। ৪) সম্যক কর্মান্ত- প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ থেকে বিরতি, ব্যভিচার হতে বিরতি হল সম্যক কর্মান্ত। ৫) আজীব- মিথ্যা জীবিকা পরিহার করে সম্যক বা যথাযথ জীবিকা দ্বারা জীবন ধারণ করাই হল সম্যক আজীব। ৬) সম্যক ব্যায়াম- শারীরিক ও মানসিক সু-অভ্যাস গঠন। যা কিছু– অকুশল ধর্ম্ম তাকে পরিহার করে কুশলের চর্চা করাই সম্যক ব্যায়াম। অন্যভাবে বললে কুচিন্তা বর্জন করে সুচিন্তার অনুশীলন করাই সম্যক ব্যায়াম। ৭) সম্যক স্মৃতি- জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানকে স্মরণ রাখাই হল স্মৃতি। আর্যসত্যের জ্ঞান, চার ধরণের ভাবনা [দুঃখং দুঃখম্, ক্ষণিকং ক্ষণিকম্, স্বলক্ষণং স্বলক্ষণম্, শূন্যং শূন্যমিতি] জগতে সবকিছু শর্তাধীন, নিত্যবস্তু বলে কিছু নেই। স্থায়ী আত্মা নেই আত্মা হল পঞ্চ স্কন্ধের সমাহার। এই ধরণের জ্ঞান সর্বদা স্মরণে রাখাই স্মৃতি। ৮) সম্যক সমাধি- উপরিউক্ত ৭টি মার্গ যথাযথভাবে পালন করলে সাধকের চিত্ত শান্ত ও সংযত হয়। ভিক্ষু তখন জাগতিক বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে পরিশুদ্ধ চিত্তে সমাধির সামর্থ্য লাভ করে। সমাধি স্তরে সাধক দুঃখ মুক্তি ও নির্বাণ লাভ করেন।

আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের আলোচনার থেকে একথা স্পষ্ট যে গৌতম বুদ্ধ এক নীতিময় ধর্মের প্রচার করেছেন। যে ধর্মে মুক্তি লাভ করার জন্য সাধকের নিজস্ব সাধনা ও প্রচেষ্টা মুখ্য হয়ে উঠেছে সেখানে অতীন্দ্রিয় কোন সত্তা বা ইশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। বুদ্ধদেব মনে করতেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব মুখ্য প্রশ্ন নয় বরং জীবনের দুঃখ ও তার থেকে মুক্তি লাভ কিভাবে সম্ভব সেটাই বড় প্রশ্ন, সেটাই জীবনের প্রধান সমস্যা। তিনি ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যে যে নীতি আদর্শের উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন করলে নিজ চেষ্টায় দুঃখ থেকে

পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব বলে মনে করতেন। ব্যাক্তির মুক্তির জন্য পূজার্চনা রূপ আচার সর্বস্ব পৌত্তলিকতা নিরর্থক। মুক্তির জন্য প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিরলস নিঃস্বার্থ সাধনা।

৩.৩ নৈতিকজীবনের প্রতিসঙ্গী হিসেবে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা

মুক্তির জন্য বুদ্ধদেব সাধারণ গৃহী থেকে সন্ন্যাসী সকলদের জন্য ত্রিরত্ন যথা- শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পালনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি শিষ্যদের বলেন যে শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্তের পরম শুদ্ধি হয় এবং বোধি লাভ হয়। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার অনুসারী ব্যক্তির নির্বাণ লাভের পর কোন পথে সেই ব্যক্তি বিচরণ করেন তা মার জানে না[১২]। কাজেই গৌতম বুদ্ধের উপদেশ গুলিকে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় যে গৌতম বুদ্ধের ধর্মের মুখ্য তিনটি অঙ্গ (১) শীল (২) সমাধি (৩) প্রজ্ঞা।

ক) শীল- পালি শব্দ 'সীল' এর অর্থ সদাচার বা কায়িক ও বাচনিক কর্মের পরিশুদ্ধি। বৌদ্ধশাস্ত্রে শীল বলতে 'সদাচার' আবার "নৈতিক পরিশুদ্ধ কর্ম" এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে, সংস্কৃতে শীল বলতে Morality এই অর্থটির গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মহাভারত ও মনুসংহিতায় শীল বলতে সদাচার বোঝানো হয়েছে[১৩]। মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে যে ৮টি মার্গের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে (১) সম্যক বাক্ (২) সম্যক কর্মান্ত (৩) সম্যক আজীব এই তিনটি মার্গ শীলের অন্তর্গত।

---

[১২] "তেসং সম্পন্নসীলানং অপ্পমাদবিহারিনং।
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তানং মারো মগগং ন বিন্দতি।।"- *ধম্মপদ*, পুষ্ফবগ্গো সূত্ত- ৫৭।

[১৩] চৌধুরি, সুকোমল, *ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ৬৩।

সম্যক বাক্- হল যথাযথ ও সংযত বাক্য প্রয়োগ এবং অসংযত বাক্য থেকে বিরতি। সম্যক বাক্য চারধরণের-১) মৃষাবাদ বিরতি ২) পিশুনবাদ বিরতি ৩) পরুষবাদ বিরতি ৪) সংপ্রলাপ বিরতি।

সম্যক কর্মান্ত– ১) অদত্তাদান বিরতি– কোন কিছু দান না করলে গ্রহণ করা যাবে না। ২) প্রাণাতিপাত বিরতি– প্রাণীহত্যা করা যাবেনা। ৩) কাম সমুহে মিথ্যাচার বিরতি– অবৈধ কাম থেকে বিরতি। ৪) অব্রহ্মচর্য বিরতি– অবৈধ যৌনসম্বন্ধ বিরতি।

সম্যক আজীব- অসদুপায়ে জীবিকার্জন থেকে বিরত থাকা। সমস্ত শীল বা সদাচার হল জীবন যাপনের মধ্য থেকে পাপকর্মের বিরতি। সর্বপাপের অকরণই শীল। সর্বপাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে মুক্তি সম্ভব নয়। ক্রমাগত পাপ কর্ম সম্পাদন করলে ব্যক্তি সংসার দশায় আবদ্ধ হয়ে বা বদ্ধজীব হয়েই দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেন। যেমন মাকড়সা নিজ জালে বদ্ধ হইয়া তাহার মধ্যে পতিত হয় তেমনি রাগাসক্ত ব্যক্তি ও বদ্ধ দশায় আবদ্ধ হয়[১৪]। সুতরাং পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা মুক্তিকামী ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় কর্ম।

শীল শব্দের দ্বারা কায়িক ও বাচনিক কর্মের পরিশুদ্ধি বোঝালেও চেতনাও শীলের অন্তর্ভুক্ত কারণ প্রতিটি কায়িক ও বাচনিক কর্মের পিছনে আছে চেতনা। চেতনা ব্যতীত কোন কর্ম সম্পাদন হয় না। পূর্বাপর চিন্তা করেই ব্যক্তি ভাল মন্দ কর্ম সম্পাদন করে। যে চেতনা দ্বারা লোভ, দ্বেষ মোহ, মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে বীতলোভ, বীতমোহ ও সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে ওঠে সেই চেতনা বা মানসিকতা ও বৌদ্ধশাস্ত্রে শীল বলে পরিগণিত হয়েছে। শীল বা সদাচার বলতে কিছু কর্ম থেকে

[১৪] "যে রাগ...অনপেকখিনো সববদুকখং পহায়।" *ধম্মপদ,* তণহাবগগো সূত্ত- ৩৪৭।

বিরত থাকা আবার কিছু কর্ম সম্পাদনের কথা ও বোঝায়। সেই দিক থেকে বিচার করে বুদ্ধদেব শীল দুপ্রকার বলেছেন–

১) **চারিত্রশীল**- যা পালন করা কর্তব্য বলে বুদ্ধদেব নির্দেশ করেছেন তা হল চারিত্র শীল। ঐ চারিত্রের যে চেতনা বা চৈতসিক সেটাও চারিত্রশীল। প্রতিটি জীবের প্রতি ভালোবাসা ও এবং বিষয়ের প্রতি চেতনা বা ভাবনাকে বলা হয় চারিত্রশীল।

২) **বারিত্রশীল**- যা অকর্তব্য বলে বা অকুশল কর্ম বলে বুদ্ধদেব নিষেধ করেছেন সেগুলি বারিত্রশীল। এ বিষয়ে যে চেতনা সেটাও বারিত্রশীল। যেমন প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি, এবং প্রাণী হত্যা না করার যে ভাবনা বা চেতনা বা মানসিকতা তা হল বারিত্রশীল।

শীলকে আবার সদর্থক ও নঞর্থক দিকে থেকে বিচার করে দ্বিবিধ বলা হয়েছে। চারিত্রশীল হল সদর্থক শীল। যেমন প্রতিটি প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। এটা শীলের সদর্থক দিক আবার এটা চারিত্রশীল ও বটে। প্রাণীহত্যা করবে না এটা শীলের নঞর্থক দিক আবার এটা বারিত্রশীলও বটে।

শীল বলতে 'সদাচার' এবং 'নীতি' এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধদেব সাধারণ গৃহীদের জন্য পাঁচ প্রকার নীতি পালনের কথা বলেছেন। এই পাঁচ প্রকার নীতিকে পঞ্চশীল বলে সেগুলি হল– ১) প্রাণীহত্যা না করা। ২) চুরি না করা। ৩) মিথ্যা কথা না বলা। ৪) মাদক দ্রব্য সেবন না করা। ৫) ব্যাভিচারে লিপ্ত না হওয়া।

ভিক্ষু বা শ্রমণদের জন্য তিনি দশশীল বা দশ প্রকার নীতি পালন করার কথা থেকে শুরু করে ২২৭ প্রকার শীলের বিধান দিয়েছিলেন। তার কারণ হল বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্টা করার সময়

দশপ্রকার শীল-এর কথা দিয়ে শুরু করলে ও ক্রমশ সংঘের আয়তন বৃদ্ধি হবার সাথে সাথে জটিলতা বাড়তে থাকল। ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্টা করার পরে জটিলতা আরো বাড়তে থাকল, এরপর সবার মতামত গ্রহণের এবং তাদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে সংঘের আবাসিকদের আহার, পরিধেয় বস্ত্র, ভেষজ দানগ্রহণ, দৈনিক সাধনা এই সব বিষয়ে নানান নীতি প্রণয়ন করতে হয়েছিল। এইভাবে শীলসংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২২৭ টি শীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। বিনয় পিটকে আমরা এই ২২৭ শীলের আলোচনা পাই। সংঘ প্রতিষ্টা করার সময় ভিক্ষুদেরকে যে দশশীল পালনের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন সেগুলি হল– ১) প্রাণীহত্যা না করা। ২) চুরি না করা বা অচৌর্যবৃত্তি। ৩) ব্যাভিচারে লিপ্ত না হওয়া। ৪) মিথ্যা কথা না বলা। ৫) মাদক দ্রব্য সেবন না করা। ৬) বিকাল ভোজন (অকাল ভোজন) না করা। ৭) নৃত্য গীত বাদ্য-কৌতুক না দেখা বা শোনা। ৮) গন্ধমাল্য পরিহার। ৯) উচ্চাসন/সুখকর আসনে শয়ন না করা। ১০) সোনা রূপা গ্রহণ না করা।

এই দশশীল পালনের সাথে কেশ মুন্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করে শ্রমণ আখ্যা লাভ করতেন। এই ২২৭ প্রকার শীল পালন ভিক্ষুর সমগ্র জীবনে ধারাবাহিক কর্মের মধ্যে পড়ে। ধারাবাহিক শীল চর্চার দ্বারা ভিক্ষুর শরীর শান্ত হয় শরীর শান্ত হলে তবেই চিত্ত সমাহিত বা একাগ্র হয়। কেবলমাত্র ভিক্ষু নয় শীল পালনের দ্বারা গৃহীরও (১) ধনসম্পত্তি (২) যশ (৩) সাহস (৪) সজ্ঞানে মৃত্যু (৫) দেহান্তে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটা সম্ভব বলে মনে করা হত। শীল পালনের দ্বারা যা কিছু বন্ধনের কারণ সেগুলিকে জয় করে মুক্তির পথ প্রশস্ত করা সম্ভব এমনকি জীবন্মুক্তি ঘটা ও সম্ভব যা বুদ্ধদেবের নিজের জীবনে ঘটেছিল[১৫]।

---

[১৫] স্বামী, বিদ্যারণ্য, *বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম*, পৃ. ৬১-৬৬।

বুদ্ধদেব তার শিষ্যদের উপদেশ কালে একথা উল্লেখ করেছেন যে– যে লোক প্রাণীহত্যা করেন, মিথ্যাকথা বলে, পৃথিবীতে অদত্ত বস্তুগ্রহণ করে, পরদার গমন করে, সুরা পান করে এইরূপ ব্যক্তি ইহলোকে নিজের মূল খনন করে অর্থাৎ নিজেই নিপাতের কারণ হয়। এরূপ ব্যক্তি অসংযত ও নীচ স্বভাব। লোভ ও অধর্ম দোষ যেন দুঃখ দেবার জন্য দীর্ঘকাল ব্যক্তিকে আবদ্ধ করে রাখতে না পারে সেবিষয়ে প্রতিটি ব্যক্তিকে সচেতন থাকার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন[১৬]।

সমাধি- অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালনের যে নিদান বৌদ্ধ দর্শনে পেয়ে থাকি তা আমরা অন্যভাবে প্রজ্ঞা-শীল–সমাধি রূপে ও বর্ণনা করতে পারি। অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্য সম্যক স্মৃতি, ব্যায়াম এবং সমাধি (সম্যক সমাধি বলতে ধ্যান বোঝানো হয়) এই তিনটি সমাধি নামক রত্নের অন্তর্গত। শীল ও প্রজ্ঞা যার মধ্যে পড়ে ৫ ধরণের মার্গ। অষ্টাঙ্গিক মার্গের ৭টি মার্গ সেগুলি যথাযথ পালন করার পর সাধকের চিত্ত শান্ত ও নির্মল হয় যার দ্বারা তিনি সমাধির সামর্থ্য লাভ করে। সমাধি স্তরে সাধকের নির্বাণ লাভ হয়। ভিক্ষুণী ধর্মদিন্না বলেন– চিত্তের একাগ্রতা সমাধি[১৭]।

সমাধি বলতে বোঝায় অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম সাধন। সুতরাং সমাধি হল মানসিক অবস্থা। সমাধির মধ্যে আমরা 'সম্যক ব্যায়াম' পালনের নিদান দেখতে পাই। ব্যায়াম বলতে মানসিক ব্যায়াম বা অনুশীলন যারা দ্বারা মনের মধ্যে যে পাপের উদয় হয়েছে সেগুলিকে দূর করা, নতুন করে কোন পাপ চিন্তা যাতে মনে স্থান না পায় সে বিষয়ে সজাগ থাকা।

---

[১৬] "সুরামেরয়পানঞ্চ যো নর অনুযুঞ্জতি,
ইধেবমেস লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো।" *ধম্মপদ*, মলবগ্গো সূত্ত- ২৪৭।

[১৭] ভিক্ষু সুমনপাল (সম্পাঃ), *মধ্যম নিকায়* (১ম খন্ড), পৃ. ৩০১।

সম্যক স্মৃতি হল জগতের কোন কিছুকে একান্ত আমি কিংবা আমার বলে গ্রহণ না করে, বিষয়ের সম্যক জ্ঞান ও তাকে স্মরণ করে রাখাই হল স্মৃতি। এই প্রকার স্মৃতির ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অসারতার বোধ জাগ্রত হয়। ভোগ সুখের প্রতি বৈরাগ্য দেখা দেয়। সম্যক সমাধি হল সাধকের চিত্ত শান্ত সমাহিত হয়ে নির্বাণের সামর্থ্য লাভে সক্ষমতা অর্জন। সমাধির চারটি স্তর আছে– ১। প্রথম স্তরে সাধক একটি বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট করে। সত্য সম্পর্কে সংশয় থাকে, বিচার বিতর্কের অবকাশ থাকে কিন্তু সাধকের মনে সুখের অনুভূতি থাকে।

২। দ্বিতীয় স্তরে সাধকের মনে বিতর্কের কোন স্থান নেই, সংশয় দূরীভূত হয় এবং বিচার বিতর্কের অবসান হয়ে যায়। সাধক দিব্য আনন্দ অনুভব করে।

৩। তৃতীয় স্তরে সাধকের মনে সুখ ও আনন্দের প্রতি উদাসীনতা দেখা যায়। যদি ও আত্মচেতনা বিলুপ্ত হয় না।

৪। চতুর্থ স্তরে সাধক সম্পূর্ণভাবে আত্মসমাহিত হয়, সুখ দুঃখানুভূতির বিলোপ ঘটে। সাধক তখন পরিপূর্ণ জ্ঞানের অবস্থায় অবস্থান করেন। জরা মরণ– দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে সাধকের নির্বাণ লাভ ঘটে। বৌদ্ধ পরিভাষায় সমাধি অর্থে ধ্যান বা অকম্পিত মনঃসংযোগ।

প্রজ্ঞা- বৌদ্ধ পরিভাষায় প্রজ্ঞা হল সম্যক জ্ঞান। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প হল প্রজ্ঞা। সম্যক দৃষ্টি বলতে মূলত চতুরার্যসত্য বিষয়ক জ্ঞান। বুদ্ধদেব মূলত 'তৃষ্ণা' বা 'তণহা' কে দুঃখের মূল উৎস বলে বিবেচনা করেছেন। এই তৃষ্ণার কারণে মানুষের মধ্যে মিথ্যাজ্ঞান তৈরী হয় এবং তার থেকে দুঃখের উৎপত্তি। তাই দুঃখ মুক্তির জন্য ব্যক্তির প্রথমেই প্রয়োজন মিথ্যা জ্ঞানের অবসান ঘটিয়ে সম্যক জ্ঞানের সঞ্চার করা। কাজেই সম্যক দৃষ্টির অর্থ হল চারটি অর্থসত্য বিষয়ক

সম্যকজ্ঞান। সম্যক দৃষ্টি অর্জন করতে না পারলে 'ভবচক্র' বা বন্ধনদশা থেকে মুক্তি নেই। সম্যক জ্ঞানের আলোকে ব্যক্তিস্বার্থ, ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে মানব প্রেমে উদ্বোধিত হয়ে বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের দৃঢ় ইচ্ছাই হল সম্যক সংকল্প। সম্যক সংকল্প না থাকলে ব্যাক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমষ্টি স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করা অসম্ভব। বৌদ্ধমতে স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করে জীবের প্রতি প্রেম, করুণা, বিতরণের মধ্যে দিয়ে নিষ্কাম ভাবে কর্তব্য সাধন হল নৈতিক কর্ম। নিজের হিত অপেক্ষা বিশ্ববাসীর হিতসাধন-ই নৈতিক কর্ম। এককথায় সর্বজীবের কল্যাণ সাধনের দৃঢ় ইচ্ছাই হল সম্যক সংকল্প।

তৃষ্ণার দ্বারা পরিচালিত হলে দুঃখ থেকে ব্যক্তির মুক্তিলাভ কোন ভাবে সম্ভব নয়। সংসারে যে ব্যক্তি ক্রমবর্দ্ধনশীল দুর্দ্দম তৃষ্ণাকে জয় করতে পারবেন সংসারে তার অবস্থান পদ্ম পাতার মত হবে। পদ্ম পাতায় জলবিন্দু যেরূপে অপসৃত হয় সেরূপে তৃষ্ণা জয়ী ব্যক্তির শোকদুঃখ সমূহ দুরীভূত হয়[১৮]।

তৃষ্ণার স্রোত সর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তৃষ্ণালতা সর্বদা অঙ্কুরিত হয় এবং বংশ বৃদ্ধি করে। যখন সেই লতা বংশবৃদ্ধি করবে তখন প্রজ্ঞার দ্বারা তা ছিন্ন করতে হবে[১৯]। সুতরাং সম্যক দৃষ্টি ও সংকল্পের যথার্থ জ্ঞান বা বিদ্যা হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা লাভ হলে অবিদ্যার বিনাশ ঘটে। ভিক্ষু থেকে গৃহী সবাই অবিদ্যার বিনাশ ঘটিয়ে বিদ্যা বা প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠতে পারলে তার নির্বাণের পথ প্রশস্ত হয়।

---

[১৮] "যো চেতং সহতী জন্মিং তহণং লোকে দুরচ্চয়ং
সোকা তমহা পপতন্তি উদবিন্দুব পোকখরা।" *ধম্মপদ,* তণহাবগ্গো সূত্ত- ৩৩৬।

[১৯] "সবন্তি সববধি সোতা লতা উবভিজ্জ তিটঠতি,
তঞ্চ দিসবা লতং জাতং মূলং পঞঞায় ছিন্দথ।" তদেব, সূত্ত- ৩৪০।

৩.৪ নৈতিক জীবনাচারের পরম পরাকাষ্ঠা হিসাবে ব্রহ্মবিহার ভাবনা

বৌদ্ধ নৈতিক আলোচনায় যে কেবলমাত্র নঞর্থক দৃষ্টিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটা করা উচিত নয়, ওটা করা উচিত নয়, এমনটা নয়; সদর্থক গুণাবলী অনুশীলনের ব্যাপারেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সদর্থক গুণাবলীকে এককথায় বলা হয় ব্রহ্মবিহার ভাবনা। চিত্তের একাগ্রতা আনা এবং জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হল ভাবনা। ভাবনা ছাড়া চিত্তের একাগ্রতা আসে না অন্যদিকে একাগ্রতা ছাড়া সমাধি এবং নির্বাণ লাভও সম্ভব নয়। ভাবনাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে – ১) শমথ ভাবনা ২) বিদর্শন ভাবনা।

শমথ ভাবনা- ক্লেশ, তৃষ্ণা, দুঃখকে উপশম করে বলে একে শমথ ভাবনা বলে। শমথ ভাবনা দ্বারা ক্লেশ উপশম হয় ও চিত্তের একাগ্রতা আসে।

বিদর্শন ভাবনা- বিদর্শন ভাবনা দ্বারা অজ্ঞানের ধ্বংস হয়। ভাবনাকারী বা যোগীকে ভাবনা অভ্যাস করার পূর্বে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতেই হবে। ভাবনাকারী বা যোগী প্রথমে গুরু নির্বাচন করবেন। উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে ভাবনার বিষয় ভালভাবে জেনে নিতে হবে। বিষয় নির্বাচন হয়ে গেলে সেই বিষয়ের উপর শিক্ষা, অভ্যাস, আচরণ ধারণ ও পূরণ করার জন্য দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা করতে হবে। ভাবনার সময় অন্যসকল চিন্তা মন থেকে দূর করে একটি বিষয়ের মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখার জন্য বারংবার চেষ্টা করতে হবে। যে বিষয়ের উপর ভাবনা করা হয়– সেই বিষয় বাদে যদি অন্য কোন বিষয়ের প্রতি মন আকৃষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে ভাবনা বা চিত্তের একাগ্রতা সাধন হচ্ছে না। কোন কোন নিমিত্ত দর্শনে যোগীর চিত্তে চাঞ্চল্য তৈরী হয়। তখন গুরুর নিকট তা ব্যক্ত করে তার থেকে নিবৃত্তি লাভের উপায় জেনে নিতে হয়।

ডাক্তার যেমন রোগীর অবস্থা শুনে রোগোৎপত্তির কারণ, রোগ, ঔষধ নির্বাচন করেন তেমন ধম্মগুরু ও যোগীর কাম প্রাবল্য, হিংসা প্রাবল্য, শ্রদ্ধা প্রাবল্য, মোহ প্রাবল্য প্রভৃতি জেনে সাধনার উপায় নির্বাচন করে দেবেন।

এই শমথভাবনা ৪০ প্রকার। এই ৪০ প্রকার বিধি মেনে চললে তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন ত্বরান্বিত হয়। স্থুল বাধা অতিক্রমের সেতুস্বরূপ এই শমথ ভাবনা সর্বক্ষণ প্রয়োজন। ক্লেশের উপশম এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধন এর জন্য যে ৪০ প্রকার শমথ ভাবনার কথা বলা হয়েছে তার মধ্য ক্রোধ হিংসা পরিত্যাগের জন্য ব্রহ্মবিহার ভাবনা অভ্যাসের নিদান দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মবিহার ভাবনা ৪ প্রকার– ১) মৈত্রী ২) করুণা ৩) মুদিতা ৪) উপেক্ষা

মৈত্রী- জগতের প্রতিটি জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হল মৈত্রী। বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে সমাজস্থ জীবের প্রতি আচরণ হল মৈত্রী।

করুণা- প্রতিটি জীবের প্রতি সহানুভূতি ও সমানুভূতি প্রদর্শন হল করুণা। দয়া, দাক্ষিণ্য রূপ মানবিক গুণাবলীর প্রকাশই হল করুণা।

মুদিতা- মুদিতার অর্থ হল প্রফুল্লতা। যে ব্যক্তি সুখে দুঃখে ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করতে পারে সেটাই প্রফুল্লতা। নিজ সুখের সাথে সাথে অন্যের ও কল্যাণ বা সুখ কামনা করার ক্ষেত্রে মুদিতা বা প্রফুল্লতার গুরুত্ব অপরিসীম। নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করতে পারলে তবেই ব্যক্তির মধ্য প্রফুল্লতা বা মুদিতা ভাবনা জন্মাবে।

উপেক্ষা- উপেক্ষা বলতে নিরপেক্ষতাকে বোঝায়। সমাজস্থ প্রতিটি জীবের প্রতি ন্যায় ও নিরপেক্ষ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে।[২০]

৩.৫ বৌদ্ধ ঐতিহ্যে নারীবাদী নৈতিকতা

বৌদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান যে খুব সম্মানজনক ছিল নয় তা আমার বিভিন্ন শাস্ত্র ও সাহিত্যের পর্যালোচনা থেকে জানতে পারি। বৌদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে নারীদের সম্পূর্ণ জীবন পরিসর বাড়ির অন্দর মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। সে সময়ে নারীদেরকে গৃহকর্ম সম্পাদন, সন্তান উৎপাদন সন্তান পালন, পুরুষের কাম চরিতার্থের উপায় বা যন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হত। শিক্ষালাভ, ধর্ম চর্চা, এসকল বিষয়ে নারীদেরকে কোন ভাবে অধিকার দেওয়া হত না।

বুদ্ধদেবের সময়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে নারীদের ধর্মাচারণের অধিকার দেওয়া থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে তারা নারী সমাজের প্রতি সহৃদয় ছিলেন। যদিও শুরুতেই নারীদের বৌদ্ধধর্ম দীক্ষা দেবার প্রতি গৌতম বুদ্ধের আপত্তি ছিল। এবিষয়ে বিনয় পিটকের চুলবগগোতে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

বুদ্ধত্ব লাভের পর ধর্মপ্রচারের পঞ্চমবর্ষে বর্ষাকালে ভগবান তথাগত পিতা ও শুদ্ধোদনের কঠিন পীড়ির সংবাদ পেয়ে বৈশালী থেকে কপিলাবস্তুতে ফিরে আসেন এবং পিতাকে বুদ্ধদেব নিজে জগতের সবকিছুর অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা করেন এসব শোনার পর রাজা শুদ্ধোদন পরিনির্বাণ লাভ করেন। পিতার সৎকার করার পর জ্ঞাতিবর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি পুনরায় বৈশালীতে ফিরে

---

[২০] চৌধুরী, সুকোমল, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, পৃ. ২৫৯।

আসার উদ্দ্যোগ শুরু করলে গৌতম বুদ্ধের পালক মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং ৫০০ শাক্য রমণী বুদ্ধের নিকট দীক্ষা নিতে চাইলেন কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করে বৈশালীতে চলে আসেন। গৌতমী ও পাঁচশত শাক্যরমণী মুন্ডিত মস্তক হয়ে গৃহীদের পোশাক পরিবর্তন করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে বৈশালীর মহাবনে যেখানে বুদ্ধদেব বাস করতেন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য আনন্দ এতজন অসহায়, মুন্ডিত মস্তক, দুঃখিনী, ক্রন্দনরতা মহিলাদেরকে দেখলেন এবং তাদের প্রতি আনন্দের করুণা হল। আনন্দ ভগবান বুদ্ধকে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও শল্য রমণীদেরকে দীক্ষা দেবার জন্য অনুরোধ করলেন কিন্তু বুদ্ধদেব রাজী হলেন না। আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন যে– 'ভন্তে, নারীরা যদি ভিক্ষুণী হয় তাহলে তারা স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী বা অর্হৎ লাভের যোগ্য কিনা'?

বুদ্ধ উত্তরে বলেছেন 'হ্যাঁ পারবে, তাঁরা যদি তোমাদের মত গৃহত্যাগ করতে পারেন তাহলে তাদের চেষ্টা থাকলে মার্গ সকল লাভের অধিকারী হতে পারেন'। এরপর আনন্দ তথাগতকে যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে মায়ের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী নিজের অকৃত্রিম স্নেহ ভালোবাসা, সেবা যত্ন দ্বারা ভগবানকে লালন পালন করেছেন। যেহেতু মহাপ্রজাপতি গৌতমী সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছেন তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভগবানের উচিত তাদের দীক্ষা দেওয়া। তখন বুদ্ধদেব আনন্দকে বোঝালেন যে, যদি মহাপ্রজাপতি সহ ৫০০ জন মহিলা আটটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম [যাকে অটটগুরু ধম্ম/অষ্ট গুরুধর্ম বলা হয়েছে] সেগুলো পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে তাদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এই অষ্ট গুরুধর্ম গুলি হল– ১) একশ বছর উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুণীও এক দিনের উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষুকে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে। ২) যেখানে কোন ভিক্ষু নেই সেখানে ভিক্ষুণীরা বর্ষাবাস যাপন করতে পারবে না। ৩) ভিক্ষুণীকে

প্রতিটি পক্ষে (কালে) উপশথের তারিখ ও উপদেশ দানের সময় ভিক্ষু সংঘের কাছে থেকে জেনে নিতে হবে। ৪) বর্ষার পর প্রবারণা পালনের বিষয় ভিক্ষু সংঘের নিকট ভিক্ষুণীকে প্রকাশ করতে হবে। প্রবারণা শব্দের অর্থ হল স্বদোষ দেখিয়ে দেবার জন্য সংঘকে অনুরোধ করা। ৫) ভিক্ষুণী সংঘাদিশেষ অপরাধ করলে ভিক্ষু সংঘ ও ভিক্ষুণী সংঘের নিকট ১৫ দিনের মানত ব্রত গ্রহণ করতে হবে। মানত ব্রত হল সংঘের সন্তুষ্টির জন্য বিহারের বাইরে রাত্রিযাপন। ৬) দুই বৎসর সংঘে সাধনা করার পর ভিক্ষুণীকে উভয় সংঘই উপসম্পদা দিবে। ৭) ভিক্ষুণী কখনোই কোনভাবে ভিক্ষুকে খারাপ শব্দ প্রয়োগ, আক্রোশ দেখাতে পারবে না। ৮) ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারবে কিন্তু ভিক্ষুণীরা কখনোই ভিক্ষুকে উপদেশ দিতে পারবে না।

আনন্দ এই আটটি নিয়ম গৌতমীকে জানালেন এবং তিনি অনুমোদনও করেছিলেন। এরপর বুদ্ধদেব তথাগতকে বলেছিলেন যে, "হে আনন্দ যদি ধর্মশিক্ষায় নারীকে সন্ন্যাস দেওয়া না হত তাহলে এই ধর্ম ১০০০ বছর টিকিয়া থাকিত। যেহেতু এখন নারীকেও সন্ন্যাসের অধিকার দেওয়া হল সেজন্য এই ধর্ম ৫০০ বছর টিকিবে"।[২১]

এইভাবে মূলত বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দের উৎসাহ ও সহযোগিতায় ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মহাপ্রজাপতি গৌতমী এই আটটি গুরুধর্ম অপমান জনক হওয়া সত্ত্বেও মেনে নিলেন এবং গৌতমীকে ভিক্ষুণী সংঘের নেত্রী করা হয়েছিল। ভিক্ষুণী হয়ে গৌতমী ও তার অনুগামীরা বুদ্ধের সদুপদেশ ও কঠোর সাধনা করে অল্পদিনের মধ্যে অর্হত্ব লাভও করেছিলেন। এই ভিক্ষুণী সংঘ সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্য সময়ের সাথে সাথে নানারকম নিয়ম বা সংহিতা

---

[২১] ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ*, পৃ. ১১৪।

ও বাড়তে থাকল। ভিক্ষুণী সংঘ মূলত ৮টি নিয়ম দিয়ে শুরু হলেও সংঘের শ্রেষ্টত্ব বজায় রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত ৩১১-টি নিয়ম প্রবর্তন করতে হয়েছিল।

যে আটটি অনুশাসন মেনে নিয়ে ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্টা করা হয়েছিল সেগুলি থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নারী জাতির প্রতি বুদ্ধদেবের বিদ্বেষ ছিল এমন নয়, বরং বুদ্ধদেব নারীদের ধর্মীয় অধিকার দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিক শ্রেষ্টত্বকে আরো মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি সংঘে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের মধ্যে ব্যবধান রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। ভিক্ষুণীগণ যাতে ভিক্ষুদের উপর নির্ভরশীল হন তা নিরাপত্তার কারণে বা সংঘের মধ্যে যাতে কোন কলুষতা তৈরী না হয় সেজন্য ও বটে, সংঘের মধ্যে যাতে কোন অনর্থ না ঘটে সেই আশঙ্কায় বুদ্ধ আনন্দকে বলেছেন– "জলাশয়ের জল যাহাতে পাড় অতিক্রম করিয়া চলিয়া না যায় সেই জন্য মানুষ যেমন পূর্বেই প্রকান্ড জলাশয়ের চারিদিকে পাড় বা আল বাঁধিয়া দেয় জলকে আবদ্ধ রাখার জন্য। সেইরূপ নারীজাতির এই প্রব্রজ্যা গ্রহণ যাহাতে মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া না যায় এজন্য পূর্বেই আমি আটটি গুরুধর্ম অনুশাসনের নির্দেশ করিয়াছি। এই অনুশাসন গুলি তাহাদিগকে যাবজ্জীবন পালন করিতে হইবে বলিয়া বিধান করিয়াছি"।[২২]

যদিও ভিক্ষুণী সংঘের এই আটটি নিয়ম প্রবর্তনের সময়কাল ও প্রবর্তক নিয়ে সংশয় আছে। বিনয় পিটকে নিয়ম প্রবর্তন নিয়ে যে পদ্ধতি আছে সেটার সঙ্গে এই আটটি গুরুধর্ম প্রবর্তনের সাযুজ্য নেই। ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্টার পরে শুরু থেকেই ভিক্ষুদের উপর নিময় কানুনের বোঝা বুদ্ধদেব চাপিয়ে দেননি। সময়ের সাথে সাথে একেকটি ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সেই অনুযায়ী তিনি বৌদ্ধ সংঘের Moral Code বা আচার সংহিতা তৈরী করেছিলেন।

---

[২২] অলকা তপস্বী, *থেরীগাথায় নারীজীবন*, পৃ. ১৪৬।

তার কারণ স্বরূপ একথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সংঘ প্রতিষ্টার প্রথম কুড়ি বছর এই আচার বা সংহিতা তৈরী হয়নি। কারণ বুদ্ধদেবের প্রথম দিকের শিষ্যরা হয় অর্হৎ, না হয় অনাগামী, না হয় সকৃদাগামী কমপক্ষে স্রোতাপন্ন। কাজেই তারা কোন গুরুতর অপরাধ করতে পারেন না। কিন্তু ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্টা করার ক্ষেত্রে সেরূপ দেখা যাচ্ছে না। ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্টার আগে সেখানে কোন দোষ ঘটে নাই– তার আগে থেকে ভিক্ষুণীদের উপর এই আটটি নিয়ম চাপানো হল কেন? সুতরাং একথা অনুমান করা যায় যে, যেহেতু বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় সবকিছু গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি ছিল না তাই বুদ্ধের মৃত্যুর পর, ভিক্ষু সংঘ নিজেদের হাতে সকল ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এইসকল নিয়ম বিনয় পিটক ও অঙ্গুত্তর নিকায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। নারী জাতিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্মান দিয়ে যে নৈতিকতার নিদর্শন বুদ্ধদেব দেখিয়াছিলেন, সেক্ষেত্রে ভিক্ষুণীদেরকে ভিক্ষুদের অধঃস্থন করে রেখে ভিক্ষুণীদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ বুদ্ধদেব নিজে করে যাননি। বিনয়পিটক অপেক্ষা সূত্তপিটক বেশী প্রাচীন। সূত্তপিটকে নতুন নতুন সূত্র যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তেমনি ভাবে বিনয় পিটকেও নারীদের বা ভিক্ষুণী সংঘের এই আটটি গুরু ধর্ম ও পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। খ্রীঃপূর্ব প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করেছিল। এই সময়ে এই নিয়মগুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের মহাপরি নির্বাণের বেশ কয়েক বছর পরে এজাতীয় পুরুষ তান্ত্রিকতার নিদর্শক কিছু নিয়ম বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা আসলে বুদ্ধদেবের মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে করা হয়।[২৩]

---

[২৩] ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ*, পৃ. ১১৫।

৩.৬ বৌদ্ধ পরম্পরায় নিরীশ্বরবাদ

ভারতীয় দর্শনালোচনায় বিভিন্ন সময়ে একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বৌদ্ধ দার্শনিকরা জগতের স্রষ্টারূপে কোন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ অলৌকিক পুরুষ বিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে জগতের সকল কিছুই কার্যকারণ সমন্ধ বা প্রতীত্যসমুৎপন্ন নিয়মের অধীন। বিনা কারণে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। অনপেক্ষ বলে জগতে কিছু নেই সবকিছু গতিময় সত্তা। সবই অনাত্ম (Non-Substantial)। নিত্য দ্রব্য বলে কিছু নেই সবই অনিত্য, অশ্বাশত। যে সকল দার্শনিকরা জগতের কর্তা বা স্রষ্টা রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তারা ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, স্বনির্ভর, নিত্য অনপেক্ষ বলে স্বীকার করেছেন। কাজেই কর্তৃকত্ব, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞত্ব– এসকল হল ঈশ্বরবাদী স্বীকৃত ঈশ্বরের লাক্ষণিক বৈশিষ্ট বা গুণাবলী এবং তারা বিশ্বাস করেন এই জগতের স্রষ্টা, চালক এবং সংহারক হলেন ঈশ্বর।

৩.৬.১ ঈশ্বর বিষয়ে তথাগতের মত- ঈশ্বর বিষয়ে বৌদ্ধমত জানার পূর্বে তাদের ইতিহাস জানা দরকার। বৌদ্ধ দর্শনালোচনা থেকে আমরা একটি বিষয়ে জানতে পারি যে গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় তার বাণী কোথাও লিপিবদ্ধ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শ ও বাণী নিয়ে যখন মতভেদ দেখা গেল তখন তাঁরই নিকটতম শিষ্য আনন্দের উদ্দ্যোগে এবং অর্হৎ মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে পাঁচশত বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে সাতমাস ধরে প্রথম প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি আয়োজিত হয়েছিল এবং এরপর থেকে বৌদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ হতে শুরু হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে নানা গ্রন্থাকারে বুদ্ধদেবের বাণী লিপিবদ্ধ হয়ে চলেছে। গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁরই শিষ্যদের মধ্যে যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল তখন বুদ্ধদেবের শিষ্যরা একত্রিত হয়ে গৌতম বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে ঈশ্বর বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের ধারণা কি? বুদ্ধদেব

সম্পূর্ণ নিরুত্তর ছিলেন। এই নিরুত্তর দ্বারা তিনি তার শিষ্যদের বুঝিয়ে ছিলেন যে ঈশ্বর আছেন বা নেই সেই আলোচনা নিতান্তই নিরর্থক। গৌতম বুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল জগতের আত্যন্তিক দুঃখ থেকে প্রতিটি মানুষের কিভাবে মুক্তি লাভ সম্ভব সেই পথের সন্ধান দেওয়া এবং যে পথ অবলম্বন করে তিনি নিজে জীবন্মুক্তি লাভ করেছিলেন সেই সত্যবাণীর প্রচার করে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা আছে চেষ্টা করলে জগতের আত্যন্তিক দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সবার পক্ষে সম্ভব এরজন্য কোন অলৌকিক সত্তার উপর নির্ভর করা নিরর্থক। তাই বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের সর্বদাই উৎসাহিত করতেন আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য– "আত্মদীপো ভব" অর্থাৎ বাহ্য কোন শক্তির সহায়তা প্রার্থনা না করে মানুষ যেন নিজেই নিজের প্রকাশক হয়ে উঠতে পারে। কোন ব্যক্তি যখন ১) সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্। ২) সর্বং দুঃখং দুঃখম্ ৩) সর্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণম্ ৪) সর্বং শূন্যং শূন্যম্। এই চারটি ভাবনায় অবিরত নিবিষ্ট থাকে তখনই তাদের যাবতীয় কামনা বাসনা লোভ নিবৃত্তি হতে থাকে এবং নির্বাণ লাভের পথে অগ্রসর হয়। এই নির্বাণ লাভের জন্য কারোর দয়াদাক্ষিণ্য বা করুণার প্রয়োজন নেই।

বুদ্ধবাণী মূলত তিনটি পিটক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে– ১) বিনয়পিটক- এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আচার-আচরণ, নিয়ম নিয়ে আলোচিত হয়েছে। ২) সূত্ত পিটক- এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের উপদেশ বা বুদ্ধবচন লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটি আবার পাঁচটি নিকার গ্রন্থে বিভক্ত- ক) দীঘ্ঘ নিকায় খ) মজ্ঝিম নিকায় গ) সংযুক্ত নিকায় ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায় ঙ) ক্ষুদ্দক নিকায় ৩) অভিধম্ম পিটকঃ- এই গ্রন্থে বুদ্ধবাণীর দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূত্ত পিটকের অন্তর্গত দীঘ্ঘ নিকায় এবং মজ্ঝিম নিকায়ে বুদ্ধদেব তার শিষ্যদের সঙ্গে যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে তারই দু-

চারটে আলোচনা উল্লেখ করলে একথা স্পষ্ট হবে যে বুদ্ধদেব আসলে নিরীশ্বরবাদের-ই প্রতিপাদন করেছিলেন। দীঘনিকায়-এর সীলকখন্ধবগ্গ-এর তেবিজ্জ সূত্তে দুই ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম বিষয়ে সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে বুদ্ধের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন এই সুত্তে সেই আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে যা থেকে ব্রহ্মবিষয়ে গৌতম বুদ্ধের অভিমতের আভাষ আমরা পেতে পারি। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হবার মার্গামার্গ সম্বন্ধে বিতর্ক হয়েছিল তার মীমাংসার জন্য তাঁরা বুদ্ধের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। তারই মীমাংসা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলেন ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেছেন। তাদের যে পূর্বপুরুষ বা আচার্য, আচার্য-প্রাচার্য, ঊর্দ্ধতন পুরুষ পর্যন্ত এমন কেউ নেই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেছেন। যাঁরা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষি বা মন্ত্রকর্তা, মন্ত্রপ্রবক্তা ছিলেন যথা- অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ট, কাশ্যপ তাঁরাও এরূপ দাবী করেননি যে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হবার মার্গামার্গ তারা জানতেন। কারণ ত্রৈবিধ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চকাম গুণে লিপ্ত, যে ধর্মের পালন করলে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্মের প্রতি অবহেলা করে যে ধর্মপালনে মানুষ অব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্মপালনে ক্রমশ বদ্ধদশায় আবৃত হয়ে পড়েছে। পরিশেষে বুদ্ধ স্বয়ং সেই মার্গ প্রকাশ করলেন- "ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হবার জন্য যে পথ অনুসরণীয় তাহা বুদ্ধ বলিতেছেন না"। গৌতম বুদ্ধের বক্তব্য এই যে, ঐ লক্ষ্য যদি সামনে থাকে সেটাই যদি আদর্শ হয় তাহলে জগত ও জীবন বিষয়ে বুদ্ধদেব যে সত্যের উপলব্ধি করেছেন এবং যে পথ অনুসরণ করে তিনি মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করেছিলেন তা অনুসরণীয়।[২৪]

---

[২৪] ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাঃ), *দীঘনিকায়*, পৃ. ১৫৪-১৬৬।

দীঘ্ঘ নিকায়ের সীলকখন্ধবগ্গ-র কেবদ্ধ সূত্তে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে বুদ্ধের অস্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবদ্ধ নামক ভিক্ষুর মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যে– চারিমহাভুত পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ- এদের নিঃশেষ কোথায়? এই প্রশ্নের সদুত্তরের আশায় তিনি দেবগণের নিকট প্রশ্ন করলেন। দেবগণ উত্তরদানে অক্ষম হয়ে ভিক্ষুকে মহাব্রহ্মার কাছে পাঠালেন এবং তিনি এর উত্তর দিতে পারবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। ভিক্ষু কেবদ্ধ মহাব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়ে একই প্রশ্ন করলেন যে চারি মহাভূতের নিঃশেষ কোথায়? মহাব্রহ্ম ভিক্ষুকে বললেন যে- হে ভিক্ষু আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপরিজিতা সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর কর্তা, নির্মাতা ভূত ও ভবের শক্তিমান পিতা'। ভিক্ষু তার উত্তরে সবিনয়ে জানালেন যে– 'আপনি নিজেকে যেভাবে উপস্থাপন করলেন তা আপনার প্রতি প্রযোজ্য কিনা তা আমি জানতে চাইনি, আমার প্রশ্ন হল চারি মহাভূতের নিঃশেষ কোথায়?

মহাব্রহ্মা তিনবার সচেতন ভাবে– এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাবার পর মহাব্রহ্মা ভিক্ষুর জানালেন যে– "হে ভিক্ষু, দেবগণের ধারণা যে, এমন কিছু নাই যা ব্রহ্মার অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত সেহেতু তাদের সন্মুখে আমি কিছু বলি নাই। চারি মহাভূতের নিঃশেষ কোথায় সে বিষয়ে আমিও অবগত নই। অতএব হে ভিক্ষু এটা তোমার দোষ যে– তুমি ভগবান বুদ্ধের নিকট না গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমার স্মরণাপন্ন হয়েছ"। আসলে নিকায় গ্রন্থের এই ছোট্ট ছোট্ট গল্প গুলোর মাধ্যমে জগত জীবন বিষয়ে বুদ্ধদেবের অভিমত, মাহাত্ম্য শ্রেষ্টত্বের প্রতিপাদন করা হয়েছে, কেবদ্ধ সূত্তে এই গল্পগুলি দ্বারা প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ

সংজ্ঞাটি খন্ডিত হয়েছে। কোন ধারণা বহুদিন বিদ্যমান থাকলেই তাকে শাশ্বত বলা যায় না। এবং গল্পচ্ছলে এটা প্রমাণিত যে ব্রহ্মা বা ঈশ্বর সম্পর্কে কেউই সম্যক ভাবে অবহিত নয়।[২৫]

আবার অঙ্গুত্তর নিকায়ের তিক-নিপাত অংশের মহাবজ্ঞ তে বুদ্ধদেব সরাসরি ঈশ্বরবাদকে খন্ডন করেছেন। শ্রমণ বা ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেবের প্রশ্ন হল- যে সব শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এইরূপ দৃষ্টি পোষণ করেন যে, কোন ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, সুস্থতা অসুস্থতা যা কিছু অনুভব করে সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাহলে তাদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন হল ঈশ্বরের সৃষ্টি বশত মানুষ প্রাণীহত্যাকারী, চোর, মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তাহলে যারা সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল তাদের এই ধরণের কার্য থেকে বিরত হওয়ার কোন ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা নেই। ঈশ্বরকে সামনে রেখে যারা এধরণের কাজে লিপ্ত তাদের প্রতি তিরস্কার।[২৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরবাদকে কখনোই গ্রহণ করেননি, বুদ্ধের দর্শনের ভিত্তি হল অনিত্যবাদ, সুতরাং ঈশ্বর রূপ নিত্য সত্তাটি কখনোই বুদ্ধের কাছে গৃহীত হতে পারে না। দীঘ্ঘ নিকায়ে বর্ণিত গল্প গুলির মাধ্যমে গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বরবাদ, কোথাও ব্রহ্মবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর অঙ্গুত্তর নিকায়ে ঈশ্বরবাদী ব্রাহ্মণরা সরাসরি তিরস্কৃত। সুতরাং বুদ্ধদেব যে কোনভাবে ঈশ্বরবাদী ছিলেন না সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই উপমহাদেশীয় নিরীশ্বরবাদের ইতিহাসে বুদ্ধের স্থান তাই চিরস্মরণীয়।[২৭]

---

[২৫] তদেব, কেবদ্ধ সূত্ত, পৃ. ১৪২-১৪৭।

[২৬] ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাঃ), অঙ্গুত্তর নিকায় (১ম খন্ড), পৃ. ১১৯-১২০।

[২৭] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *ভারতীয় জড়বাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, পৃ. ৩২।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তার নীতি আদর্শ বা বুদ্ধবচন নিয়ে দ্বিমত দেখা গেলে বৌদ্ধ মহাসংগীতির আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাসংগীতির সময় থেকে বৌদ্ধ শিষ্যদের মধ্য থেরবাদী বা স্থবিরবাদী এবং মহাসাংঘিক বা মহাযান এইরূপ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। থেরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের নীতিআদর্শ বা প্রচলিত প্রথার মধ্যে কোনরূপ শিথিলতার স্থান না দিয়ে কঠোর সংযম এ বিশ্বাসী ছিলেন। তারা ঈশ্বরসাধনা, পূজার্চনা রূপ অলৌকিক কোন সত্তায় বিশ্বাস করতেন না। অপরপক্ষে বৌদ্ধধর্মকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং সময়োপযোগী করে তুলতে বা এই ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখার জন্য মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রাচীন বৌদ্ধ মতের মধ্যে কিছু ধারণাকে রক্ষণশীল বলে মনে করে সেগুলির মধ্যে কিছুটা শিথিলতা এনেছিলেন। যেমন, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জীবন চর্যায় কিছুটা কঠোরতা কমানো, বৌদ্ধ ঘরানায় পূজার্চনা প্রচলন করা, ভগবান বুদ্ধকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা ইত্যাদি। ন্যায়াচার্য অবিদ্ধকর্ণপাদ প্রশস্তমতি যেমন ঈশ্বরকে জন্যকর্তা, স্রষ্টা, নিত্য, সর্বজ্ঞ, শাশ্বত, বলে অভিহিত করেছেন মহাযানী বৌদ্ধরা ঈশ্বর বলতে তেমন বোঝাননি। তারা ভগবান বুদ্ধকে ঈশ্বররূপে শ্রদ্ধা করতেন। পরবর্তীকালে মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুগামী যারা তাদের মধ্য কেউ কেউ ন্যায় স্বীকৃত ঈশ্বরের ধারণাকে খন্ডন করেছেন। এবিষয়ে নাগার্জুনের রচিত "ঈশ্বরকর্তৃকত্বনিরাকৃতিঃ", ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' (১/১-২২) শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাটীকা" (৪০-৪৬) ও ভদন্ত শুভগুপ্তের 'ঈশ্বরভঙ্গকারিকা' (১৫-২৩) গ্রন্থগুলি নিরীশ্বরবাদ বিষয়ক প্রাঞ্জল যুক্তিসমৃদ্ধ।

৩.৬.২ নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় নাগার্জুন- এখন নার্গাজুন তাঁর 'ঈশ্বরকর্তৃকত্বনিরাকৃতিঃ' গ্রন্থে কিভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন সেগুলি দেখা যাক।[২৮] যিনি কার্য করেন

---

[২৮] মোহান্ত, দিলীপকুমার, *কতিপয় দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থ (ঈশ্বরকর্তৃকত্বনিরাকৃতিঃ)*, পৃ. ২-১৪।

তিনি কর্তা, যিনি সৃষ্টি কার্য সমাধা করেন তিনি স্রষ্টা। প্রত্যেক কার্য বা সৃষ্টির পিছনে কোন না কোন কর্তা রয়েছেন একথা ঈশ্বরবাদীরা বিভিন্ন গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। তাদের মতে জগত স্রষ্টা ঈশ্বর হলেন এক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। ঈশ্বরবাদীদের এই মতের মধ্য দুটি সম্ভাবনা লক্ষ্যণীয়– ১) এই জগতে যা কিছু অস্তিত্ববান তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়ার ফল। ২) যার অস্তিত্ব নেই তাকেও ঈশ্বর অস্তিত্ববান করে তুলতে পারবেন।

এই গ্রন্থে, এই দুটো সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়েছে, যে সকল পদার্থ পূর্ব থেকে সিদ্ধ বা প্রমাণিত বলে আমরা জানি সেগুলিকে পুনরায় অস্তিত্ববান করে তোলার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য– একথা একান্তই হাস্যকর। যার অস্তিত্ব আছে তাকে পুনরায় অস্তিত্ববান করে তোলার গোটা প্রক্রিয়াটা 'সিদ্ধসাধন' দোষে দুষ্ট। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব আছে একথা আমরা সবাই জানি, অস্তিত্বশীল পদার্থকে পুনরায় অস্তিত্ববান করে তোলার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবী অবান্তর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে নাগার্জুন সিদ্ধসাধন দোষের আপত্তি তোলার পর নৈয়য়িকরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন যে, সিদ্ধের সাধন তাদের ইপ্সিত নয় বরং অসিদ্ধির সাধন-ই ন্যায় অভিমত। যা অসৎ বা যার প্রাগভাব রয়েছে তাদের-ই উৎপত্তির দাবী করেন তারা। কাজেই তাদের আরম্ভবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে সিদ্ধসাধনের আপত্তি নিরর্থক।

যার অস্তিত্ব নেই তাকে ও ঈশ্বর অস্তিত্ববান করে তুলতে পারেন– এই দ্বিতীয় সম্ভাবনার বিরুদ্ধে নাগার্জুনের যুক্তি– যদি এই সম্ভাবনা সত্য হয় তাহলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বালুকণা থেকে তেল উৎপন্ন করতে পারেন কিংবা কচ্ছপের পিঠে লোম উৎপন্ন করতে পারেন। এই ধরণের বিষয়কে বাস্তবিক রূপ দেওয়া কার্যত অসম্ভব– এজন্য স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবী ও অবান্তর।

পূর্বপক্ষী বা ঈশ্বরবাদীদের মুল বক্তব্য হল– জাগতিক বস্তুসকল ঈশ্বর সৃষ্ট বলে সে সব ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টির পরে থেকে অস্তিত্ববান। কিন্তু 'ঈশ্বরকর্তৃকত্বনিরাকৃতি' গ্রন্থে নাগার্জুনের বক্তব্য হল– এই ধারণা স্ববিরোধী, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব উভয় ধারণা পরস্পর বর্জনমূলক। জীবিত ও মৃত আলো ও অন্ধকার প্রভৃতির ধারণা পরস্পর বর্জনমূলক। যাদের একটির উপস্থিতিতে অন্যটি অনুপস্থিত বা একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটি উপস্থিত হয়, বাস্তবে এমন কোন ব্যক্তিকে অস্তিত্বহীন কিংবা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ববান বলছে। তাই অসিদ্ধ কোন বস্তুকে সিদ্ধ করার কর্তা হিসেবে ঈশ্বর স্বীকারের দাবীও অযৌক্তিক।[২৯]

তৃতীয় আরেকটি আপত্তি তুলেছেন নাগার্জুন সেটি হল– জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর কিভাবে উৎপন্ন বা সৃষ্ট? ঈশ্বরের কারণ কি ঈশ্বর নিজেই অথবা ঈশ্বর তদতিরিক্ত কোন কারণ থেকে উৎপন্ন? ঈশ্বর স্বতঃ, পরতঃ বা উভয়ত কিভাবে উৎপন্ন? যদি বলা হয় যে ঈশ্বর স্বয়ং অনুৎপন্ন, তাহলে তিনি জগৎ সৃষ্টির কর্তা হতে পারেন না। যার নিজের অস্তিত্ব নেই তিনি জগতের অন্যবস্তু সৃষ্টি করবেন কিভাবে? যদি বলা হয় যে– ঈশ্বর নিজে প্রথমে উৎপন্ন হন এবং এরপরে অন্য বস্তু সকল উৎপন্ন করেন তাহলে আবার প্রশ্ন হবে যে– ঈশ্বর নিজে উৎপত্তির কারণ কি? ঈশ্বর স্বতঃ উৎপন্ন একথা বললে তাতে ক্রিয়ানিরোধ হবে। কারো নিজের ক্রিয়া তার কারণ হয় না। অন্য বস্তুকে ছেদন করার জন্য ছুরিকা ব্যবহার করা হলেও সেই ছুরিকা যতই শাণিত হোক না কেন সে নিজেকে ছেদন করতে পারবে না। তর্কের খাতিরে জগত সৃষ্টিতে ঈশ্বর স্বীকার করতে গেলেও একথা কিছুতেই স্বীকার করা যাবে না যে– ঈশ্বর নিজেই তার স্রষ্টা। এই অসম্ভবতা বোঝাতে

---

[২৯] "য সিদ্ধঃ সঃ সিদ্ধঃ এব
যঃ তু অসিদ্ধঃ সঃ অসিদ্ধঃ এবঃ।"— *ঈশ্বরকর্তৃকত্বনিরাকৃতি*, শ্লোক-৩।

গিয়ে গ্রন্থকার একটি উপমা ব্যবহার করেছেন তা হল কোন নৃত্যশিল্পীর দক্ষতা নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় কিন্তু সে যতই দক্ষ শিল্পী হোক না কেন কখনোই তিনি তার নিজের কাঁধের উপর ভর করে নৃত্য করতে পারবেন না। তাৎপর্য এই যে ঈশ্বর নিজের উপর ভরকরে নিজে সৃষ্টি করতে পারবেন না।[৩০]

ঈশ্বর যদি নিজেই নিজের কারণ হয় তবে তিনি জন্য ও জনক উভয় হবেন। উৎপত্তি হচ্ছে বলে ঈশ্বর 'জন্য' পদার্থ, আর তার নিজের থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বলে ঈশ্বর জনক পদার্থ। একই বিষয়ে জন্যজনক ভাব যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বরকে তার নিজের কারণ বললে একই বিষয়ে জন্য-জনকভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যা আসলে অবান্তর ব্যাপার। এই সকল কারণে ঈশ্বর স্বতসিদ্ধ বা স্বতঃ উৎপন্ন একথা বলা যায় না। এখন পূর্বপক্ষী ঈশ্বরবাদীরা যদি একথা বলেন যে ঈশ্বর স্বতঃ উৎপন্ন না হলে কি হবে ঈশ্বর পরতঃ অর্থাৎ তদতিরিক্ত বস্তু থেকে উৎপন্ন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় কারণ তদতিরিক্ত সব বস্তু তার দ্বারা সৃষ্ট। তাহলে যুক্তির আকারটি হবে– ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্যবস্তুর অস্তিত্ব সাপেক্ষ, আর অন্য বস্তুর অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাপেক্ষ তাহলে এই যুক্তিটি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুষ্ট। ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবী যেখানে অযৌক্তিক সেখানে ঈশ্বরসৃষ্ট অন্য বস্তু কিভাবে ঈশ্বর উৎপত্তির কারণ হবে? আরো সম্ভাবনা হল যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব পরতগ্রাহ্য তখন অনবস্থা দোষ হয়। অন্যবস্তুর অস্তিত্ব যেখানে নিশ্চিত নয় সেখানে অন্যবস্তু থেকে ঈশ্বর উৎপন্ন একথা যুক্তি যুক্ত নয়। ঈশ্বর অনাদি অর্থাৎ যার কোন শুরুই নেই। আর যার শুরু নেই তার পারম্পর্যের প্রশ্নই অবান্তর। বীজের অস্তিত্ব না থাকলে গাছ, শাখা প্রশাখা ফুল ফল

---

[৩০] "তদা কস্মাদ উৎপন্নঃ কিং স্বতঃ, কিং পরতঃউভয়ত বা?
ন সুশিক্ষিতঃ অপি নটবটুঃ স্বকীয়ং স্কন্ধম আরুহ্য নতিতুং শকনতি"। তদেব, শ্লোক- ৪।

এসবের দাবী অবান্তর। তাই ঈশ্বর তদতিরিক্ত কোন বস্তু থেকে উৎপন্ন বা ঈশ্বর পরতঃ এমন দাবী অযৌক্তিক। এবার যদি বলা হয় যে ঈশ্বর স্বতঃ এবং পরতঃ বা উভয়ত উৎপন্ন তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে যেখানে দুটো বিকল্প পৃথক পৃথক ভাবে দোষ দুষ্ট তাহলে সংযুক্ত রূপ আগের দুটো দোষের সংযুক্ত রূপ দ্বারা দোষ দুষ্ট হবে। তাই কোন ভাবেই জগৎ স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার যুক্তিযুক্ত নয়।[৩১]

৩.৬.৩ ঈশ্বর খন্ডনে ধর্মকীর্তি- বৌদ্ধ পরম্পরায় যে সকল তীক্ষ্ণধী তার্কিকের উল্লেখ আমরা পেয়ে থাকি তাদের মধ্য অন্যতম হলেন আচার্য ধর্মকীর্তি। তাঁর যৌক্তিক বিশ্লেষণী দক্ষতা ও জ্ঞানের গভীরতার বিচারে ভারতীয় দর্শন পরম্পরায় ধর্মকীতির অবস্থান ও গুরুত্বকে অনেকে পাশ্চাত্যের কান্টের সমপর্যায় বলে স্বীকার করেন। আচার্য ধর্মকীর্তি তার 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন এবং নৈয়ায়িক স্বীকৃত নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খন্ডন করেছেন। আচার্য ধর্মকীর্তি তার প্রমাণবার্তিক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং নৈয়ায়িক স্বীকৃত ঈশ্বর খন্ডন কিভাবে উপস্থাপন করেছেন তা দেখা যাক– ধর্মকীতি তাঁর "প্রমাণবার্তিক" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন। যদিও তিনি এখানে 'ভগবান' শব্দটি শ্রেষ্টত্ব, গৌরব বা প্রশংসাসূচক বিশেষণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। ভগবান বলতে কোথাও জগত কর্তা বা ঈশ্বরকে বোঝাননি। যথাযথ

---

[৩১] "কিং চ স্বয়ম এব জন্যঃ স্বয়ম্ এব জনক ইতি?....
...বীজস্য অভাবাৎ।...
....তস্মাৎ অসিদ্ধ কর্তা ইতি"।– তদেব, শ্লোক- ৫, ৬, ৭।

সত্য দ্রষ্টা ব্যক্তিকে প্রমাণ পুরুষ রূপে গ্রহণ করা চলে বলে ধর্মকীর্তি মনে করতেন। কিন্তু নিত্য, সর্বজ্ঞতা, বৌদ্ধমতে অসম্ভব ও অযৌক্তিক।[৩২]

ভগবান বুদ্ধদেব তার কঠোর সাধনার মাধ্যমে উপলব্ধ সত্যকে অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং নিজের প্রজ্ঞালব্ধ সত্যকে জগতের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সেই উপদেশাবলী মহান আর্যসত্যচতুষ্টয় নামে খ্যাত। অন্যের পক্ষে যা অনুভব করা সম্ভব হয়নি সেই পরম সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছিলেন বলেই তিনি ভগবান বুদ্ধ রূপে শ্রদ্ধার পাত্র বা প্রমাণ পুরুষ রূপে বিদিত।

ধর্মকীর্তির অভিমত হল ভগবান বুদ্ধদেবের সর্বজ্ঞতা প্রমাণসিদ্ধ বলেই বুদ্ধদেবকে প্রমাণ পুরুষ রূপে গ্রহণ করা সম্ভব। ন্যায়সম্মত নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান কোন সত্তা যদি অনুরূপভাবে প্রমাণসিদ্ধ হত তাহলে নিশ্চয়ই তা সর্বজনগ্রাহ্য হত। কিন্তু নিত্য, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। তাই ন্যায় স্বীকৃত নিত্য, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বিপক্ষে আচার্য ধর্মকীর্তি প্রশ্ন তুলেছেন যে, এই জগতের নির্মাণকর্তা কেউ যদি থাকেন তাহলে তিনি নিত্য না কি অনিত্য? নিত্য জগত কর্তা প্রমাণ সিদ্ধ নয় তার কারণ প্রতিটি বস্তু স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণেই সদৃশ বস্তু রেখে বিনষ্ট হয়ে যায়। কারণ বৌদ্ধমতে প্রতিটি সদ্ববস্তু হল ক্ষণিক। কিন্তু বস্তুর উৎপাদক একজন নিত্যকর্তা থাকলে কখনো বস্তু এরূপ হতে পারত না। কেননা সৃষ্টিকর্তা নিত্য হলে তাঁর সৃষ্ট নিমার্ণকার্য ও নিত্য হত অর্থাৎ অন্তহীন হত। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা সেকথা বলে না। ধর্মকীর্তি এখানে বস্তুর অনিত্যতা সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে বৌদ্ধমতের উল্লেখ করেছেন। যা অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ যার প্রয়োজনসিদ্ধির যোগ্যতা রয়েছে তাই সদবস্তু। প্রতিটি সদবস্তুরই একটি অনন্য

---

[৩২] "তদ্বৎপ্রমাণং ভগবান"- *প্রমাণবার্তিক*- ১/৯।

সাধারণ সামর্থ্য আছে এবং সেই সামর্থ্য এক একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– জল একটি বস্তু তার তৃষ্ণা নিবারণের সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু পিপাসার্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ একক্ষণে সম্পাদিত হয়, অন্যসময়ে জল তৃষ্ণা নিবারণ করে কিনা তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত নয় কেবল অনুমানের দ্বারা নির্ধারিত। সুতরাং জলের তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষমতা যে মুহূর্তে অনুভুত হয় জলের অস্তিত্ব শুধু সেই ক্ষণটিতে সিদ্ধ অন্যসময়ে ঐ নির্দিষ্ট ক্ষণের তৃষ্ণা নিবারক জল বিদ্যমান ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। ন্যায়ের ঈশ্বরসাধক যুক্তি প্রসঙ্গে এই মতবাদের তাৎপর্য স্পষ্ট এবং সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ধর্মকীর্তি বলেছেন– বস্তু ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য বা স্থির নয়। বস্তুর নিত্যত্ব-ই যদি প্রমাণ সিদ্ধ না হয় তবে তথাকথিত জগৎ কর্তাকেও নিত্য বলা অসম্ভব কেননা সেই জগৎকর্তাও তো একটি সৎবস্তু যা সৎ তা ক্ষণিক অতএব জগৎকর্তা ও ক্ষণিক এবং সেই জগৎ কর্তা ও নিত্য হতে পারেন না। অন্যদিকে জগৎকর্তা যদি নিত্য হতেন তাহলে তার জগৎ কর্তৃত্ব নিত্য রয়েছে একথা মানতে হয়। বহ্নি ও উষ্ণত্ব যেমন অভিন্ন তেমনি জগৎকর্তা ও তার কর্তৃত্ব ও অভিন্ন হবে। তাই জগৎকর্তা নিত্য হলে তার জগৎ কর্তৃত্ব ও নিত্য হবে। জগৎ বলতে ত্রিকালের সমষ্টিরূপ সমগ্র জগৎকেই বুঝতে হবে। সুতরাং জগৎ কর্তা নিত্য হলে তিনি একই সময়ে সমস্ত জগৎ নির্মাণ করবেন। যদি তিনি সেটা না করেন তাহলে সমস্ত জগতের কর্তৃত্ব একজনের হাতে রয়েছে একথা বলা যায় না। ঈশ্বরকে নিত্য বলে মেনে নিলে সমগ্র জগতের উৎপত্তি নিত্যই হবে, অতীতে উৎপন্ন হয়েছিল বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে এসব কথা অর্থহীন হয়ে যায়, কিন্তু নৈয়ায়িকরা সমগ্র জগতের উৎপত্তি নিত্য বলে স্বীকার করেন না। তারা প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব স্বীকার করে নিয়ে একথা স্পষ্ট বোঝাতে চেয়েছেন যে জাগতিক বস্তুর উৎপত্তির কালভেদ আছে। তাই ন্যায়ের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের যুক্তি হল– একদিকে বস্তুর

উৎপত্তির কালভেদ স্বীকার করবেন আবার বলবেন উৎপাদন কর্তা ও তার সমস্ত উৎপাদন সার্মথ্য নিয়ে নিত্য বিরাজমান এই বক্তব্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।[৩৩]

বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদ প্রসঙ্গে আরো একটি তত্ত্বের কথা আলোচিত হওয়া প্রয়োজন তাহল বৌদ্ধ অনিত্যবাদ। প্রতীত্যসমুৎপাদবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বৌদ্ধ অনিত্যবাদ। জগতের প্রতিটি বস্তু অনিত্য, অস্থায়ী। পরিবর্তন জাগতিক সত্য। ব্যবহারিক দৃষ্টি এবং অবিদ্যা জনিত কারণে জগত এবং জাগতিক বস্তু সকল স্থায়ী বলে মনে হলেও আসলে স্থায়ী বলে কিছু নেই। প্রতিটি বস্তুর উৎপত্তি,বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। বস্তুমাত্রই পূর্বাপর ভাব ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্বের অবস্থা হল কারণ আর পরের অবস্থা হল কার্য। কার্য হল কারণ থেকে উৎপন্ন স্বতন্ত্র এক অনিত্য ঘটনা। প্রতি সৃষ্টি এক একটি নতুন ঘটনা– কোন কিছুরই পুনরাবৃত্তি হয় না। জগত ও জাগতিক বিষয় এক অবিরত পরিবর্তনের প্রবাহমাত্র। "সর্বং অনিত্যং"– এই পরিবর্তন কার্য কারণ নিয়ম মেনেই সম্পাদিত হয়ে চলেছে, কোন, অলৌকিক, অতিলৌকিক সত্তার দ্বারা পরিচালিত হয় না। প্রকৃতির এই কার্য কারণ সম্পর্কিত নিয়ম অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তনশীলতা অনিত্যতার কোন ব্যতিক্রম হয় না। ব্যক্তি, সমষ্টি অর্ন্তজগত, বর্হিজগত সর্বত্রই আমাদের অগোচরে নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের অন্তরালে যে হেতু বা কারণ তা কোন ভাবে নিত্য বা শাশ্বত নয়। বুদ্ধদেব তাঁর অন্তিম শয্যায় নিকটতম শিষ্যদের যে উপদেশ দিয়েছেন তার বিবরণ

---

[৩৩] "নিত্য প্রমাণং নৈব্যাক্তি প্রামান্যাৎ বস্তুসদগতেঃ

জ্ঞেয়ানিত্যতয়া তস্যা অধ্রৌব্যাৎ ক্রমজন্মনাম।। ১০

নিত্যদুৎপত্তি বিশ্লেষাদপেক্ষায়া অযোগতঃ

কথাঞ্চিৎ নোপকার্যত্বাদানিত্যে প্রমাণতা।।" ১১ – *প্রমাণবার্তিক,* প্রথম অধ্যায়।

আমরা দীর্ঘ নিকায়ের মহাসতিপঠান সুত্তে পাই। এখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে এই পঞ্চস্কন্ধ– রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার বিজ্ঞান সহযোগে মানবজীবন গঠিত হয়েছে তা অনিত্য ও অধ্রুব। এই পঞ্চস্বন্ধ উৎপন্ন হয় আবার সময়ের সাথে সাথে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বুদ্ধদেবের অন্তিম কালের উপদেশের মধ্যেই আমরা অনিত্যতা বিষয়ক উপদেশের নিদর্শন পাই। বৌদ্ধদর্শনে জাগতিক বস্তুকে অনিত্য এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ জনিত সৃষ্ট বলা হয়েছে তাহলে অনিত্য বস্তুর সৃষ্টির জন্য কোন নিত্য ঈশ্বর স্বীকারের অবকাশ নেই। যদি অনিত্য বস্তুর কারণ হিসাবে নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করা হয় তাহলে ঈশ্বরের নিত্যতার বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়। পরবর্তী কালে ধর্মকীর্তি প্রমাণবার্তিক গ্রন্থে সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের নিত্যতার বিরোধী যুক্তির প্রতিপাদন করেছেন।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তা হতে স্পষ্ট যে বৌদ্ধদর্শনে একটি উচ্চমানের নীতি নৈতিকতার পাঠ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এই নৈতিকতার গম্ভীর উপদেশ কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত নয়। বিশেষত এই দর্শন অনাত্মবাদী ও নিরীশ্বরবাদী। স্থায়ী আত্মার ধারণা যে মিথ্যাদৃষ্টিপ্রসূত তা যেমন স্পষ্ট করা হয়েছে তেমনি জগৎস্রষ্টা রূপে ঈশ্বরের ধারণাকে লালন করা যে অযৌক্তিক সেকথা প্রমাণ করতেও নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন বৌদ্ধাচার্যরা। এইসব বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে বৌদ্ধমতে নৈতিক জীবনের অনুগমন ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাসের অপেক্ষা রাখে না।

সৃষ্টি ও নৈতিকতার ব্যাখ্যায় সাংখীয় নিরীশ্বরবাদ

৪.১ সূচনা– মহর্ষি কপিলপ্রণীত দর্শন হিসেবে সাংখ্য দর্শনের পরিচিতি। সাংখ্য শব্দটি সংখ্যা শব্দ থেকে উৎপন্ন, এই সংখ্যার নানা অর্থ হতে পারে। এক অর্থে সাংখ্য হল সম্যক জ্ঞান। আরেকটি মতানুসারে যেহেতু তত্ত্বসংখ্যা নিরূপণের উপর কপিল প্রণীত দর্শনে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাই এই দর্শনের নাম হয়েছে সাংখ্য। সাংখ্য শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল– 'সম্যক জ্ঞান'। এই অর্থে যে শাস্ত্র সম্যক জ্ঞান প্রদান করে তাই সাংখ্য। সাংখ্যদর্শনের সময়কাল নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। সাংখ্যের উৎপত্তিকাল নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও এই দর্শন যে উপনিষদ ও মহাভারতের পূর্বে রচিত ঘটনা পরম্পরা সে কথা প্রমাণ করে। কেননা উপনিষদ ও মহাভারতের মধ্যে সাংখ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কপিলকে প্রাচীনতম জ্ঞানী ঋষিরূপে কল্পনা করা হয়েছে।[১] মহাভারতের শান্তিপর্বে সাংখ্যকার কপিলকে হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন– পৃথিবীর মধ্যে সাংখ্যদর্শন হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন। সাংখ্য দর্শনের আদিকাল থেকে যে মতাদর্শ প্রচলিত ও প্রসারিত হয়েছিল তার লিখিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না, যতদূর জানা যায় মহর্ষি কপিল জগৎ বিষয়ক জ্ঞান এবং মুক্তি লাভের জন্য যে পথের সন্ধান করেছিলেন তা তিনি তার শিষ্য আসুরিকে দিয়েছিলেন, আসুরি পঞ্চশিখকে, পঞ্চশিখ তাঁর শিষ্য মহর্ষি ঈশ্বরকৃষ্ণকে প্রদান করেছিলেন। এভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় সাংখ্য দর্শনের প্রসার ঘটেছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ ৭০টি কারিকা দ্বারা গঠিত সাংখ্যকারিকায় যুক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভের মার্গকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রন্থটি উপস্থাপন করেছেন। তাই সাংখ্য পরম্পরায় ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত এই গ্রন্থটি প্রামাণিক বলে গণ্য হয়। এই গ্রন্থে

[১] "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈবিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেত"।- *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৫/২।

তত্ত্ব হিসাবে ঈশ্বরের উল্লেখ নেই, কি জগত সৃষ্টি, কি জীবের মুক্তি কোন প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী হিসাবে পরিগণিত হয়। আধিবিদ্যক পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে বা নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ হিসাবে যে ঈশ্বর স্বীকৃতি অপরিহার্য নয় তা স্পষ্ট করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

৪.২ জগতসৃষ্টির ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শন

ঈশ্বরবাদীরা জগতের কর্তারূপে ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকার করেছেন। কাজেই তাদের কাছে জগতের উৎপত্তি, জগতের ব্যাখ্যা এবং ব্যক্তির মুক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাংখ্যে জগতের উৎপত্তি ও সাধকের মুক্তির জন্য অতিন্দ্রিয় ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকার না করে জড় জগতের আলোচনার উপর সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাংখ্য মতে সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ দুটি তত্ত্ব প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে জগতের মূল উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। প্রকৃতিকে অনাদি, অন্তহীন, নিত্য, অসীম, সুক্ষ্ম রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকৃতি শব্দের অর্থ হল– "প্রকরোতি যা সা প্রকৃতিঃ" অর্থাৎ যে প্রকৃষ্ট ভাবে কার্য বা সৃষ্টি করে সে প্রকৃতি। যে নিজে সৃষ্টি করে বা কর্তৃত্ববিশিষ্ট, কখনোই কৃত বা কর্মত্ব বিশিষ্ট হয় না তাকে প্রকৃতি বলা হয়। সকল কার্য উৎপন্ন করে তা নিয়ন্ত্রণ ও করেন বলে প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। অপরপক্ষে পুরুষ বা আত্মা ব্যক্ত (বিকৃতি) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি) এর বিপরীত।[২] পুরুষ অবিষয়, চেতন, বিবেকী, অপ্রসবধর্মী এজন্য পুরুষ সাক্ষীচৈতন্য। পুরুষ অপ্রসবধর্মী হওয়ায় অকর্তা।

[২] "ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতি পুরুষঃ।"- *সাংখ্যকারিকা-* ৩।

সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি তত্ত্বকে স্বীকার করার জন্য সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী বলা হয়ে থাকে।

৪.২.১ সৎকার্যবাদ প্রসঙ্গ– সাংখ্যের যে মূলতত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ সেগুলি সূক্ষ্ম বা দূর্লক্ষ্য। কাজেই এদের উপলব্ধি হয় না। অনুপলব্ধি হলেও তারা যে অপ্রামাণিক নয় সে কথা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাংখ্যাচার্যগণ অনুমানের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। ওই অনুমান সৎকার্যবাদ নির্ভর। কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদানের মধ্যে সৎ এই মতবাদকে সৎকার্যবাদ বলা হয়। এই মতবাদ অসৎ কার্যবাদের বিরোধী। যারা অসৎ কার্যবাদ সমর্থন করেন তারা মনে করেন কার্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে অসৎ। সাংখ্য দার্শনিকরা এই অসৎ কার্যবাদকে সমর্থন করেন না। সাংখ্য মতে যা কারণ এর মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে তাই কার্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কারণ থেকে কার্যের যে উৎপত্তি ঘটে তা কোন নতুনের সৃষ্টি নয় বরং অব্যক্তের ব্যক্তরূপ প্রাপ্তি বা অভিব্যক্তি। এভাবে জগতের সমস্ত বস্তু কারণ থেকে কার্যে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যেমন তন্তুর মধ্যে বস্ত্র সুপ্ত অবস্থায় থাকে তন্তুবায় বিভিন্ন উপাদান তুরী, বেমা ইত্যাদি সহযোগে ব্যক্ত করে মাত্র। তিলের মধ্যে তৈল সুপ্ত অবস্থায় থাকে পেষণের দ্বারা তা ব্যক্ত হয়। ব্যক্ত কার্য হতে অব্যক্ত কারণের অনুমান করা সম্ভব। এই যে জগতপ্রপঞ্চ তার পরম কারণ হিসাবে আমরা অব্যক্ত প্রকৃতিতে উপনীত হতে পারি। সাংখ্যাচার্যগণ এই সৎকার্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন। যা অসৎ তা কখনো সৎ বা উৎপন্ন হতে পারে না। উপাদানের সঙ্গে কার্যের একটি সম্বন্ধ থাকা দরকার যদি কার্যকারণে অসৎ হয় তাহলে উপাদানের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হতে পারে না এবং কার্যের উৎপত্তিও হতে পারে না। কোনরকম সম্বন্ধ ছাড়া যদি কার্য থেকে কারণ উৎপন্ন হতে পারে বলে মনে করা হয় তাহলে যে কোন কারণ থেকে যে কোন কার্য উৎপন্ন হত,

কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। কেউ বলতে পারেন কারণ এর মধ্যে যে বিশেষ শক্তি থাকে তা থেকেই কার্য উৎপন্ন হতে পারে। এর উত্তর দিতে গিয়ে আচার্যগণ বলেছেন যে শক্ত থেকে শক্যই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে কারণের মধ্যে যে কার্যের উৎপন্ন করার শক্তি থাকে সেই কারণ থেকে সেই কার্য উৎপত্তি হয়। যেমন বালুকার মধ্যে তৈল উৎপন্ন করার সামর্থ্য থাকে না বলে বালুকা থেকে তৈল উৎপন্ন হয় না। কিন্তু তিলের মধ্যে তৈল উৎপন্ন করার সামর্থ্য থাকে বলেই তিল থেকে তৈলের উৎপত্তি সম্ভব। এখন কারণের মধ্যে কার্যের শক্তি থাকার অর্থ হলো কার্যটি অব্যক্ত অবস্থায় কারণের মধ্যে বর্তমান থাকে। তিলের মধ্যে অব্যক্ত অবস্থায় তৈলের বর্তমান থাকা তিলের শক্তি যার কারণে তিল থেকে তৈল উৎপন্ন হয়। তাছাড়া কারণ এবং কার্য দুটি ভিন্ন হলেও বস্তুত একই বিষয়কে সূচিত করে এবং গুরুত্বের দিক থেকেও এক। সুতরাং কার্য কারণে অব্যক্ত থাকে বলে শক্য কারণ থেকে শক্ত কার্যের উৎপত্তি হয়। আপাত ভাবে পৃথক মনে হলেও কারণের সঙ্গে কার্যের সে অর্থে কোন পার্থক্য থাকে না যেমন অলংকারের সঙ্গে সোনার। শুধু পার্থক্য এই যে কারণে কার্যটি অব্যক্ত থাকে এবং কার্যে কারণটি প্রকাশিত হয়। কার্যের মধ্য দিয়ে কারণটি অভিব্যক্ত হয় মাত্র। অভিব্যক্তি তারই হতে পারে যা কারণের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই নীতির দ্বারা সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি পরিণামবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তারা দেখিয়েছেন জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে কোন অব্যক্ত কারণের মধ্যে থাকে সেই অব্যক্ত পরম কারণ হিসাবে তারা প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সেই প্রকৃতির থেকে এই ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি। ওই অভিব্যক্তি কিভাবে হয় সেই আলোচনা এখন অগ্রসর হওয়া যাক।

৪.২.২ সাংখ্যের তত্ত্বসকল- সাংখ্য দর্শনে তত্ত্ব সংখ্যা নিরূপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে এই দর্শন সাংখ্য নামে পরিচিত। এখন এই দর্শনে তত্ত্ব সংখ্যা কয়টি এক কথায় তার উত্তর

দেওয়া সমস্যার। সাংখ্যদর্শনে তত্ত্বকে নানা ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। এক হিসাবে এই দর্শনের তত্ত্ব সংখ্যা দুইটি প্রকৃতি এবং পুরুষ। জগতের একটি জড়াত্মক এবং একটি চেতনাত্মক দিক রয়েছে এই দুটি দিককে বিচার রেখে চিন্ময় ও মৃন্ময় দুটি তত্ত্ব কে স্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে মুক্তির দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিনটি তত্ত্বকে স্বীকার করেছেন। আবার সাংখ্য কারিকায় প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি এবং অনুভয় এভাবে ভাগ করা হয়েছে যা কেবল কারণ কখনো কার্য নয় তাই হলো প্রকৃতি। সকল কারণ উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে প্রকৃতি প্রধান কারণ। সত্ত্ব,রজ ও তমো এই তিনের সাম্যবস্থা হল প্রকৃতি। এই প্রকৃতি প্রধান এবং মূল কারণ। বিকৃতি অর্থাৎ যা কেবল কার্য কখনো কারণ হতে পারবে না। বিকৃতি বা কার্য ১৬ টি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি ভূত এবং মন এরা কখনোই কারণ হতে পারে না, কেবল কার্য। যা থেকে আর কোন কিছুর সৃষ্টি হবে না। প্রকৃতি বিকৃতি উভয় অর্থাৎ কার্য-কারণ উভয় মহতত্ত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ মহৎ অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই ৭টি কার্য ও কারণ উভয় রূপে বিদ্যমান। প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়, অনুভয়- যা কারণ ও কার্যটি কোনোটিই নয় তা হলো অনুভয় সেটি হল একমাত্র পুরুষ। পুরুষ হল একমাত্র পারমার্থিক সত্তা। অবিদ্যা দূরীভূত হয়ে জীব যখন এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান লাভ করবে এবং ‘ব্যক্ত’, ‘অব্যক্ত’ থেকে ‘জ্ঞ’ বা চৈতন্য যে ভিন্ন এই আত্মজ্ঞান লাভ করবে তখন-ই জীবের মুক্তি বা কৈবল্যলাভ সম্ভব হবে।

৪.২.২.১ সাংখ্যের মূলতত্ত্বদ্বয়: প্রকৃতি ও পুরুষ- সাংখ্য দর্শনে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি শব্দের অর্থ হলো ‘প্রকরোতি যা সা প্রকৃতি’ অর্থাৎ যে প্রকৃষ্টভাবে কার্য সম্পন্ন করে সে প্রকৃতি। যে নিজে সৃষ্টি করে বা কর্তৃত্ব বিশিষ্ট কখনোই কৃত বা কর্মত্ব বিশিষ্ট

হয় না তাকে প্রকৃতি বলা হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ত্বের ভিত্তি হল সাংখ্যের কার্যকারণবাদ বা পরিণামবাদ। সাংখ্য মতে কার্যকারণের প্রকৃত পরিণাম। উৎপত্তির পূর্বে কার্যকারণে সুক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে এবং কারণ কার্যে পরিণত হওয়ার অর্থ হলো সেই সুক্ষাবস্থার স্থূলতা প্রাপ্তি। কার্য মাত্রই কারণ প্রসূত। কার্যের মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে না যা কারণে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল না। এই ব্যক্ত জগৎ হলো কার্য এবং ব্যক্ত জগতের মূল কারণ হল প্রকৃতি। প্রকৃতি জগতের আদি জননী স্বরূপা। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি অতিসূক্ষ্ম হওয়ায় তা প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। জগৎরূপ কার্যের অস্তিত্ব থেকে প্রকৃতির সত্তা এবং জগৎরূপ কার্যের স্বরূপ থেকে প্রকৃতির স্বরূপ অনুমান করতে হয়। জাগতিক সকল বস্তুর মধ্যে ত্রিগুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে অনুমান করা হয় যে আদি কারণ প্রকৃতি ও ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব রজ ও তমো এই তিনটি গুণের সাম্যবস্থায় প্রকৃতি[৩]।

সাংখ্যকার প্রকৃতিকে নানা নামে চিহ্নিত করেছেন। ব্যক্তপদার্থ মাত্রই প্রকৃতিতে অব্যক্ত রূপে থাকে বলে প্রকৃতিকে বলা হয় অব্যক্ত। প্রকৃতি জগতের অমূল মূল হওয়ায় প্রকৃতিকে বলা হয় প্রধান। জগৎ বা কার্যপ্রসবিনী হওয়ায় প্রকৃতিকে বলা হয় শক্তি। অচেতন হওয়ায় প্রকৃতিকে জড় বলা হয়।

সাংখ্যের দ্বিতীয় মূলতত্ত্ব হলো পুরুষ। সাংখ্য মতে পুরুষ ব্যক্ত (বিকৃতি) অব্যক্ত (প্রকৃতি) এর বিপরীত। পুরুষ হলো ন প্রকৃতিঃ না বিকৃতি বা অনুভয়। পুরুষ কোন কিছুর কর্তা নন। পুরুষ গুণাতীত, অবিষয়, চেতন, অপ্রসবধর্মী। পুরুষ চেতন বা অবিষয় হওয়ায় সাক্ষী

---

[৩] "সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যবস্থা প্রকৃতিঃ"।– *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-* ১/৬১।

বা দ্রষ্টা মাত্র।[৪] সাংখ্য দর্শনে জগত সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে প্রকৃতি ও পুরুষ নামক দ্বৈততত্ত্বের গুরুত্ব অধিক স্বীকৃতি পেয়েছে, কোথা ও ঈশ্বররূপ অতীন্দ্রিয় সত্তা স্বীকৃত হয়নি।

৪.২.৩ জগতের অভিব্যক্তি- সাংখ্যমতে জগত প্রকৃতির অভিব্যক্তি মাত্র। প্রকৃতির মধ্যে যা অব্যক্ত থাকে। প্রকৃতির সৃষ্ট কার্য প্রকৃতি আশ্রিত গুণ নির্ভর, সত্ত্ব রজঃ তমো এই তিনগুণের সাম্যবস্থা হল প্রকৃতি। সাংখ্য মতে- 'সত্ত্বরজস্তম সাংসাম্যবস্থা প্রকৃতি'[৫]। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে গুণ বলতে দ্রব্যের ধর্ম বোঝানো হয়েছে কিন্তু সাংখ্য গুণ বলতে ধর্মকে বোঝানো হয়নি। সাংখ্য দর্শনে গুণ গঠনমূলক উপাদানের বাচক।[৬] প্রকৃতি আশ্রিত তিনটি গুণ একটি অন্যটির উপর প্রভাব বিস্তার করে না। নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী সমপরিমাণে তারা প্রকৃতিতে অবস্থান করে। এই ত্রিগুণের প্রতিটির আবার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। সত্ত্বের গুণ প্রীতি অর্থাৎ সুখ উৎপন্ন করা, রজো গুণের স্বভাব অপ্রীতি বা দুঃখ উৎপন্ন করা, বিষাদ বা মোহ উৎপন্ন করা তমোগুণের স্বভাব। তিনটি গুণ মিলিত ভাবে প্রকৃতিতে আশ্রয় করে থাকে এরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ কার্য উৎপাদনের সময় একে অপরের সাহায্য প্রার্থী আবার কখনো কখনো একটি গুণ অন্য গুণকে অভিভূত করে স্বকীয় বা নিজের কার্য সম্পাদন করে। সত্ত্বগুণ সৎ বলে সকল কার্যকে প্রকাশ করে থাকে। রজের গুণ হল ক্রিয়া, রজোগুণ প্রবর্তক অর্থাৎ চালক অর্থে নিজে চল স্বভাব যুক্ত আবার অন্যকে ও চালিত করে। তমোগুণ গুরু বা ভারী স্বভাবধর্মী বলে সকল গুণকে আচ্ছাদিত করে রাখে। তমোগুণ সকল গুণকে আচ্ছাদিত করে রাখে বলে একে

---

[৪] "তস্মাদচ্চ বিপর্য্যাসাৎসিদ্ধং সাক্ষীত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ।।"– *সাংখ্যকারিকা-* ১৯

[৫] *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র–* ১/৬১।

[৬] "Gune here means a Constituent element or Component and not an attribute or quality"- Chaterjee, Satischandra, *An Introduction to Indian Philosophy,* Page- 259.

আচ্ছাদক বলা হয়। প্রকৃতি আশ্রিত তিনটি গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বৈচিত্র্য বশত এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি। মূল কারণ গুণত্রয় হলেও তাদের উৎকর্ষ অপকর্ষের নানাবিধ তারতম্য বশত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে নানাবিধ ভেদ বা ভিন্নতা দেখা যায়।[৭] অতিসুক্ষ্ম হবার জন্য গুণত্রয় প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়। তিনটি গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ফলে যে জগত বা জাগতিক বিষয়ের সৃষ্টি হয়েছে সেই জগতের বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করে কারণীভূত গুণগুলির বৈজাত্য অনুমিত হয়। সত্ত্বগুণ সুখ-উৎপাদক, লঘু ও প্রকাশক। বিষয়বস্তুতে সত্ত্বগুণ থাকার জন্য আমাদের মনে আনন্দ, প্রীতি, সন্তোষ তৃপ্তি প্রভৃতি সুখাবস্থার অনুভূতি জন্মায়। সত্ত্বগুণ লঘু বা হালকা লঘুতার জন্য অগ্নির উর্দ্ধগতি বায়ুর অবাধ সঞ্চরণ ইত্যাদি ঘটে থাকে। সত্ত্বগুণ প্রকাশক জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে সত্ত্বগুণের জন্য। রজগুণ চালক ও চঞ্চল। রজোগুণ ক্রিয়াস্বভাবরূপে সমস্ত কার্যকে চালনা করে। রজ নিজে যেমন চঞ্চল তেমনি অন্যের মধ্যে ও চঞ্চলতা উৎপন্ন করে। তমোগুণ ভারী ও আবরণকারী এদিক থেকে তমোগুণ সত্ত্বগুণের বিপরীত। তমোগুণের স্বভাব হল বাধা সঞ্চার করা। জ্ঞানের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে থাকে তমোগুণের জন্য ভ্রম, প্রমাদ, নিদ্রা, আলস্য তন্দ্রালুতা প্রভৃতি তমোগুণের জন্য দেখা যায়। কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন সুখ বা প্রসন্নতা থাকে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন থাকে তখন বিষয়বোধ বা জ্ঞানলাভ সহজে হয়। যখন মন অত্যন্ত চঞ্চল থাকে দ্রুত এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যায় তখন রজো প্রধান হয়। তমো প্রধান বা বিষণ্ণতা গ্রাস করলে জ্ঞানলাভে বিমুখ হয় বা অমনোযোগী হয়। এরা পরস্পর বিরোধী হলেও একত্রে কার্য যম্পন্ন করে থাকে।[৮] যেমন ঘরকে আলোকিত করার জন্য তেল, সলতে, আগুনের প্রয়োজন এরা

---

[৭] "প্রীত্যপ্রীতি-বিষদাত্মকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তি নিয়মার্থাঃ।
অন্যোহন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুর-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।।"- *সাংখ্যকারিকা*- ১২।

[৮] "সত্ত্বং লঘু প্রকাশক মিষ্ট মূপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরুবরণক মেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থ তো বৃত্তি।।" তদেব, ১৩।

পরস্পর বিরোধী হলেও একত্রিত ভাবে কার্য সম্পাদন করে থাকে তেমনি তিনটি গুণ ভিন্নধর্মী হলেও মিলিত ভাবে কার্য সম্পাদক করে। প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের দুই ধরণের পরিণাম দৃষ্ট হয়- সরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। সরূপ পরিণামে গুণাবলীর মধ্যে সজাতীয় পরিণাম ঘটে সত্ত্ব সত্ত্বে, রজ রজে, তম তমে পরিণত হতে থাকে। এই সজাতীয় পরিণাম জগত অভিব্যক্তির কারণ নয়, অভিব্যক্তির কারণ বিরূপ পরিণাম। পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতির মধ্যে গুণগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই সান্নিধ্যে স্বভাব চঞ্চল রজের মধ্যে প্রথমে আলোড়ন তৈরী হয়। এরপর ওই গুণবিক্ষোভ সত্ত্ব ও রজে সঞ্চারিত হয়।প্রতিটি গুণ অন্যদের অভিভূত করে প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমে সত্ত্বগুণ অপর দুই গুণকে অভিভূত করে এবং সত্ত্বের ঐ প্রাধান্য থেকে প্রথম পরিণাম মহতের অভিব্যক্তি হয়। মূলকারণ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল বুদ্ধি, বুদ্ধি জাগতিক বস্তুর প্রথম উৎস বলে একে মহৎ ও বলা হয়। মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম হল অহংকার। এই অহংকারে অহং হল 'আমি' বা 'জীবাত্মা'। এই অহংকার হতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয় এবং পঞ্চমহাভূত হতে জগতের উৎপত্তি।[৯] এমন কি জগতের লয় বা বিনাশ ও কোন ঐশী সত্তার অপেক্ষা রাখে না। প্রথমত জগতের বিনাশ বা ধ্বংস বলে কিছু নেই, আছে যার অভিব্যক্ত তার অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। জগত হল ৫-টি ভূতের সমাবেশ যা পঞ্চভুত হতে স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব নয়। এই পঞ্চভুত প্রথমে পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয় এরপর পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় লীন হয় অহংকারে, এই অহংকার মহতে এবং মহত প্রকৃতিতে অব্যক্ত হয় মাত্র। মূলাপ্রকৃতি হতে মহতাদির অভিব্যক্তিকে বলা হয় প্রতিলোম আর পঞ্চমহাভুতের তন্মাত্রাদিতে পর্যায়ক্রমে লীন হওয়াকে বলা হয় অনুলোম। এই অনুলোম প্রতিলোম

---

[৯] "প্রকৃতেমহাংস্ততোহহংকারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।।"- তদেব, ২২।

প্রক্রিয়া আপন নিয়মে ঘটে চলে সুতরাং ওই দুই প্রক্রিয়া ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন থাকে না। একারণে সাংখ্যাচার্যাদের অধিকাংশ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মান্যতা দেন নি।

৪.৩ সৃষ্টিকার্য ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষ

জগত প্রকৃতিকারণবাদী সাংখ্যের কাছে সুপ্তের ব্যক্ত অবস্থা মাত্র; যে অবস্থা প্রাপ্তিতে ঈশ্বর বা ঐরূপ কোন সচেতন কর্তার হস্তক্ষেপ অপেক্ষিত হয় না। এখানে পূর্বপক্ষী প্রশ্ন তুলতে পারেন প্রকৃতি যেহেতু জড় বা অচেতন তা থেকে অভিব্যক্তি হয় কিভাবে? বিশেষত যেকোনো কার্যের উৎপত্তিতে একটি নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন হয়। ঘটের উৎপত্তিতে কুম্ভকারের প্রয়োজন হয়। কুম্ভকারের উপস্থিতি ছাড়া যেমন ঘটের উৎপত্তি হয় না তেমনি প্রকৃতি আদিকারণ বা উপাদান কারণ হলেও কোন সচেতন কর্তার উপস্থিতি ছাড়া জগৎ রূপ কার্য হয় কিভাবে? এছাড়া আরো একটি প্রশ্ন ওঠার স্বাভাবিক যে, যেকোনো কার্য উৎপত্তির ক্ষেত্রে একটি সচেতন উদ্দেশ্য প্রয়োজন আর কোন সচেতন উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কার্য সৃষ্টি হতে পারে না তাহলে প্রকৃতি থেকে জগতের যে অভিব্যক্তি তা কি উদ্দেশ্যহীন নাকি তারমূলে কোন উদ্দেশ্য রয়েছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি তা সাংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। প্রথমেই বলা যাক প্রকৃতি থেকে জগতের অভিব্যক্তি তার মূলে রয়েছে বিরূপ পরিণাম। সাধারণভাবে প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্তি বা পরিণাম সাধিত হয়। সেই পরিবর্তন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ সত্ত্বান্তর অন্য একটি সত্ত্ব রজঃ এবং তমে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। সত্ত্ব সত্ত্বে, রজঃ রজে এবং তমঃ তমে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই রূপান্তরকরণ চললেও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে পুরুষের সান্নিধ্য ঘটে সেই মুহূর্তে পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলে প্রকৃতির মধ্যে যে গুণ ভারসাম্য তা নষ্ট হয় এবং এর ফলস্বরূপ জগতের অভিব্যক্তি হতে পারে এবং এটিই জগত সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বলে

মনে করা হয়। এক্ষেত্রে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া চেতন পুরুষের উপস্থিতি বসতই জগতের অভিব্যক্তি হতে পারে। কাজেই জগতের অভিব্যক্তিতে যদি চেতন পুরুষের উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয় সেক্ষেত্রে পুরুষকেই আমরা নিমিত্ত কারণ হিসেবে গণ্য করতে পারি বা পুরুষ প্রকৃতির সংযোগকেও আমরা জগদ উৎপত্তির নিমিত্ত কারণ হিসেবে গণ্য করতে পারি। সেক্ষেত্রে কোন অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক সত্তা অস্তিত্ব স্বীকার করা নিরর্থক বলে সাংখ্য দর্শনে মনে করা হয়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে যে প্রকৃতি অচেতন হলেও সক্রিয় আর পুরুষ চেতন হলেও নিষ্ক্রিয় তাহলে এই চেতন অচেতনের মধ্যে সম্বন্ধ কিভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় নানা রূপক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সাংখ্যে। ২১ নং কারিকায় অন্ধ ও পঙ্গু ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। পঙ্গু ব্যক্তি গমনে অক্ষম কিন্তু দর্শনে সক্ষম আবার অন্ধ ব্যক্তি দর্শনে অক্ষম কিন্তু গমনে সক্ষম। পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধব্যক্তির স্কন্ধে আরোহণ করে যদি সঠিক দিক নির্দেশ করে তাহলে দুজনের সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় তারা কার্য সম্পাদন করতে পারে। অনুরূপ ভাবে চেতন- নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং অচেতন-সক্রিয় প্রকৃতি মিলিত হয়ে কার্য সম্পাদন করে। এই কার্যের ফলে প্রকৃতির পরিণাম মহৎতত্ত্ব ইত্যাদিরূপে জগৎ সৃষ্টি হয়।[১০]

সাংখ্যকার প্রকৃতিকে সৃষ্টির আদি কারণ হিসাবে গণ্য করায় সৃষ্টিকার্যের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। প্রকৃতি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বা কার প্রয়োজন সাধনের জন্য জগৎ রূপ সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করে থাকেন? এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া কি যান্ত্রিক না কি তারমূলে কোন উদ্দেশ্য

---

[১০] "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যর্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গন্ধবদুবয়ো রপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গ।।"- তদেব, ২১।

আছে? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতি অচেতন হলেও জগতের অভিব্যক্তি নিছক এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এই প্রক্রিয়ার অন্তরালে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এবং তা হল প্রকৃতির ভোগ এবং এবং পুরুষের মুক্তি। প্রত্যেক পুরুষের মুক্তির জন্য বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্ব থেকে শুরু করে পঞ্চস্থুলভূত পর্যন্ত এই ২৩ প্রকার কার্য নিজের প্রয়োজনের ন্যায় পরের প্রয়োজনের নিমিত্তে প্রত্যেক পুরুষকে মুক্ত করবে বলে প্রকৃতি সৃষ্টি করে থাকে। নিজের প্রয়োজন ফুরালে যেমন আর কেউ কার্যে প্রবৃত্ত হয় না, তেমনি পুরুষের মুক্তিলাভ হয়ে গেলে প্রকৃতি আর সৃষ্টি করে না। যেমন পাচক বা যিনি অন্নপাক করেন, রান্না শেষ হয়ে গেলে তিনি রন্ধন কার্য থেকে বিরত হয়ে থাকেন তেমনি প্রকৃতি প্রত্যেক পুরুষের জন্য মুক্তির পথ বাতলে দিয়ে তার কার্য থেকে বিরত হন।[১১]

সাংখ্য দর্শনে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে প্রকৃতি এবং ভোক্তা হিসাবে পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি তো অচেতন তাহলে অচেতন কিভাবে স্রষ্টা হতে পারেন? তাহলে অচেতন প্রকৃতি কে চালনা করার জন্য কোন চেতন কর্তার অস্তিত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে না কি? এখানে বলা দরকার যে ঈশ্বরবাদীরা চালক হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন কিন্তু এরকম কোন চালকের অস্তিত্ব সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়নি। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে সাংখ্যাচার্যদের আপত্তি হল ঈশ্বর যদি জগতের সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে তাঁর মধ্যে কোন অভাব আছে যা পূরণের জন্য তিনি সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করেছেন। যদি কারো মধ্যে অভাব থাকে তাহলে তিনি সর্বেসর্বা হবেন কিভাবে জীবের দুঃখ মোচনের জন্য ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এমন যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ বাস্তবিক ভাবে বহু জীব দুঃখ শোকে আক্রান্ত সেক্ষেত্রে দুঃখ মোচনের জন্য

---

[১১] "ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহদাদি-বিশেষ-ভূত-পর্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভ।।"- তদেব, ৫৬।

সৃষ্টি করে তাদেরকেই দুঃখগ্রস্থ করে রাখবেন কেন? দয়াপরবশত ঈশ্বর যদি জগত সৃষ্টি করতেন তাহলে কেবল সুখী জীব সৃষ্টি করতেন বাস্তব দৃষ্টান্ত সে কথা বলে না।

তাহলে প্রকৃতি অচেতন হওয়া সত্ত্বেও স্রষ্টা হন কিভাবে? এর উত্তরে সাংখ্যকারগণ বলেন অচেতন প্রকৃতির কখনো কখনো সৃষ্টিকার্য রূপ ইচ্ছা লক্ষ্য করা যায় যেমন– বৎসের পুষ্টির নিমিত্তে যে প্রকার অচেতন দুগ্ধের ব্যাপার হয়,সেরূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রধানের ব্যাপার হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়- শাবকের পুষ্টিকার্যে যদ্রুপ অচেতন দুগ্ধ বা ক্ষীর ক্ষরিত হয়ে থাকে তদ্রুপ সৃষ্টিকার্যে পুরুষের মুক্তির নিমিত্তে অচেতন প্রধান বা প্রকৃতির প্রবৃত্তি বা সদিচ্ছা হয়ে থাকে।[১২] গাভী ঘাস, খড় খেয়ে তার বাছুরের জন্য দুধ উৎপন্ন করে এবং বাৎসল্যবশত গাভীর স্তন থেকে বাছুরের মুখে দুধ ভোগ্য হিসাবে নিঃসৃত হয় তেমনি প্রকৃতিও অচেতন হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের ভোগ্যরূপ দুগ্ধে পরিণত হয়ে মুক্তিলাভ রূপ পুষ্টি সাধন করে থাকে। তবে চেতন পুরুষের অপবর্গরূপ মুক্তি বা মোক্ষলাভের ইচ্ছা আছে বলে প্রকৃতি এই সৃষ্টিকার্য করে থাকেন এবং অভিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির জন্য কার্যসম্পাদন করে থাকেন। অভিষ্ট বস্তু লাভ হলে আর পাওয়ার ইচ্ছে থাকে না আর ইচ্ছে না থাকলে কার্য প্রবৃত্তিও থাকে না। পুরুষের মোক্ষ লাভ হল প্রকৃতির ইচ্ছা। পুরুষের মোক্ষলাভ সম্পাদিত হলে প্রকৃতি কার্য সম্পাদন বা সৃষ্টিকার্য থেকে বিরত হয়। অভিনয় মঞ্চে অভিনেতারা অভিনয়ের শেষে যেমন বিদায় গ্রহণ করে তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের ভোগ সম্পাদন করে তার কার্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে থাকে। পুরুষের মুক্তি সম্পন্ন হলে প্রকৃতি আর এই কার্যে প্রবৃত্ত হয় না।[১৩]

---

[১২] "বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য।।"- তদেব, ৫৭।

[১৩] "রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ। পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ।।- তদেব, ৫৯।

এভাবে জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও একটু প্রশ্ন থেকে যায় এই অভিব্যক্তি কি যান্ত্রিক না কি উদ্দেশ্যমূলক? এই জগদ উৎপত্তি এবং তার বিলয় এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য থাকে এক্ষেত্রে প্রকৃতি থেকে জগতের উৎপত্তির উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে বলা যায় যে সাংখ্য মতে প্রকৃতি থেকে জগতের উৎপত্তি উদ্দেশ্যহীন নয় বরং তার মূলে একটি নিহিত উদ্দেশ্য রয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে আমরা বলতে পারি অচেতন উদ্দেশ্যবাদ (unconscious teleology)। এই উদ্দেশ্য প্রকৃতির ভোগ পুরুষের মুক্তি। আবার কোথাও দেখতে পাই প্রকৃতির ভোগ প্রকৃতির মুক্তির জন্য এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জগতের অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে কোন অলৌকিক সত্তার হস্তক্ষেপের অপেক্ষা রাখে না। এই পর্যন্ত জগত সৃষ্টি বিষয়ে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে যাকে আমরা জগত বলে অভিহিত করি তা প্রকৃতির মধ্যে যা অনভিব্যক্ত ছিল তারই অভিব্যক্তি। জগতের এই অভিব্যক্তি বা সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই।

৪.৪ সাংখ্যের নীতিতত্ত্ব

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের নীতিতত্ত্বের আলোচনা যেমন ভারতীয় নীতিতত্ত্বকে অনন্য সাধারণ করে তুলেছে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের নীতিতত্ত্ব তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত হলেও তাদের নীতিতত্ত্বের আলোচনাকে হেয় প্রতিপন্ন করা সমীচীন নয়। সাংখ্যদর্শনে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যে পথের উল্লেখ করা হয়েছে তারমধ্যেই নিহিত আছে নৈতিকতার বাণী। সাংখ্যমতে জগতের প্রতিটি জীব ত্রিবিধ দুঃখে জর্জরিত এই ত্রিবিধ দুঃখ হল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। শারীরিক ও মানসিক কারণে যে দুঃখ পায় তা হলে আধ্যাত্মিক দুঃখ। ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প রূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে যে দুঃখ তা আধিদৈবিক দুঃখ। হিংস্রপশু জীবজন্তু ও দূর্বৃত্ত জনিত

কারণে যে দুঃখ তা আধিভৌতিক দুঃখ। প্রতিটি দুঃখের ফলে জীবকুল জাগতিক যন্ত্রণা ভোগ করে এবং এই দুঃখ গুলির শেষ কথা হলে অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়। কাজেই এই দুঃখের নিবৃত্তি প্রয়োজন। লৌকিক উপায়ে সাময়িক ভাবে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব যেমন প্রয়োজনানুসারে চিকিৎসকের কাছে গেলে আমাদের শারীরিক বা মানসিক দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হতে পারে। নিরাপদ ও সমীচীন স্থানে অবস্থান করলে আধিদৈবিক দুঃখ থেকে মুক্তি এবং সতর্কতা ও সাহসিকতার সাথে দিনযাপন করলে আধিভৌতিক দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যদিও লৌকিক উপায়ে এই দুঃখের চিরকালীন বিনাশ সম্ভব নয়। তাই দুঃখ থেকে নিশ্চিতরূপে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞান লাভ[১৪]।

৪.৪.১ তত্ত্বজ্ঞান-ই কৈবল্যলাভের উপায়- এই জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাংখ্যকার কোন অলৌকিক বা অতিলৌকিক সত্তার উপর বিশ্বাস করেননি বরং তারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। এই তত্ত্ব জ্ঞান চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। ২টি তত্ত্ব হল- প্রকৃতি,পুরুষ। ৩টি তত্ত্ব হল- "ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ"। ৪টি তত্ত্ব হল প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, অনুভয় (প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়)। এছাড়া রয়েছে ২৫প্রকার তত্ত্বের প্রসঙ্গ। জগত বিষয়ক এই সকল তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করলে কোন ব্যক্তির দুঃখ থেকে চিরনিবৃত্তি লাভ করতে পারে বলে মনে করা হয়। এই তত্ত্বগুলি সাংখীয় পরিভাষার অন্তর্গত হলেও এরমধ্যে কোন অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবভাস নেই। তবে এরমধ্যে ব্যক্ত বলতে বোঝায় 'জগৎ' বা প্রকাশমান তত্ত্বসমুহ বা কার্যমূলক উপাদান সামগ্রী। অব্যক্ত বলতে বোঝায় প্রকৃতি বা কার্য

[১৪] "দুখঃত্রয়াভিঘাতাজ জিজ্ঞাসা তদপঘাতক হেতৌ।
দৃষ্টে সাহপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্তহোহভাবাৎ।।"- তদেব, ১।

সমুহের কারণ। 'জ্ঞ' বলতে বোঝায় জ্ঞাতা বা পুরুষ। এখানে অব্যক্ত বা প্রকৃতিই হল সাংখ্যের মূল কারণ, ব্যক্ত হল প্রকৃতি হতে অভিব্যক্ত কার্যসমুহ এবং 'জ্ঞ' বা পুরুষ হল যিনি দ্রষ্টারূপে প্রকৃতিকে দর্শন করলেই ব্যক্ত তত্ত্বগুলির অভিব্যক্তি হতে থাকে। এই ব্যক্ততত্ত্ব বা কার্যের সংখ্যা ২৩টি, অব্যক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষ এই ২৫টি তত্ত্বের জ্ঞান গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারলে দুঃখের চিরাবসান সম্ভব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে দুঃখ মুক্তির উপায় কি তা সাধারণ মানুষকে অবহিত করাই সাংখ্য দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয় দর্শনের নীতিতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য মোক্ষলাভ যা সম্ভব হয় দুঃখের চিরাবসানের মধ্য দিয়ে। সাংখ্যশাস্ত্র মানুষকে নৈতিকতার চরমস্তরে উপনীত করার জন্যও সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে দুঃখ নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভের জন্য কোথাও ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হয়নি এই দর্শন শাস্ত্র। এতদসত্ত্বে ও নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দর্শনে নীতিতত্ত্ব কোথা কোনভাবেই অবহেলিত হয়নি।

৪.৫ বিজ্ঞানভিক্ষুর প্রসঙ্গ এবং তার সংশয় নিরসন- উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে চেতন পুরুষের সঙ্গে অচেতন প্রকৃতির সংযোগ-ই সৃষ্টির কারণ। সৃষ্টিকার্যের কর্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার অপ্রয়োজন। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর অস্বীকৃত হলেও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানভিক্ষু তার "প্রবচনভাষ্যে" সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদী নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু কোন যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তা দেখা যাক পাতঞ্জল যোগদর্শনে (সমাধিপাদ – ২৪ সূত্রে) ও বেদান্ত দর্শনে (২/৩/৪১ সূত্রে) ঈশ্বর স্বীকৃত হয়েছে অথচ সাংখ্য দর্শনে ১/৯২ সূত্রে ঈশ্বর অস্বীকার করা অয়েছে – 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। ফলে যোগ দর্শন ও বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের বিরোধ ঘটে। এই বিরোধ পরিহার করার

প্রচেষ্টা স্বরূপ বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেছেন যে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রে সাধারণ যুক্তি বা লৌকিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর যে সিদ্ধ নয় একথাই বোঝানো হয়েছে, ঈশ্বর অস্বীকৃত এমন বোঝানো হয়নি। যদি সাংখ্যের ঈশ্বর অস্বীকার করা অভিপ্রায় থাকত তাহলে সূত্রটি– 'ঈশ্বরাভাবাৎ' এরূপ হত।

বিজ্ঞানভিক্ষুর এই অভিমত কতখানি সাংখ্যসম্মত সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। 'ঈশ্বরাভাবাৎ' না বলে ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ বলায় ঈশ্বর নিষিদ্ধ হয় না বিজ্ঞানভিক্ষুর এই যুক্তি সমীচীন নয়। দার্শনিক পরিভাষায় 'অসিদ্ধ' শব্দের দ্বারা 'অভাব' সূচিত হয়। সাংখ্যদর্শনে কোথাও বৈশেষিক সম্মত পরমাণুর অভাব বা অসিদ্ধ বর্ণিত হয়নি তার অর্থ কি একথা বোঝায় যে সাংখ্য দর্শনে পরমাণুবাদ স্বীকৃত হয়েছে? দর্শন শাস্ত্রের রীতিই হল বিভিন্ন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করা। বহু যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষবাদের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে কোন লক্ষণ বা যুক্তি তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় নয় বলেই বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মত গ্রহণযোগ্য নয় তার আরো কারণ এই যে তার যুক্তির মধ্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। প্রমাণসিদ্ধ না হলে ও যদি অস্তিত্ব স্বীকার্য হয় তাহলে 'আকাশকুসুম' –এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। প্রমাণসিদ্ধ না হওয়া এবং বস্তুর অভাবে স্বীকৃত হওয়া একই কথা। তাই সাংখ্যকারের ঈশ্বরাসিদ্ধে সূত্রের যথার্য তাৎপর্য হল ঈশ্বরের অসিদ্ধি ও অভাব।

বিজ্ঞানভিক্ষু মনে করেন প্রকৃতির পরিণাম যদি জগত হয় তাহলে পরিণামের আরম্ভক হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কোন নির্দিষ্ট বিশেষ কারণ বা কর্তা না থাকলে প্রলয় কালে প্রকৃতির পরিণাম ঘটতে পারে না। এই নির্দিষ্ট বিশেষ কারণ হলেন ঈশ্বর। কাজেই

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বরবাদী নয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর চিন্তা ধারাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যায় যে তিনি ভক্তিবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বিজ্ঞান ভিক্ষু ভগবান শ্রীহরিকে স্মরণ করেছেন এভাবে–

"চিদচিদ গ্রন্থিভেদেন মোচয়িষ্যে চিতোপি চ

সাংখ্যভাষ্য মিষেনাস্মাৎ প্রীয়তাং মোক্ষদা হরি"।

কাজেই এটা সহজে অনুমেয় যে বিজ্ঞানভিক্ষু হরি বা বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। সাধকের ভক্তিপ্রবণ হৃদয় তার ইষ্টকে ঈশ্বর হিসাবে চিন্তা করেন। বিজ্ঞানভিক্ষুও তাঁর আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুকে ঈশ্বর হিসাবে প্রতিপন্ন করে তাকেই জগৎ স্রষ্টা হিসাবে গণ্য করবেন এটাই স্বাভাবিক। ভক্তের বিশ্বাস এটাই যে ঈশ্বরের প্রেরণা ছাড়া জগৎ সংসারে কোন কার্য সম্পাদিত হতে পারে না। তাই আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যশাস্ত্রকে নিরীশ্বরবাদী রূপে গ্রহণ করতে পারেননি।[১৫] কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকার আলোচনা থেকে এবং সাংখ্যদর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ের ৫/২–৫/১২ নং শ্লোক বিচার করে দেখা যায় যে সাংখ্য দর্শনে কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়নি। সাংখ্য দর্শন প্রকৃত পক্ষে নিরীশ্বরবাদী দর্শন।[১৬]

বিজ্ঞানভিক্ষু মূলত দুটি কারণে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন বলে মনে করা হয়– প্রথম কারণ হল নিরীশ্বরবাদ যেহেতু শাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে তাই সাংখ্যশাস্ত্র একটি শ্রেষ্টতর শাস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র নিরীশ্বরবাদীর কারণে তার শ্রেষ্টত্বের ক্ষুন্ন হওয়াকে বিজ্ঞানভিক্ষু সমর্থন করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত কোন নির্দিষ্ট কারণ না থাকলে প্রলয়কালে সদৃশ পরিণামাত্মিকা প্রকৃতি

---

[১৫] চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ, *সমগ্র সাংখ্যসমীক্ষা*, পৃ. ১০২।

[১৬] পুরকায়স্থ, বিজনবিহারী, *ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ*, পৃ. ১১৪।

বিসদৃশ পরিণাম আরম্ভ করতে পারে না। এইজন্য বিজ্ঞানভিক্ষু ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বিসদৃশ পরিণামের আরম্ভক বলে মনে করেছেন। ঈশ্বর বিষয়ক বিজ্ঞানভিক্ষুর আরো অভিমত এই যে- ঈশ্বর যদি প্রমাণসিদ্ধ না হয় তাহলে বহু মনীষী এবং অসংখ্য শাস্ত্রকারেরা এই ঈশ্বর সাধনে লিপ্ত হয় কেন? এর উত্তরে বলা যায় ঈশ্বরত্ব উপাসনার ফলে লব্ধ একটি পরম অবস্থা বিশেষ নিত্য ঈশ্বর বলে কিছু নেই।[১৭] যে সমস্ত যোগীদের অন্যান্য বিষয়ে তীব্র বৈরাগ্য থাকলেও যাঁরা প্রকৃতিকে সারবস্তু জ্ঞানে উপাসনা করেন তাঁদের দেহপাতের পর প্রকৃতিতেই তাদের লয় হয় এই প্রকৃতিলীন যোগীরা প্রকৃত মুক্ত নন কেননা তাদের আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়ায় তারা বদ্ধই থেকে যান। কিন্তু চিরকাল প্রকৃতিলীন অবস্থায় থাকলেও তাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় যদিও ওই জন্ম তাদের শেষজন্ম, এটি পুরাণ সম্মত বক্তব্য এবং প্রকৃতিলীন যোগীর প্রসঙ্গ পাতঞ্জল দর্শনে সমাধিপাদের ১৯ নং সূত্রেও বলা হয়েছে যেটি আত্মা নয় তাকে আত্মা বলে উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করে বলে বিদেহ অর্থাৎ দেবগণ ও প্রকৃতিলীন ব্যক্তি গণের সমাধি অবিদ্যামূলক।[১৮]

বিজ্ঞানভিক্ষু তার প্রবচনভাষ্যে বলেছেন– প্রকৃতিলীন যোগী যেন জলমগ্ন ব্যক্তির পুনরুত্থান। এ ধরণের আর্বিভূত পুরুষ বৈরাগ্য পরিশুদ্ধ নির্মলচিত্ত বিষয়বাসনাহীন হওয়ায় তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক গুণের চরম উৎকর্ষ ঘটে এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলা চলে।[১৯] সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষু নিজেই স্বীকার করেছেন যে ঈশ্বর নামে পরিচিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ পূর্ব জন্মার্জিত সুকৃতির ফলেই ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। এরূপ প্রকৃতিলীন পুরুষকেই সর্ববিৎ সর্বকর্তা ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন শ্রুতিতে উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়া সাংখ্যসূত্রের ৩/৫৬ তে বলা হয়েছে "স হি সর্বাবিৎ

---

[১৭] *সাংখ্যসূত্র-* ৩/৫৭।

[১৮] "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ প্রকৃতিলয়ানাম।"- *যোগসূত্র-* ১৯।

[১৯] *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-* ৩/৫৭।

সর্বকর্তা"– এর অর্থ হল– পূর্বকল্পে প্রকৃতিলীন পুরুষ পরে আর্বিভূত হয়ে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। তাহলে ঈশ্বর বিষয়ে প্রাচীন সাংখ্যমতের সঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষুর ঈশ্বর বিষয়ক মতে বিরোধিতা লক্ষ্যণীয় কিন্তু সাংখ্য সুত্রের ১/৯৪ এবং ১/৯৫ সূত্রে দেখানো হয়েছে যে– "উভয়থাপ্যসৎকরত্বম- সা: প্র: সূ: ৯৪", "মুক্তাত্মনাং প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা- সা: প্র: সূ: ৯৫" অর্থাৎ জন্য ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ হলেও নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রমাণ সিদ্ধ নয়। যথার্থ ঈশ্বর স্বীকৃতি বলতে ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকৃতিই বোঝায়। তাই সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত এই অভিমত গ্রহণযোগ্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর স্বীকার না করলে মুক্তি প্রসঙ্গে ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা আছে কি না ? মুক্তি বা কৈবল্য লাভের জন্য প্রাচীন সাংখ্যকারগণ ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। সাংখ্যমতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ এবং সাংখ্যশাস্ত্র অনুশীলনের ফলে বৈরাগ্যের উদয় হলে [যোগোক্ত তৎ তৎ ক্রিয়ানুযায়ী যোগাভ্যাস করে] প্রকৃতিও পুরুষের মধ্য যে ভেদ তার বোধ জন্মায়, এরূপ ভেদজ্ঞানের ফলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় এবং ভোগাসক্ত দেহাবসানের পর পুনরায় আর জন্ম হয়না, কারণ ভোগজন্য সংস্কার পুনর্জন্মের কারণ। অবিদ্য বিনষ্ট হলে ভোগজন্য সংস্কার দগ্ধবীজের মত কার্যোৎপাদক শক্তিশূন্য হয়ে যায়। মৃত্যুর পর ভোগজনক সংস্কার না থাকায় শরীরের যাবতীয় মৌলিক উপাদান প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে যায়। তাই শরীরারম্ভক কোন প্রকার হেতু না থাকায় পুনরায় জন্ম হয় না তখন পুরুষ চিরদিনের মত মুক্ত হয়ে যায়।[২০] সাংখ্য বর্ণিত মোক্ষ বা কৈবল্যলাভের উপায়ের মধ্যে কোথাও ঈশ্বরের

---

[২০] "এবং তত্ত্বাস্যাদান্নাহস্মি ন মে নাহস্মিতাপরিশেষং।
অবিপর্য্যয়া দ্বিশুদ্ধং কেবল মুৎপদ্যতে জ্ঞানম।।"- *সাংখ্যকারিকা*- ৬৪।

প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখিত হয়নি। সেক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী বলতে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। অবিবেকবশত পুরুষ প্রকৃতি যোগ হয়। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অবিবিক্ত স্থিতিই সংসারের কারণ। মুক্ত পুরুষে অবিবেক থাকে না বলে পুনরায় প্রকৃতি সংযোগ হয় না[২১]। একমাত্র বিবেকের উদয়ে অবিবেকের উচ্ছেদ হয়। প্রকৃতি সবকিছুর মূল কাজেই প্রকৃতির অবিবেক বশত সমস্ত অবিবেকের উৎপত্তি। অতএব প্রকৃতি ব্যাতীত অন্যান্য পদার্থ সমূহের অবিবেক বা বিবেকে কিছু যায় আসেনা। যতদিন পর্যন্ত পুরুষের প্রকৃত বিবেক না হয় ততদিন মুক্তির কোন আশা নেই। কারণ মূল অবিবেক স্পষ্ট না হলে শাখাভুত অবিবেক নষ্ট হবে না[২২]।

কেবলমাত্র শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা অবিবেক দূর হতে পারে না। সাক্ষাৎকার-ই অবিবেক উচ্ছেদের উপায়। দিগ্ সর্ম্পকে সম্যক অবহিত না হওয়া অবধি দিগ্ ভ্রান্তের যেমন দিগভ্রম দূর হয় না তেমনি বিবেকের সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত অবিবেকের উচ্ছেদ হয় না[২৩]। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক সাক্ষাত করেই মুক্তির উপায় কিন্তু প্রশ্ন হল প্রকৃতি যে আছে তার প্রমাণ কি? তার উত্তরে সাংখ্যকার বলেন যে– ধূম দেখে যেমন আমরা বহ্নির অনুমান করি তেমনি ত্রিগুণাত্মক জগৎরূপ কার্য দেখে অনুমান প্রমাণের দ্বারা জগত কারণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

এখন প্রশ্ন হল ভারতীয় ঐতিহ্যে নৈতিকতার সাথে ঈশ্বরের ধারণা ওতপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত তাহলে সাংখ্য দর্শনে ঈশ্বর অস্বীকৃত হলে নৈতিকতার পাঠ কিভাবে সম্ভব ? নাস্তিক দর্শন মাত্রই যে নিরীশ্বরবাদী হবে এটা প্রত্যাশিত, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এমন অনেক আস্তিক দর্শন রয়েছে যেগুলি নিরীশ্বরবাদী। ঈশ্বরে আস্থা স্থাপন না করে আস্তিক্যবাদী ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখে

---

[২১] "তদযোগোহপ্যবিবেকাৎ ন সমানত্বম।"- *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র-* ৫৫।

[২২] "প্রধানাবিবেকাদন্যবিবেকস্য তদ্ধানে হানম।"- তদেব, ৫৭।

[২৩] "যুক্তিতোহপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢবদ পরোক্ষাদৃতে।"- তদেব, ৫৯।

নৈতিকতার কিরূপ বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করে তা বিচার্য। ভারতীয় ঐতিহ্যে বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করলেও জগতের স্রষ্টা,রক্ষক, সংহারক রূপে ঈশ্বরের ভূমিকাকে স্বীকার করেন না যে সব ভারতীয় সম্প্রদায় তাদের মধ্যে সাংখ্য ভাবনা এখানে আলোচিত হয়েছে।

সাংখ্যা দর্শন নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলে পরিচিত হলেও সাংখ্যকার আচার্য বিজ্ঞান ভিক্ষু ঈশ্বর বিষয়ে প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থরচনায় শুরুতেই মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরপরায়ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী তাই তাঁর দর্শন ভাবনায় তার-ই অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত হয়েছে,কিন্তু ঈশ্বর বাদীরা যে অর্থে ঈশ্বর কে স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানভিক্ষু কোথাও ঈশ্বরকে সেভাবে প্রতিষ্ঠা করেননি বলে মনে করা হয়।

৪.৬ সেশ্বর সাংখ্য ও ঈশ্বরের ধারণার বিকল্প ব্যাখ্যা

সাংখ্যের সমানতন্ত্র হিসাবে পরিচিত যোগ দর্শন। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব প্রকৃতি কারণবাদ অভিব্যক্তিবাদ সকল কিছুই যোগ দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে, অতিরিক্ত হিসাবে কেবল একটি তত্ত্ব যোগে মান্যতা পেয়েছে তাহল ঈশ্বর। সাংখ্যের সঙ্গে যোগের এই প্রায় সর্বথাসাদৃশ্যের কারণে এই শাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলে অভিহিত করা হয়। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব পাতঞ্জল দর্শনে মান্যতা পেলেও বিচার করলে ধরা পড়বে জগতসৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ঈশ্বরের কোন অবদান নেই। প্রকৃতি হতে জগতের অভিব্যক্তি এবং প্রকৃতিতে জগতের অন্তর্ভাগ কোনোটি ঈশ্বর নিমিত্ত নয়। এমনকি দুঃখমুক্তি তথা কৈবল্যের হেতু যে ব্যক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞান সে বিষয়ে সাংখ্যের সঙ্গে যোগের বিশেষ কোনো মতপার্থক্য নেই। প্রশ্ন উঠবে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও মোক্ষমার্গে

যদি ঈশ্বরের কোন অবদান না থাকে তাহলে ষড়বিংশতি তত্ত্ব হিসাবে ঈশ্বরের স্বীকৃতি কি নিষ্প্রয়োজন? এই প্রশ্নের উত্তর একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণের অপেক্ষায় রাখে।

মনে রাখতে হবে যোগ দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো জীবের সমাধি লাভ- "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"- যোগ হলো চিত্তবৃত্তির নিরোধ। মন বুদ্ধি অহংকার এই তিন একত্রে চিত্ত নাম পেয়েছে সাংখ্যাদি শাস্ত্রে এই চিত্তের বিষয়াকার প্রাপ্তি হল চিত্তবৃত্তি যা প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্যয়, নিদ্রা, স্মৃতিভেদে পঞ্চবিধ যে ভূমিতে উপনীত হয়ে চিত্ত পঞ্চবিধ বৃত্তি হতে অত্যন্ত মুক্ত হয় সেই বৃত্তি নিরোধের ভূমিকে বলা হয় নিরুদ্ধ। ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মুঢ় চিত্তকে একাগ্র ভূমিতে উচ্চারণ ঘটিয়ে নিরুদ্ধ ভূমিতে উপনীত হতে হয় এই ভূমি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভূমি। (অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় দ্রষ্টার স্বকীয় নির্লিপ্ত রূপে অবস্থান হয়, আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হয় না)। এই নিরুদ্ধ ভূমিতে কিভাবে উপনীত হওয়া যাবে তা আলোচিত হয়েছে যোগ দর্শনের সমাধিপাদে। সেখানে বলা হয়েছে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত বৃত্তির নীরোধ হয়[২৪]। স্থিতির উদ্দ্যেশে অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তি তিরোহিত হয়ে স্বাত্তিকবৃত্তিতে স্থিত হওয়ার লক্ষ্যে যত্নবান হওয়াই অভ্যাস। অভ্যাস হলো এমন উপায় যা অবলম্বন করলে চিত্তের রাজসতামসবৃত্তি তিরোহিত হয়ে কেবল সাত্ত্বিক বৃত্তি উৎপন্ন হয়। যম নিয়মরূপ যোগাঙ্গের প্রযত্নকে অভ্যাস বলা হয়[২৫]। অপরপক্ষে ঐহিক এবং পারত্রিক সমস্ত সুখ এবং সুখের উপায় উপস্থিত হলেও তাতে আসক্ত না হওয়া বা অননুরক্ত থাকাকে বলা হয় বৈরাগ্য[২৬]। বৈরাগ্য দুই প্রকার পর বৈরাগ্য ও অপর বৈরাগ্য। অপর বৈরাগ্য হলো অলৌকিক বা লৌকিক সুখকর বিষয় উপস্থিত হলে তার

---

[২৪] "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিবিরোধঃ।"- *যোগসূত্র-* ১২

[২৫] "তত্রস্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ।"- তদেব, ১৩

[২৬] "দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম।"- তদেব, ১৫।

প্রতি অননুরক্ত থেকে সেই বিষয়ে দোষের বা তার লাভের মধ্যে দুঃখরূপতা চিন্তা করা এবং সেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করাকে অপর বৈরাগ্য বলে। অন্যদিকে পরও বৈরাগ্য হল চিত্তের নির্মলতার শেষ সীমা এই পর বৈরাগ্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাতকারী যোগীগণের বিভিন্ন জ্ঞান বা উপলব্ধি হয় যেমন- কৈবল্যলাভ হয়েছে, পঞ্চক্লেশ ক্ষীণ হয়েছে, অবিচ্ছিন্ন সংসার প্রবাহ ছিন্ন হয়েছে, এরূপ। পর বৈরাগ্য অভ্যাস দ্বারা নির্বিষয় হলে চিত্তবৃত্তি যে নিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা হল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। জ্ঞানের চরম উন্নতির স্তর হল পর বৈরাগ্য। যাকে আমরা মুক্তি বা কৈবল্য বলে অভিহিত করি তা পরবৈরাগ্যের অবস্থান। পরবৈরাগ্য হল জীবন্মুক্তির নামান্তর। যদিও বৈরাগ্য শব্দ দ্বারা রাগের অভাব বোঝায় কিন্তু পতঞ্জলির মতে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ নয় অধিকরণস্বরূপ, তাই বৈরাগ্যকে জ্ঞানপ্রসাদ বলা হয়েছে। জ্ঞানের প্রসাদ অর্থাৎ রজ ও তম গুণের সম্পূর্ণ তিরোধান। বহুকাল যাবদ যোগাভ্যাস করলে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হয় তখন একটি অনির্বচনীয় ভাব উপস্থিত হয় একে জীবন্মুক্তি বলে। জীবন্মুক্তি উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

যোগ দর্শনে মুক্তির আলোচনায় দুটি প্রশ্নের অবতারণা লক্ষণীয় প্রথমত কৈবল্য প্রাপ্তিতে ঈশ্বরের ভূমিকা অনিবার্য নাকি ঈশ্বর নিরপেক্ষ মুক্তি সম্ভব বলে যোগ দর্শনে মনে করা হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের স্বরূপ প্রসঙ্গে যেমন- সর্বজ্ঞ, অসীম, অনন্ত সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতি অতীন্দ্রিয় সত্তার আধার রূপে কল্পনা করা হয়েছে যোগ দর্শনে ও কি ঈশ্বর বলতে সেরূপ সত্তাকে স্বীকার করা হয়?

এখন প্রশ্ন হল যোগ শাস্ত্রীয় এই কৈবল্য লাভের পথে ঈশ্বরের ভূমিকা ঠিক কতখানি? অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যে পথ এ পর্যন্ত উপদিষ্ট হয়েছে তারমধ্যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ অনুপস্থিত অর্থাৎ

শাস্ত্রীয় পথে ও অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সমাধিলাভ হতে পারে; সেখানে ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। যদিও সমাধি পাদের ২৩ নং সূত্রে "ঈশ্বরপ্রণিধাণাৎ বা" এমন কথা পতঞ্জলী বলেছেন। তা সত্ত্বে ও আমাদের মনে রাখতে হবে যে "বা" শব্দটি এখানে বিকল্প পথের বাচক। একই পথে পরিক্রমা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। যে দূর্গম পথে অভিযাত্রী দল সহজে ভ্রমণ করেন সাধারণের কাছে সে পথ দূর্গম হতে পারে, তাই বিকল্প পথের নির্দেশ থাকে। সেই হিসাবে পতঞ্জলী ঈশ্বর প্রণিধানকে এই বিকল্প পথ হিসাবে দেখিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পাতঞ্জল দর্শনে নববিধ যোগীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। শ্রদ্ধাদি উপায় বিশিষ্ট যে সকল যোগী তাদের প্রধানত তিন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রকার মৃদু উপায় দ্বিতীয় প্রকার মধ্য উপায় ও তৃতীয় প্রকার অধিমাত্র উপায়ের অনুগামী। মৃদুত্ব, মধ্যত্ব ও তীব্রত্ব বিভাগ ভেদে প্রতিটি শ্রেণির আবার ত্রিবিধ রূপ হতে পারে। এইভাবে সর্বসাকুল্যে যোগীর প্রকার নয়টি। জগতের সকল পদার্থের যেমন উত্তম মধ্যম অধম এরূপ বিভাজন হয় তেমনি শ্রদ্ধাদি বৈরাগ্যের উত্তমাদি ভেদে সমাধিরও রকমফের হয়। তবে সমাধির এই প্রকারের কোথায় শুরু কোথায় শেষ তা সুনির্দিষ্ট করা কঠিন। সমাধির তারতম্য দর্শন করে উপায়ের ভেদ কল্পনা করতে হয়। মৃদু তীব্র বৈরাগ্য বিশিষ্ট যোগীর সমাধিলাভ ও সমাধিফল আসন্ন হয়।[২৭] মৃদু তীব্র বৈরাগ্য বিশিষ্ট যোগীর আসন্নতর এবং অধিমাত্র সংবেগ বিশিষ্ট যোগীর আসন্নতম হয়।[২৮] 'এদের মধ্য অধিমাত্র উপায়ের বা তীব্র বৈরাগ্যের পথে অনুগামী যারা তাদের সমাধিলাভ ও সমাধিফল অচিরেই হয়ে থাকে।

---

[২৭] "তীব্রসংবেগানামাসন্ন" তদেব, ২১।

[২৮] "মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষ"- তদেব, ২২।

সমাধির পথে অগ্রসর এই যোগীদের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে তাদের সমাধিলাভ তথা কৈবল্য আসন্ন। যার মধ্যে বৈরাগ্য তীব্র তিনি অচিরেই সমাধি লাভ করেন। বৈরাগ্যের এই তীব্রতায় উপনীত যোগীর ক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রণিধান যে নিষ্প্রয়োজন তা যোগসূত্র ও ভাষ্যের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। বৈরাগ্যের মৃদু বা মধ্যস্তরে উত্তরণ ঘটেছে যে যোগীর তাদের ক্ষেত্রে সমাধিলাভ আসন্ন বলেও ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন। সুতরাং বৈরাগ্যর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা ও যে কৈবল্যের পথে সাফল্য লাভ করার করবে তা আশা করা যায়। ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারের পথে চিত্তকে একাগ্র করার প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে ঘটে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলার নেই। পরিবর্তে বৈরাগ্য ও অভ্যাসের পথ ছাড়া সমাধি লাভের বিকল্প কোন পথ রয়েছে কিনা সে কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বর প্রণিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যা লক্ষ্য করলে মনে হয় জ্ঞান কর্মের পথে মুক্তি লাভের পাশাপাশি ভক্তির পথ ও মুমুক্ষকে চরিতার্থ করার কথা যেমন বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায় উন্মুক্ত রেখেছে সেভাবে সর্বকর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণের দ্বারা চিত্তকে স্থির ও একাগ্র করে যে সমাধি লাভ করা যায় সংসারী জীবকে যেন সে কথা বলতে চেয়েছেন যোগাচার্যরা। সন্ন্যাসীর পথ ও গৃহীর পথ যে এক নয় সেই সারসত্যটি টি অপরাপর দর্শনের মত সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনেও স্বীকৃত। সংসারী জীবের মুক্তি লাভের বিকল্প পথ হিসাবে ঈশ্বর প্রণিধান কে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। আর যদি তাই হয় তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রণিধান সমাধি লাভের পথে অপরিহার্য এমন কথা বলা চলে না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ে স্মরণে রাখা দরকার যে, ঈশ্বরের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে সমাধিলাভ কে ত্বরান্বিত করার উপদেশ যোগসূত্র ও ভাষ্যে করা হয়েছে। সেই ঈশ্বর কিন্তু সৃষ্টি

স্থিতি লয়ের কর্তা, ভগবান নন; তিনি পুরুষ বিশেষ। তবে কিনা সাধারণ পুরুষ হতে তার বৈলক্ষণ্য রয়েছে। সাধারণ পুরুষ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশে ক্লিষ্ট; কিন্তু যোগের ঈশ্বর এমন এক পুরুষ যিনি অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ হতে অত্যন্ত মুক্ত। এই পুরুষ যেহেতু ক্লেশমুক্ত তাই কর্মে প্রবৃত্তি ও তার নেই ফলত কর্মফল ও তার ভোগ তার হয় না। ক্লেশ কর্ম বিপাক দ্বারা অপরামিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট এই পুরুষ ঈশ্বরবাদীদের ঈশ্বর হতে ভিন্ন। কোন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে যেমন সর্বজ্ঞ হিসাবে তথাগত কে ঈশ্বর বলা হয়েছে তেমনি পতঞ্জলি ক্লেশাদি মুক্ত পুরুষকেও ঈশ্বর বলেও স্বীকার করেছেন। যোগ দর্শনে ঈশ্বরের ভূমিকা অনেকখানি কান্টীয় ঈশ্বরের ধারণার অনুরূপ নৈতিকতার পূর্ব স্বীকার্য (Postulate) হিসেবে কান্ট তিনটি বিষয়ের কথা বলেছেন এক- ইচ্ছার স্বাধীনতা, দুই-আত্মার অমরতা, তিন- ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। অনেকখানি একইভাবে ঈশ্বরের ধারণাটি লালিত হয়েছে যোগ দর্শনে। যাকে পূর্ব স্বীকার্য হিসেবে মেনে নিয়ে অষ্টাঙ্গ যোগের কঠিন পথে অগ্রসর হতে পারে জীব।

মনে হতে পারে এই ব্যাখ্যার দ্বারা মুক্তিলাভ বা কৈবল্য যে ঈশ্বরের ধারণা নিরপেক্ষ এই আলোচনা দ্বারা কেবল সে কথা প্রতিষ্ঠিত হয়,ঈশ্বর যে নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ নয় তা প্রমাণিত হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় ভারতীয় ঐতিহ্যে নৈতিক জীবনের অনুশীলন আসলে মোক্ষ লাভের পথে প্রতিসঙ্গী- 'আত্মানাং মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ'- ঋকবেদের এই অমোঘ ঘোষণা অনুসৃত হয়েছে ভারতীয় পরম্পরায়। আত্ম মুক্তির অপরপৃষ্ঠে রয়েছে জগতের হিত আর জগতের হিতার্থে যে কর্ম সম্পন্ন হয় তাই আসলে নৈতিক কর্ম। গান্ধীর মতে অহিংস পথ ছাড়া যেমন সত্য বা ঈশ্বর লাভ হয় না তেমনি জগতের হিত ছাড়া আত্ম মুক্তি হয় না। সুতরাং ঈশ্বরের

ধারণাকে পূর্বাঙ্গ হিসাবে গ্রহণ না করে যদি কৈবল্য লাভ সম্ভব হয় তাহলে ঈশ্বরের ধারণা নিরপেক্ষভাবে নৈতিক জীবন যাপন অসম্ভব নয়।

পূর্বমীমাংসায় নিরীশ্বরবাদী নৈতিকতা

৫.১ সূচনা- সাংখ্যের ন্যায় মীমাংসা দর্শনও নিরীশ্বরবাদী একটি দর্শন। উভয় দর্শনই আস্তিক বা বেদের প্রামাণ্যে আস্থাশীল। তবে সাংখ্যের তুলনায় মীমাংসার একটি স্বাতন্ত্র্য হল মীমাংসা বেদভিত্তিক একটি দর্শন। সাংখ্য বেদপ্রামাণ্যে আস্থাশীল হলেও মীমাংসা বেদান্তের ন্যায় বেদাশ্রিত এবং বেদ সর্বস্ব। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের উপরে যেখানে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা সেখানে মীমাংসার বিকাশ বেদের কর্মকাণ্ডকে ভিত্তি করে। এ আসলে কর্মমীমাংসা কোন কর্ম কর্তব্য কোনটি অকর্তব্য- কোনটি বিধি কোনটি বা নিষেধ তারই পাঠ দেয় এই দর্শন। স্বাভাবিকভাবে ধর্ম ও নীতির পরম পরাকাষ্ঠা এই দর্শন। নীতিপ্রধান এই দর্শনে কিভাবে নৈতিকতার নিরীশ্বরবাদী ব্যাখ্যা উপনস্থ হয়েছে তারই সন্ধান আলোচ্য অধ্যায়ে গুরুত্ব পাবে।

৫.২ মীমাংসা দর্শনে নিরীশ্বরবাদ

মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্টাতা মহর্ষি জৈমিনি, এবং মীমাংসা সূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনার অপেক্ষা বেদবিষয়ক আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শবরস্বামীর পরবর্তী দুই টীকাকার প্রভাকর ও কুমারিলভট্ট ছিলেন ভারতীয় দর্শনের তীক্ষ্ণধীতম দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। প্রভাকর ঈশ্বর বিষয়ে কিছুটা নিরুত্তর থাকলে ও কুমারিলভট্ট এব্যাপারে বিশেষভাবে সরব ছিলেন। তিনি শবরভাষ্যের উপর তিনটি খন্ডে টীকা রচনা করেছেন সেগুলি হল- শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক ও টুপ্‌টীকা। এর মধ্যে শ্লোকবার্তিকের "সম্বন্ধাক্ষেপপরিহারপ্রকরণে" তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খন্ডন করেছেন তিনি।

কুমারিলভট্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে কিভাবে যুক্তিপ্রদান করেছিলেন সেগুলি আলোচনা করা যাক।

৫.২.১ কুমারিলের ঈশ্বর অস্বীকৃতি- কুমারিলভট্ট ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন-**প্রথমত**, ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্বে কোথায় থাকেন? পৃথিবী প্রভৃতি ভূত ও ভৌতিক কোন কিছুই মহাসৃষ্টির পূর্বে থাকে না, তাই তার আধার সম্ভব নয়। সৃষ্টির পূর্বে কোন পদার্থ থাকে না বলে স্রষ্টা ঈশ্বরের জ্ঞাতা কেউ থাকবে না, যিনি ঈশ্বর বিষয়ে অন্যকাউকে উপদেশ দেবে।[১] **দ্বিতীয়ত,** সৃষ্টির পূর্বে কোন সাধনই থাকে না, তাই জগতের সৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রথম প্রবৃত্তি সম্ভব নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতের উৎপত্তি– একথা যথার্থ নয় কারণ অশরীর ঈশ্বর শরীর সৃষ্টিতে ইচ্ছুক হতে যাবেন কেন?[২] **তৃতীয়ত,** ঈশ্বর সকলের হিতকামী হলে নানাবিধ দুঃখময় এই জগতের সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছায় একথা বলা সমীচীন হবে না।[৩] **চতুর্থত,** দয়াবশত ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করেছেন একথা বলা সমীচীন নয়। দুঃখ দেখলে করুণা জন্মায় কিন্তু মুক্ত জীব অশরীর ঈশ্বরে কোন দুঃখ থাকে না কাজেই দয়াবশত, করুণাবশত তিনি জগত সৃষ্টি করেছেন একথা সত্য হতে পারে না।[৪] **পঞ্চমত-** জগতের সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ছাড়া কোন বুদ্ধিহীন লোক ও কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় না। তাই জগতের সৃষ্টিতে

---

[১] "জ্ঞাতা চ কস্তদা তস্য যো জনান্ বোধয়িষ্যতি উপলব্ধের্বিনা চৈতৎ কথমধ্যবসীয়তম্।" *শ্লোকবার্তিক-* ৫/১৬/৪৬।

[২] "প্রবৃত্তির কথমাদ্যা চ জগতঃ সম্প্রতীয়তে।
শরীরাদের্বিনা চাস্য কথসিচ্ছপি সর্জনে।।"– তদেব, ২০/৪৭।

[৩] "পৃথিব্যাদাবনুপ্তন্নে কিম্ময়ং তপ্তনর্ভবেৎ।
প্রাণিনাং প্রায়দুঃখা চ সিসৃক্ষাস্য ন সুজ্যতে।।"- তদেব, ২০/৪৯।

[৪] "অভাবাচ্চানুকম্প্যানাং নানুকম্পাস্য জায়তে।
সৃজেচ্চ শুভমেবৈকমনুকম্পানাং প্রমোজিতঃ।।"- তদেব, ২০/৫২।

ঈশ্বরের কোন স্বার্থ না থাকার জন্য তিনি সেই কাজে প্রবৃত্ত হতে পারেন না।[৫] **ষষ্ঠত,** এই জগতের সৃষ্টিকে ঈশ্বরের ক্রীড়া বা লীলা বলা যায় না। কেননা ক্রীড়ার ফলে মানুষের মধ্যে সুখ বা আনন্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঈশ্বর নিত্য সুখী হওয়ায় তাঁর আর নতুন করে সুখলাভ সম্ভব নয়। এই লীলার ফলে তাঁর নতুন করে সুখ উৎপন্ন হয় একথা বললে ঈশ্বরকে আর নিরতিশয় সুখী ও ঐশ্বর্যের অধিকারী একথা বলা যাবে না। এভাবে ঈশ্বর যেমন সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না তেমনি তিনি সংহারকর্তা ও হতে পারেন না।[৬]

কুমারিল ভট্টকে অনুসরণ করে অন্যান্য আচার্যগণ ও ঈশ্বর স্বীকারের বিরুদ্ধে নানা রকম যুক্তি দেখিয়েছেন। ন্যায় বৈশেষিক আচার্যরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য নানাবিধ ঈশ্বরানুমান দেখিয়েছেন, এরমধ্যে "কার্যত্বহেতুক" ঈশ্বরানুমানটি অতীব প্রসিদ্ধ। নৈয়ায়িকগণ বলেন যে ঘট পট প্রভৃতি যাবতীয় প্রসিদ্ধ বস্তু যেমন চেতনাধিষ্ঠিত হয়ে উৎপন্ন হয় তেমনি পৃথিবী পর্বতাদি চেতনাধিষ্ঠিত হয়ে উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে যাবতীয় কর্ম ক্রমসন্নিবিষ্ট হয় বলে ঘটাদির উৎপত্তির মত দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি ও চেতনাধিষ্ঠিত হবে। এই চেতন সর্বজ্ঞ ব্যক্তি হলেন ঈশ্বর।[৭]

নৈয়ায়িকদের অভিপ্রায় হল চেতন কর্তার দ্বারা একই সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে একথা প্রতিষ্টা করা, কিন্তু নৈয়ায়িকদের এই অভিপ্রায়ের সিদ্ধি সম্ভব নয় বলে

---

[৫] "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে।
একমেব প্রবৃত্তিশ্চেচ্চৈতন্যেনাস্য কিং ভবেৎ।।"- তদেব, ২০/৫৫।

[৬] "ক্রীড়ার্থায়াং প্রবৃত্তৌ চ বিহন্যেত কৃতার্থতা।
বহুব্যাপারার তায়াং চ ক্লেশো বহুতরো ভবেৎ।।"- তদেব, ২৩/৫৬।

[৭] "সন্ধিবেশবিশিষ্টানামূৎপত্তিং যো গৃহাদিবৎ।
সাধয়ে চ্চেতনাধিষ্টাং দেহানাং তস্য চোত্তরম্।।"- তদেব, ২০/৭৪।

শ্লোকবার্তিককার মনে করেন। তার দাবি- "ভূধরদেবদুর্বাঙ্কুরাদয়ঃ সর্বে পদার্থাঃ চেতনাধিষ্টানোৎপত্তয়ঃ সাবয়তত্বাৎ গৃহঘটাদিবৎ"– এই অনুমানের সাধ্য ঘটক অধিষ্টাতৃত্বকে যদি "কিঞ্চিদ্ধেতুকত্ব" স্বরূপ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ যে কোন হেতু হতে উৎপত্তি স্বীকার করা হয় তবে উক্ত অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ হবে। কর্মের দ্বারা সব কিছুর উৎপত্তি একথা মীমাংসাদর্শনে স্বীকার করা হয়েছে অতএব তা সিদ্ধের সাধন হয়ে থাকে এখানে বলা দরকার যে সিদ্ধ বস্তুকে পুনরায় সাধন করা বা জ্ঞাত বস্তুকে পুনরায় জ্ঞাপন করা হলে তা দোষের বলে বিবেচিত হয়।[৮]

কুমারিলকৃত ঈশ্বরের খন্ডন প্রসঙ্গে নারায়ণ পন্ডিত বলেছেন যে, সেশ্বরবাদী ন্যায়-বৈশেষিকগণ বেদবাক্যকে ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ বলতে পারেন না। কেননা তারা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্য রূপেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।[৯] ঈশ্বরের প্রামাণ্য যদি বেদের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর করে তাহলে তা অন্যোন্যাশ্রয় ও চক্রক দোষ দুষ্ট হবে। বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হলে ঈশ্বরের প্রামাণ্য, আবার ঈশ্বরের প্রামাণ্যসিদ্ধ হলে পর বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। সেশ্বরবাদী ঈশ্বর সাধক যে "ক্ষিত্যাঙ্কুরাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্যত্বাৎ ঘটবৎ"–এইরূপ কার্যত্ব হেতুক অনুমান দিয়ে থাকেন সেটি ব্যাপ্যতাসিদ্ধ দোষে দুষ্ট। উপাধিবিশিষ্ট হেতুকে ব্যাপ্যতাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে। সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধনের অব্যাপক ধর্মকে উপাধি বলে। যেমন এখানে 'ধূমবহ্নিমান'- অনুমিতির ক্ষেত্রে আদ্রের্দ্ধন সংযোগ হল একটি উপাধি কারণ তা সাধ্যধূমের ব্যাপক কিন্তু বহ্নির অব্যাপক। এইভাবে আলোচ্যস্থলে 'তাদৃশসন্নিবেশবিশেষবত্ত্ব' রূপ উপাধি

---

[৮] "কস্যচিদ্ধেতুমাত্রত্বং যদ্যধিষ্টাতৃতেষ্যতে।
কর্মভিঃ সর্বজীবানাং তৎসিদ্ধের সিদ্ধসাধনম্।।"- তদেব, ২০/৭৫

[৯] "তদ্ববচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম"- বৈশেষিক সূত্র ১/১/৩।

আছে। এইরূপ ধর্মটি যেখানে থাকে সেটি অবশ্যই জন্যবস্তু হবে। ফলে এই ধর্মটি হেতু কার্যত্বের ব্যাপ্য। গুণাদি অনেক জন্যবস্তু আছে যাতে এরূপ সন্নিবেশ থাকেনা। আবার এই ধর্মটি সাধ্য সকর্তৃকত্বের ব্যাপক। কেননা যে সকল বস্তুর কর্তা আছে তাতে ঐরূপ বিশেষ অবয়ব সন্নিবেশ অবশ্যই থাকবে। সুতরাং তাদৃশ সন্নিবেশ বিশেষবত্ব এখানে উপাধি, তাই উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় কার্যত্ব হেতুটি ব্যাপত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাসে দুষ্ট। ফলে সেশ্বরবাদীরা এই কার্যত্ব হেতুর দ্বারা সকর্তৃকত্ত্ব অনুমান করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন না। নারায়ণ পন্ডিত ঈশ্বর স্বীকার সাধক প্রমাণের অভাব দেখিয়ে ঈশ্বরে বাধক প্রমাণও দেখিয়েছেন। নারায়ণ পন্ডিত বলেন যে ক্ষিত্যাঙ্কুরাদি কার্য দ্রব্যের কোন কর্তা নেই, কেননা তারা কোন শরীরীর দ্বারা জন্য নয়। তার্কিকগণ ঈশ্বরকে শরীরিরূপে স্বীকার করেন না। তাঁরাই আবার বেদকে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বচন স্বরূপ বলেন। সুতরাং সেশ্বরবাদীদের কথার মধ্যে বিরোধ দেখা যায়।[১০]

৫.২.২ ঈশ্বরবাদ খন্ডনে পার্থসারথি- নব্যভাট্ট পার্থসারথি মিশ্র কুমারিল ভট্টকে অনুসরণ করে শাস্ত্রদীপিকাতে ঈশ্বর বিষয়ে ন্যায় বৈশেষিকদের মতকে খন্ডন করেছেন। বৈশেষিকমতে ঈশ্বরের সিসৃক্ষা বা সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলে নিশ্চল পরমাণুতে স্পন্দন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং অদৃষ্টের বৈচিত্র্য অনুযায়ী পরমাণুসমুহ জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে নানা প্রকার অবয়বের সৃষ্টি হয়। এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে শাস্ত্রদীপিকাতে পার্থসারতি মিশ্র বলেছেন– সৃষ্টিতে অশরীর ঈশ্বরের ইচ্ছার মত প্রযত্ন ও প্রয়োজন। প্রযত্ন ছাড়া কোন কার্য হয় না। ইচ্ছা ও প্রযত্ন উভয়-ই শরীর সাপেক্ষ হয়ে থাকে ঈশ্বরের শরীর না থাকায় তাঁর ইচ্ছা ও প্রযত্ন

[১০] সাহা, বিশ্বরূপ, *মীমাংসাপরিচয়,* পৃ. ৪৩৮।

কোনটিই সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কোন ইন্দ্রিয় না থাকায় কোন অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রযত্ন অনিত্যত্বের ব্যাপ্য হওয়ায় ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছা প্রযত্নকে নিত্য বলা সমীচীন নয়।[১১]

পার্থসারথি মিশ্র শাস্ত্রদীপিকাতে আরো বলেছেন যে– হিতকামী ঈশ্বরের দুঃখ সঙ্কুল এই জগত সৃষ্টি করার ইচ্ছেই বা কেন হবে? অগত্যা সেশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের নিত্য শরীর স্বীকার করলে প্রলয়কালেও ঈশ্বরের শরীর সাবয়বত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় তা পৃথিব্যাদির কার্যত্বকেও উপপাদন করতে পারে না। সেশ্বরবাদীরা ঈশ্বরের প্রযত্নকে নিত্য ও এক বলেছেন। সেই কারণে ঈশ্বরের নিত্য একটি প্রযত্ন বিচিত্র কার্যের কারণ হতে পারে না। অনন্ত কার্যের অনুকুল অনন্ত প্রযত্ন ঈশ্বরে স্বীকার করলে সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই বিঘ্নিত হবে। কেননা পরমাণু সমুহের বিশ্লেষরূপ প্রযত্ন প্রলয়ের কারণ এবং এই প্রযত্ন নিত্য হলে সৃষ্টিকালেও থাকবে। অনুরূপভাবে পরমাণুসমুহের সংশ্লেষরূপ প্রযত্ন সৃষ্টির কারণ, এবং এই প্রযত্ন নিত্য হলে প্রলয়কালেও থাকবে। এরফলে জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি কোনটিই সম্ভব হবে না।[১২] এছাড়াও শ্লোকবার্তিকের উপর টীকা ন্যায়রত্নাকর, পার্থসারথি মিশ্র খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন- এই জগৎ সর্বদা এরূপ-ই আছে, কোন (বুদ্ধিমান) চেতন পুরুষ এই জগত সৃষ্টি করেননি।[১৩]

---

[১১] কথম শরীরঃ প্রযতেত? ন চাশরীরসেচ্ছাপি সম্ভবতি মুক্তানামিব। নাপি জ্ঞানং সম্ভবতি, ইন্দ্রিয়াদের ভাবাৎ...নিত্যমস্য জ্ঞানং নিত্যাচেচ্ছা নিত্যশ্চ প্রযত্ন ইতি চেৎ? ন সর্বজ্ঞানেচ্ছা প্রযত্নানাম নিত্যত্ব ব্যাপ্তেঃ"- পার্থসারথি মিশ্র, *শাস্ত্রদীপিকা*, পৃ. ৩২৯।

[১২] "ন নিত্য প্রযত্ন নিত্যেচ্ছানিত্য জ্ঞানকাকর্তৃকং কার্যত্বাদ ঘটবৎ...যদি ত্বনন্ত কার্যানুরূপা অনন্তা এব প্রযত্নাঃ সর্বদৈবেশ্বরেহবতি ষ্টেরন্ তথা সতি প্রলয়কারণী ভূতস্য পরমানুবিশ্লে ষকস্য প্রযত্নস্য সর্বকালেহকস্থানাৎ সংযোওকস্য চ স্রবহেতোঃ প্রলয় কালেহপ্যবস্থানাৎ উভয়োঃ পরস্পরবিঘাতান্ন সৃষ্টিঃ স্যান্ন প্রলয়ঃ।"- তদেব।

[১৩] "তস্মাদীদৃশমেবেদং সর্বদা জগৎ, ন তু কেনচিৎ বুদ্ধিপুর্বকারিণা নির্মিতম্।"- *শ্লোকবার্তিক*– ২০/৪৯।

৫.২.৩ ঈশ্বর নিরাকরণে প্রভাকর- প্রভাকর মিশ্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয়ে নিশ্চুপ থাকলে ও পরবর্তী কালে শালিকনাথ মিশ্র ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খন্ডন করেছেন। শালিকনাথ মিশ্রের প্রকরণপঞ্চিকা গ্রন্থটি প্রভাকরমতের একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রকরণপঞ্চিকা গ্রন্থে শালিকনাথ মিশ্র কেবল শব্দার্থ সম্বন্ধের স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন এমন নয় জগৎ স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে নানা প্রকার যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তারমধ্যে প্রধান যুক্তি হল– "ক্ষিত্যাঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্বাৎ ঘটবৎ"। অর্থাৎ জগত স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের সত্তা অবশ্যই স্বীকার্য, কারণ ক্ষিতি, অপ, প্রভৃতি সংহত বস্তুই কার্যাত্মক কেননা এগুলি অবয়ব দ্বারা গঠিত এবং কার্য বলেই এগুলির কারণ থাকতে বাধ্য এবং সেই কারণ অবশ্যই কোন না কোন সর্বশক্তিমান বুদ্ধিমান কর্তা। পরমাণুপুঞ্জ থেকে সুসামঞ্জস্য ও নির্দিষ্ট আকারে ক্ষিতি অপ প্রভৃতি জটিল বস্তুগুলো কোন বুদ্ধিমান কর্তার নিয়ন্ত্রণব্যাতীত উৎপন্ন হতে পারে না, এই বুদ্ধিমান কর্তা অর্থে জগতের নিমিত্তকারণ হিসাবে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনুমেয়।

এর উত্তরে প্রভাকর বলেন– জাগতিক সকল বস্তু অবয়ব দ্বারা গঠিত হওয়ায় এগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে কিন্তু সেই নিরিখে সামগ্রিক ভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় নিছক কল্পনামাত্র এবং জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসাবে ঈশ্বরের কল্পনাও অবান্তর। প্রাকৃতিক বস্তু সকলের ব্যাখ্যায় একথা বলা যায় যে, প্রাকৃতিক কারণে সেগুলির জন্ম মৃত্যু ঘটে যেমন মানুষ বা জীব জন্তুর দেহ তাদের পিতা-মাতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং কালের নিয়মে সেগুলির বিনাশও ঘটে, এধরণের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতীত ও ভবিষ্যতের বস্তু বা

বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতএব জাগতিক বস্তুর স্রষ্টা হিসাবে কোন অতি প্রাকৃত নিয়ন্ত্রণ কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার অবান্তর।

'বৃহতী' ও 'লঘ্বী' টীকায় প্রাভাকর মিশ্র ঈশ্বর বিষয়ে নীরব থাকলে তাঁর অনুগামী শালিকাচার্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব খন্ডন করেছেন। শালিকাচার্যের মূল বক্তব্য হল যে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রযত্ন প্রভৃতি প্রমাণ বা সত্যতা প্রতিষ্টা করতে গেলে তাঁর শরীর, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। কেননা আত্মাতে জ্ঞানাদি শরীরাবচ্ছেদেই উৎপন্ন হয়। তাঁর মতে চেতন ঈশ্বর অচেতন ধর্ম ও অধর্মের অধিষ্টাতা হতে পারেন না, কেননা ধর্ম ও অধর্ম জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। (ন্যায়মতসিদ্ধ কার্যত্বহেতুক ঈশ্বরসাধ্যক অনুমানটি সামান্যত দৃষ্ট অনুমান) শালিকনাথ প্রকরণ পঞ্চিকাতে শব্দার্থ সম্বন্ধ এবং বেদবাক্যের প্রবর্তনে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করে ঈশ্বরের নিরাকরণ করেছেন। ঈশ্বরের সাধক সাম্যন্যতঃ প্রদর্শিত অনুমান অপেক্ষা আপন কর্মের প্রতিপাদক যা অপূর্ব বলে পরিচিত তা অধিক গ্রহণীয় বলে প্রতিপাদন করেছেন। ন্যায়মত সিদ্ধ কার্যত্বহেতুক ঈশ্বর সাধক অনুমানটি সামান্যত দৃষ্ট অনুমান এবং শালিকনাথের সম্মত অনুমানটি বিশেষানুমান। বিশেষ অনুমানের দ্বারা সামান্য অনুমান বাধিত হয়। সুতরাং কার্যত্বহেতুক দ্বারা প্রতিপাদিত সকর্তৃকত্বের সামান্যত দৃষ্ট অনুমানটি শালিকনাথ সম্মত বিশেষ অনুমানের দ্বারা বাধিত হওয়ায় ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব এই অনুমানের দ্বারা কখনো সিদ্ধ হবে না– এটি শালিকনাথ মিশ্রের বক্তব্য।[১৪]

---

[১৪] সাহা, বিশ্বরূপ, *মীমাংসাপরিচয়,* পৃ. ৪৩৯।

৫.২.৪ শব্দের নিত্যতা দ্বারা বেদের নিত্যতা প্রতিষ্ঠা- মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর খন্ডন প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখ যোগ্য উপায় হল শব্দের নিত্যতা প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা প্রতিষ্টা। বেদ যদি নিত্য হয় তাহলে তার রচয়িতা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের আর কোন আবশ্যিকতা থাকে না। মীমাংসা মতে বেদ অপৌরুষেয়, শব্দ নিত্য সুতরাং শব্দময় বেদ ও নিত্য। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রধানত শব্দ নিত্যতাবাদের উপর প্রতিষ্টিত। আচার্য জৈমিনি শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বহুবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন তার মধ্যে প্রধান যুক্তি হল– কণ্ঠ তালুর অভিঘাত থেকে উৎপন্ন বলে শব্দ অনিত্য। কিন্তু অভিঘাতের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে শব্দ ধ্বণিত হয় তাকে উৎপত্তি না বলে অভিব্যক্ত বলাই শ্রেয়। শব্দ যদি উৎপন্ন হত তাহলে তা অনিত্য বলতে হত কিন্তু মীমাংসা মতে শব্দ উৎপন্ন হয় না অভিব্যক্ত হয় তাহলে তা নিত্য। প্রশ্ন হতে পারে শব্দ যদি নিত্য হত তাহলে অভিব্যক্তির পর তার অস্তিত্ব থাকতো বা শোনা যেত কিন্তু উচ্চারণের পরেই শব্দ শোনা যায় না, শব্দ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই শব্দকে নিত্য বলা যায় কিভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক দার্শনিক বলেন যে শব্দ চাক্ষুস ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুতরাং বক্তার মুখ থেকে শব্দের উচ্চারণ হবার পর শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে ক্ষণকাল থেকে তা আবার তিরোহিত হয়। এই শব্দ তিরোহিত হয় বলে আপাত ভাবে মনে হলেও শব্দ আসলে কিছুক্ষণের জন্য অভিব্যক্ত হয়ে পুনরায় আবরকের দ্বারা আবৃত হয়। যেমন গভীর অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকালে মাঠের মধ্যে ঘাস দেখতে পাই আবার বিদ্যুৎ অপসারিত হলে ঘাসগুলো আবার অন্ধকারে ঢেকে যায় কিন্তু ঘাস একেবারে তিরোহিত হয় না। বায়ুর সঙ্গে কণ্ঠ তালুর ইত্যাদির সংযোগ ও বিভাগ জন্য যে ধ্বনির উৎপত্তি হয় তা-ই শব্দের

অভিব্যক্তির কারণ। এই ধ্বনিই বর্ণময় শব্দকে অভিব্যক্ত করে। সুতরাং ধ্বনি বিনষ্ট হলে বর্ণময় শব্দের অভিব্যক্তি থাকে না। মীমাংসা মতে ধ্বনি ও বর্ণময় শব্দ এক নয়। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থকেই ধ্বনি বলা হয় তা বর্ণময় নয়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত জন্য অ-কারাদি ক্রম অভিব্যক্ত শব্দই বর্ণময় শব্দ, সর্বত্র বিদ্যমান হলেও ধ্বনিব্যতীত তার অভিব্যক্তি হয় না[১৫]।

কণ্ঠ তালু প্রভৃতির সঙ্গে বায়বীয় অভিঘাতের ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাই শব্দ গ্রাহক শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে উপনীত হয়ে বর্ণময় শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয় অভিঘাত জনিত ধ্বনির পার্থক্য অনুসারে অভিব্যক্ত বর্ণের পার্থক্য হয়। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের পক্ষে ও উচ্চারণের ক্ষণকাল পরে শব্দের নিত্যত্ব সত্ত্বেও অনুপলব্ধি সম্ভব। তাই শব্দের উৎপত্তি বা বিনাশ যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায় শব্দকে নিত্য বলতে হয়।

৫.৩ মীমাংসা দর্শনে নৈতিকতা- মীমাংসা দর্শনে ব্যক্তির নৈতিক জীবন চর্চার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকার করা হয় না। মীমাংসকগণ বিশ্বাস করতেন যে যথাযথ ধর্মপথ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যক্তি নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। তাই মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্রই হল "অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা" এখানে ধর্ম জিজ্ঞাসা বলতে ধর্মকে জানার ইচ্ছা। মীমাংসা মতে 'ধর্ম' হল বেদবিহিত কর্ম। এই ধর্ম ব্যক্তির পরবর্তী জীবনের কল্যাণ বা স্বর্গাদিরূপ সুখের নির্ধারক। যদিও এক্ষেত্রে স্বর্গ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। নারায়ণতীর্থ মুনি 'ভাট্টভাষাপ্রকাশ' গ্রন্থে 'স্বর্গ' পদের অর্থ করেছেন-

"যন্ন দুঃখেন অসম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্

অভি লাষোপনীতং চ তৎ সুখং স্বঃপদাসপদম।।"

[১৫] *মীমাংসা সূত্র-* ১/১/১২-১/১/২৩।

দুঃখের লেশমাত্র নেই, উৎপত্তির পরক্ষণে নষ্ট হয় না এবং ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয় এমন সুখকে স্বর্গ বলে।[১৬] স্বর্গলাভ পুরুষের অভিপ্রেত বলে তার প্রাপ্তির জন্য যাগ, দান, হোম প্রভৃতি ক্রিয়ার কথা শ্রুতিতে এবং মীমাংসা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কেননা এদের দ্বারাই পুরুষের প্রেয় ও শ্রেয় লাভ হয়। বৈশেষিক সূত্রে প্রেয় ও শ্রেয়-র প্রাপ্তি সাধনকে ধর্ম বলা হয়েছে। যার দ্বারা জাগতিক সুখ ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয় তাই ধর্ম।[১৭]

মহর্ষি জৈমিনি কোন কর্মে নিযুক্ত করার জন্য কোন ব্যক্তির প্রতি প্রবর্তনা বা নিবর্তন মূলক বিধিবাক্য কে ধর্ম বলেছেন।[১৮] যা ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি কল্যাণকর এমন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং যা ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য অকল্যাণকর এমন কর্ম হতে নিবৃত্ত থাকা বিধিসম্মত। কোন কর্মের প্রতি প্রবর্তনা যেমন বিধিপরক একই রকম ভাবে কোন অকল্যাণকর কর্ম হতে নিবৃত্ত হওয়া বা নিষিদ্ধ কার্য না করার জন্যে পুরুষকে প্রেরণা দেওয়া ও বিধিসম্মত। কুমারিল ভট্ট ধর্মের লক্ষণ দিয়েছেন– যে কর্মফল অনর্থজনক হয় না কেবলমাত্র প্রীতি বা সুখজনক তাই ধর্ম।[১৯]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বেদবিহিত কর্মের দ্বারা ধর্মপালন এবং ধর্ম পালনের মাধ্যমে স্বর্গলাভ এর একটি স্বতন্ত্র নৈতিক মূল্য আছে। ধর্মপালনের মাধ্যমে যে স্বর্গলাভের কথা বলা হয়েছে সেই স্বর্গলাভের জন্য যাগ, হোম ও দানের প্রসঙ্গ আছে। এই যাগ, হোম ও দানের

---

[১৬] সাহা, বিশ্বরূপ, *মীমাংসাপরিচয়,* পৃ. ১৪।

[১৭] "যতোহভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধঃ স ধর্মঃ।"- *বৈশেষিক সূত্র-* ১/১/২।

[১৮] "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ।"- *মীমাংসা সূত্র-* ১/১/২।

[১৯] "ফলতোহপি চ যৎ কর্ম নানর্থেনানু বর্দ্ধতে।
কেবলং প্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম ইতি কথ্যতে।।"- *শ্লোকবার্তিক* ২/২৬৮

মধ্যে কিছু সুক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এই তিনটির মাধ্যমে কারো উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ বোঝালেও তাদের মধ্যেও অর্থগত পার্থক্য রয়েছে।

৫.৩.১ নৈতিক জীবনাচারে যাগ, হোম, দানের প্রসঙ্গ- যাগ বলতে বোঝায় যজ ধাতু থেকে বাচ্য যাহা। দ্রব্য, দেবতা এবং ত্যাগাত্মক কর্ম এই তিনটির মিলিত রূপকে বোঝায়। অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে বিধিবিহিত দ্রব্যত্যাগকে যাগ বলে। 'যজ' ধাতুর অর্থের সহিত আসেচন কর্মকে যোগ করলে যে অর্থ দাঁড়ায় তাই 'হু' ধাতুর অর্থ। অগ্নিতে ঘৃতাদি দ্রব্যের আহুতি বা প্রক্ষেপণ কে আসেচন বলে। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ করা হলে সেই দ্রব্যকে যথাবিধি অগ্নিতে প্রক্ষেপণ করাকে হোম বলে। দান এসেছে 'দা' ধাতু থেকে– যার অর্থ নিজের স্বত্ব ত্যাগপূর্বক পরের স্বত্বের আপাদন। বস্তুবিশেষে নিজের যে স্বামিত্বরূপ সম্বন্ধ আছে তাই পরিত্যাগ করে সেই বস্তুর সঙ্গে যার স্বামিত্ব সম্বন্ধ নেই তেমন ব্যক্তির স্বামিত্ব সম্বন্ধ উৎপাদনের অনুকুল ক্রিয়াই দা ধাতুর অর্থ। সহজ কথায় নিজের অধিকারের বস্তু অন্যকে সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করাই দান।[২০]

মীমাংসক ভাষ্যকার শবরস্বামী মীমাংসা সূত্রের ভাষ্যসূত্র ব্যাখ্যার পাশাপাশি বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পাদন প্রসঙ্গে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করেছেন যা মীমাংসা দর্শনের নীতিবিদ্যার দর্পণ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। ধর্মাচারণের প্রধান অবলম্বন যাগ- হোম–দান। এই যজ্ঞাদি সম্পাদন প্রকৃতপক্ষে কোন নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজাপার্বণ নয়, কোন দেবতাকে সন্তুষ্ট করা ও নয়। যাগযজ্ঞের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল আত্মসন্তুষ্টি বা ঋত্বিকের জীবাত্মার নৈতিক উন্নতি সাধন। যজ্ঞ হল যাজন দ্রব্যর উৎসর্গ বা ত্যাগ। যাগ একধরণের সৃষ্টি সংঙ্কল্পকে

[২০] ভট্টাচার্য, সুখময়, *পূর্বমীমাংসা দর্শন*, পৃ. ১০২।

বোঝায় যা যজ্ঞ কর্মের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যা ত্যাগরূপে বর্ণিত হয়। যার মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি তার যা কিছু নিজের রয়েছে তা পরিত্যাগ করে।[২১] কাজেই বোঝাই যাচ্ছে যে যাগ-ই প্রধান কর্তব্য। কেননা যাগ মানুষ তথা মনুষ্য সমাজের কল্যাণকামী। দেবতা এবং অপরাপর দ্রব্য যাগের উপকরণমাত্র, এদের ভূমিকা গৌণ।

৫.৪ ঈশ্বর নন অপূর্ব-ই কর্মফলদাতা

আস্তিক দর্শনের প্রায় সকল সম্প্রদায় নীতি নৈতিকতার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, সংহারক, কর্মফলদাতা, জগদমঙ্গলময় ঈশ্বরের অবতারণাকে প্রাসঙ্গিক সত্যরূপে স্বীকার করেছেন। কিন্তু আস্তিক দর্শন হয়েও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বরের অপরিহার্যতার পরিবর্তে ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তার কথাই ঘোষিত হয়েছে। তাহলে মীমাংসা দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক যে ঈশ্বর স্বীকার না করলে কর্মের ফলদাতা কে হবেন? যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল কর্তা তো সঙ্গে সঙ্গে লাভ করেন না বিশেষত স্বর্গাদি ফল ইহজন্মেও ভোগ করা যায় না তাহলে কর্মফল সংক্রান্ত এই সমস্যার সমাধান কি? যাগ একটি ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান, উৎপত্তির পরক্ষণে ক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু যাগ সমাপ্তির অব্যবহিত পরমুহূর্তে যাগক্রিয়ার ফলপাওয়া যায় না। যজমান দীর্ঘকাল পরে (এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুর পরে) স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হন। অতএব স্বর্গাদি ফলের কারণরূপে যাগাদিকে গ্রহণ কিরূপে সম্ভব? কারণ কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকা চাই, অতএব যাগাদি অনুষ্ঠান হতে স্বর্গরূপ ফল যাতে উৎপন্ন হয় এরূপ

[২১] "The Term yaga strictly stand for a creation resolve which is the Prelude to the Performance of a Sacrifice and is explained as tyage or the spirit of renunciation involved in giving away what belong to oneself"- Parthasarathi Mishra, Sastra Dipika, P-25-26

বিষয়ের কল্পনা করতে হয়। তাই অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা যাগক্রিয়া ও স্বর্গ লাভরূপ ফলের মধ্যবর্তী একটি বিষয়ের কল্পনা করা হয় তাকেই অপূর্ব, অদৃষ্ট প্রভৃতি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই অপূর্ব হল কর্মফলদাতা। মীমাংসকদের বিরুদ্ধে আপত্তি হতে পারে যে অপূর্বনামক পৃথক পদার্থ যদি স্বীকার করতেই হয় তাহলে অপূর্বকে স্বর্গাদি ফলের সাধন বা হেতু বলা উচিত। সেটা করলে যাগের স্বর্গসাধনতা অপ্রমাণিত হয়ে যাবে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে মীমাংসকদের উত্তর হল যাগই স্বর্গের সাধন। অপূর্ব হল যাগ ও কর্মফল লাভের মধ্যবর্তী ব্যাপার। ব্যাপারের লক্ষণ হল– "তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্য জনকত্বং ব্যাপারত্বম্"। অপূর্ব যাগ হতে উৎপন্ন হয় এবং যাগজাত স্বর্গলাভের জনক। অতএব অপূর্বকে ব্যাপার বলা যায়।

অপূর্বের স্বরূপ কি? যদি বলা হয় যে যাগের বিনাশ হলে যাগ ও যাগজন্য স্বর্গাদি ফলের মধ্যবর্তী অপূর্বের বিনাশ হবে যেহেতু অপূর্ব হল ব্যাপার তাহলে বলা যায় যে যাগাদিক্রিয়া ও স্বর্গফল লাভের মাঝে অপূর্ব নামক শক্তিবিশেষ স্বীকার করলেও স্বর্গফলের সাধনরূপে যাগকে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। এই শক্তি অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কল্পিত হয় বলে অপূর্ব ও অর্থাপত্তি প্রমাণ সিদ্ধ। যাগ হতে উৎপন্ন শক্তিবিশেষের নাম হল অপূর্ব। যাগ ও স্বর্গলাভের মাঝখানে অপূর্বকে শক্তিবিশেষ রূপে স্বীকার করলেও স্বর্গরূপ ফলের সাধন হিসাবে যাগকে গ্রহণ করার কোন বাধা থাকে না। আর শক্তি অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা কল্পিত হয় বলে অপূর্ব ও অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অগ্নির দ্বারা জল উত্তপ্ত হলে অগ্নি নিভে যাওয়ার বহুক্ষণ পরে তার দাহক শক্তির প্রমাণ সেই জলে থাকে। সেইরূপ

যাগাদি ক্রিয়া বিনষ্ট হলেও অপূর্ব নামক যাগজন্য শক্তি যাগকর্তার আত্মাকে আশ্রয় করে বলে অব্যবহিত পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে।[২২]

কুমারিল ভট্ট অপূর্বের স্বরূপ উৎঘাটন করে লক্ষণে বলেছেন যে, সকল অঙ্গকর্মের অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রধান কর্মফলদানে অসমর্থ (অযোগ্য) এবং অনুষ্ঠাতা পুরুষ ও স্বর্গাদি ফললাভের অযোগ্য থাকে পরে উভয়ের মধ্যে যে যোগ্যতা অর্জিত হয় তাকে অপূর্ব বলে।[২৩]

৫.৪.১ প্রভাকরসম্মত নিয়োগ অপূর্বের নামান্তর- প্রাভাকর বা গুরুমতে অপূর্ব কি সেটা দেখা যাক। যদিও প্রাভাকর মতে অপূর্ব কি সে সমন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা শালিকনাথ মিশ্রের প্রকরণপঞ্জিকা গ্রন্থ হতে জানতে পারি। প্রভাকর অপূর্ব স্বীকার করলেও তিনি তা 'নিয়োগ' এই শব্দ দ্বারা তাকে অভিহিত করেছেন। নিয়োগ বলতে বুঝিয়েছেন যেটি জানলে 'আমি এখানে নিযুক্ত" পুরুষ বা কর্তার মধ্যে এরূপ বোধ জাগ্রত হয় সেরূপ অর্থকে নিয়োগ বলে প্রভাকর স্বীকার করেছেন। যেমন "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" এই শ্রুতি হতে 'আমি এতে নিযুক্ত' পুরুষের এরূপ জ্ঞান হয় তারপর সে যাগে আধিকারী বলে মনে করেন। এটাই হচ্ছে নিযোজ্য পুরুষ ও যাগের প্রথম সমন্ধ পুরুষকে যাগে নিয়োজিত করা হয় বলে একে নিয়োগ আখ্যা দেওয়া হয়। এই নিয়োগ হল কালান্তরভাবী ফলের জনক। ক্রিয়া যেহেতু স্থায়ী নয় তাহলে তা ফলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। ফল হল কালান্তরভাবী ঘটনা।

---

[২২] ফলায় বিহিতং কর্ম ক্ষণিকং চিরভাবিণে।
তৎসিদ্ধির্নান্যথেত্যেবমপূর্বং প্রতিগম্যতে।।
যদি স্বসমবেতৈব শক্তিরিষ্যতে কর্মণাম্।
তদ্বিনাশে ততো ন স্যাৎ কর্তৃস্থা তু ন নশ্যতি।।" - *তন্ত্রবার্তিক*- ২/১/৫।

[২৩] "কর্মভ্যঃ প্রাগযোগস্য কর্মণঃ পুরুষস্য বা।
যোগ্যতা শাস্ত্রগম্য যা পরা সাপূর্বমিষ্যতে।।" - তদেব ২/১/৮।

মীমাংসা মতে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। ঈশ্বরবাদী আস্তিক দর্শন বিশেষত ন্যায় ও যোগ ঈশ্বরকে বেদের কর্তারূপে গণ্য করেছেন কিন্তু মীমাংসা মতে বেদ কোন পুরুষ দ্বারা রচিত নয়। বেদ গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে সুতরাং বেদকর্তারূপে ঈশ্বরকে তারা স্বীকার করেন না। বেদবিহিত কর্মপালন এবং তেমন কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মীমাংসকদের মূল লক্ষ্য। বেদের অসীম জ্ঞানভান্ডার এবং বৈদিক ক্রিয়াকান্ড মানব জাতির নীতি নৈতিকতার শ্রীবৃদ্ধি করতে সক্ষম তা তাদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

উপসংহার

যে জিজ্ঞাসাটিকে সামনে রেখে এই গবেষণা কর্মটির সূত্রপাত ঘটেছিল তা হল নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরবিশ্বাস বা কোন অতিলৌকিকে বিশ্বাস অপরিহার্য পূর্বাঙ্গ হতে পারে কি না? অন্যভাবে প্রশ্ন তোলা যায়, স্বাধীন বিচার বুদ্ধির আলোকে একজন মানুষ নৈতিক জীবনের অনুগামী হতে পারে কি না? এই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে ভারতীয় দর্শনে যে সকল নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সম্প্রদায় গুলির নীতিদর্শনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ওই দর্শন সম্প্রদায়গুলির প্রতিটি কোন না কোন ভাবে নৈতিক আদর্শে আস্থাশীল।

প্রথমেই প্রত্যক্ষবাদী জড়বাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের নীতিচিন্তা আলোচিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে চার্বাক যে নীতিদর্শনে বিশ্বাসী তা একান্তভাবে জড়বাদী, আত্মবাদী, ভোগবাদী। কাম চরিতার্থ করে সুখলাভকে নিশ্চিত করার কথা বলে এই দর্শন। এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়ত লোকায়ত নৈতিক ভাবনার সঙ্গে অনেকখানি মানানসই; তবে আত্মসুখ সর্বস্ব স্থূলভোগের যে জীবনপথ চার্বাকাচার্যরা নির্দেশ করেন তাকে নৈতিক জীবন হিসেবে মেনে নিতে অধিকাংশ ভারতীয় সম্প্রদায় রাজি নন। তাছাড়া ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাসী না হলেও কোন না কোন ভাবে আধ্যাত্মিক উত্তরণের পথ উন্মুক্ত রেখেছে অপরাপর দর্শনগুলি; যা চার্বাকীয় নীতিচিন্তা অনুমোদন করে না। রাজাকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে রাজশাসন মেনে চলার মধ্যেই চার্বাকের নৈতিক আচরণ সীমাবদ্ধ। কাজেই আমার কী করা উচিত বা আমি কী করব এজাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একজন চার্বাক অনুগামী দেশীয় শাসনব্যবস্থা কি অনুমোদন করে এবং সেই ব্যবস্থায় তার

সুখপ্রাপ্তি কতখানি নিশ্চিত হবে সে কথাই বিবেচনায় রাখবেন। অর্থাৎ দেশীয় আইন নিরপেক্ষ নৈতিকতা বলে সেখানে কোন কিছু পড়ে থাকে কি না তা বলা মুশকিল।

নাস্তিক্যবাদী হিসাবে চার্বাকের সঙ্গে একই পঙক্তিতে অবস্থান জৈন ও বৌদ্ধের। তবে এই দুই সম্প্রদায়ের নীতিচিন্তা জড়বাদী ভাবনা থেকে লক্ষ্যণীয় ভাবে আলাদা। মহাবীর ও বুদ্ধের অনুগামীদের দ্বারা লালিত এই দুই দর্শন মূলত নীতি দর্শনই। দুই দর্শনেই নৈতিক ভাবনার প্রণোদন আধ্যাত্মিক উত্তরণ। আত্মসুখ লাভের পথকে মসৃণ করার লক্ষ্যে বা রাজশাসনকে মান্যতা দেওয়ার ছলে এই দুই সম্প্রদায় কোনোটিই নীতিভাবনার পাঠ দেয়নি। যাপিত জীবনে স্বতঃত তীব্রভাবে অনুভূত যে দুঃখরাজি সেই দুঃখের আত্যন্তিক পরিসমাপ্তি জৈন ও বৌদ্ধাচার্যদের কাছে একান্ত অভিলষিত। এই দুঃখ নিরাশের উপায় হিসেবে কৃচ্ছসাধনের পথনির্দেশ। জাগতিক ঘটনারাজির পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে আপন দুঃখ চিরতরে বিদুরিত করা যে অসম্ভব তা চার্বাক ভিন্ন প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় বিশ্বাস করে। তাই যোগাভ্যাস আত্মসংযম ও বৈরাগ্যর পথে দুঃখকে সহনীয় করে তোলার এবং তাকে জয় করার নিদান দেওয়া হয়েছে প্রায় প্রতিটি ভারতীয় দর্শনে। প্রশ্ন হল এই চিত্তশুদ্ধি ও দুঃখ জয়ের পথে কোন ঐশী সত্তায় বিশ্বাস অপরিহার্য কি না? জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন এরকম কোন অতিলৌকিক সত্তায় আস্থা স্থাপনকে নীতি বা ধর্মের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বলে গণ্য করে না। সত্যের দিশারী হিসাবে তীর্থঙ্করদের দেখেছে জৈন সম্প্রদায়। ঋষভদেব থেকে যে পরম্পরার সূত্রপাত তার পরিসমাপ্তি মহাবীরে। এই চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের উপদেশগুলিকে মননে ও যাপনে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করাই জৈনদের জীবনাদর্শ। সম্যক দর্শন অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের উপদেশকে গ্রহণ, সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ সেগুলির সম্যক উপলব্ধি এবং সম্যক চরিত্র অর্থাৎ সম্যক আচরণের মধ্য দিয়ে সেগুলির প্রকাশ। এই

তিনকে রত্ন হিসাবে ধারণ করাই জৈনদের একমাত্র ব্রত। সেই ব্রত উদযাপন করতে গিয়ে অহিংসা, সত্য অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ এই আদর্শ গুলিকে জীবনযাপনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন তারা। কি শ্রমণ কি গৃহী স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রত্যেকেই এই নৈতিক নিয়মশৃঙ্খলা গুলির অনুসারী হয়েছে। একইভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে বুদ্ধবচনই নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা। যে সকল সত্য বোধিদ্রুমের পদমূলে তপস্যারত ঋষির মানসপটে উদিত হয়েছিল সেগুলিকে সারসত্য হিসাবে মান্যতা দিয়েছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু থেকে ভিক্ষুণী। প্রজ্ঞা শীল সমাধির যে মার্গ অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব বলে তথাগত তার আর্যসত্যে ব্যক্ত করেছেন সেই পথ লক্ষ্য করে অগ্রসর হয়েছেন আপামর বৌদ্ধসমাজ। পঞ্চশীল, ব্রহ্মবিহার এবং বৌদ্ধসাহিত্যে উপদিষ্ট সকল নৈতিক নিয়ম গৌতম উপদিষ্ট বা অভিপ্রেত হিসাবে গৃহীত ও পালিত হয়েছে। মহাজ্ঞানী বুদ্ধকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরাসনে বসাতে কার্পণ্য করেন নি কোন কোন অনুগামী। তাই তাদের কাছে বুদ্ধবচন আসলে ঈশ্বরবচন। কান্ট যেমন নৈতিক নিয়মকে বিবেকের নির্দেশ বলেছেন তেমনি বৌদ্ধ পরম্পরায় নৈতিক নিয়ম হয়ে দাড়িয়েছে মহাবুদ্ধের অনুজ্ঞা।

এবার ফেরা যাক নিরীশ্বরবাদী দুই আস্তিক সম্প্রদায়ের নীতি দর্শনের আলোচনায়। মীমাংসা ও সাংখ্য দুই দর্শনেই নৈতিক জীবন যাপনের উপদেশ রয়েছে। এর মধ্যে মীমাংসা দর্শন মূলত কর্মের দর্শন বা কর্মমীমাংসা। কোন কাজ করণীয় বা বিধি কোন কাজ কর্তব্য নয় বরং নিষিদ্ধ তারই পাঠ দেওয়া হয়েছে জৈমিনির দর্শনে। শিখধর্ম যেমন গ্রন্থসাহেবকে প্রায় ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে তেমনি মীমাংসা দর্শন বেদকে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম’ হিসেবে মেনেছে। যা বেদ অনুমোদিত তাই কর্ম বা ধর্ম; আর যা বেদবিহিত নয় তা নিষিদ্ধ বা অধর্ম। এভাবে ধর্মাধর্মের পাঠ বেদ থেকেই গ্রহণ করেছে মীমাংসা সম্প্রদায়। প্রশ্ন হল এভাবে বেদ নির্দিষ্ট পথে

জীবনযাপনের প্রণোদন কি? মোক্ষবাদী দর্শন হিসেবে মীমাংসা দর্শনও দুঃখ থেকে একান্তমুক্ত হওয়ায় বৈদিক পথে জীবন যাপন একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু বেদকে ধর্মাধর্ম পাপপূণ্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে মান্যতা দেওয়ার হেতু কি? এখানে ন্যায় বৈশেষিকরা হয়তো ঈশ্বর রচিত হওয়ার কারণে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রামাণিক হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু মীমাংসা মতে বেদ অপৌরষেয় এবং নিত্য। বেদ যেমন নিত্য তেমনি তা স্বতঃপ্রমাণ। স্বতঃপ্রমাণ সেই বেদের বিধি ও নিষেধকে মান্যতা দিয়ে জীবনযাপন মীমাংসা মতে মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ। কাজেই এই দর্শনে নৈতিক জীবন যাপন পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস নিরপেক্ষ।

এখানে সাংখ্যের অবস্থান মীমাংসা হতে অনেকাংশে পৃথক। আপাতভাবে নিরীশ্বরবাদী হিসাবে সাংখ্যের পরিচিতি হলেও প্রাচীন সাংখ্যাচার্যদের কেউ কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। এমনকি সাংখ্যের সমানতন্ত্র হিসেবে যে যোগ দর্শনের পরিচিতি সেখানে ঈশ্বর বিশ্বাসকে নৈতিক জীবন যাপনের প্রতিসঙ্গী হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তাই সাংখ্যের নৈতিকতা ঈশ্বরবিশ্বাস নিরপেক্ষ বলে অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে নৈতিক জীবনের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের যোগ আবশ্যিক নয় বরং আকস্মিক। প্রথমে একথা মনে রাখতে হবে যে সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, যুক্তিদীপিকা প্রভৃতি উপলব্ধ গ্রন্থগুলিতে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিবরণ রয়েছে সেখানে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। সাংখ্যতত্ত্ববিদ্যায় প্রকৃতি হতে জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্যকে গুণ বৈষম্য তথা অভিব্যক্তির নিমিত্ত হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। বন্ধন হতে জীবের মুক্তির যে প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে সেখানেও ঐশী করুণার কথা ব্যক্ত হয়নি। একথা ঠিকই যে সাংখ্যসূত্র হিসেবে যে

গ্রন্থটি প্রচলিত সেখানে প্রাচীন সাংখ্যসম্মত কালের উল্লেখ রয়েছে।[১] তাছাড়া বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যের মঙ্গলাচরণে ঈশ্বর প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু সাংখ্যসূত্র হিসেবে পরিচিত গ্রন্থটিকে অনেক বিদ্বানই সাংখ্যের মূলগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করেন না। তাদের কাছে বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত সাংখ্যের মূল ধারার অভিমত নয়।

তবে সেশ্বর সাংখ্য যোগদর্শন স্পষ্টতই ঈশ্বরবাদী। যোগের যে অষ্টাঙ্গ পাতঞ্জল সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে সেখানে পঞ্চবিধ নিয়মের মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধানকে রাখা হয়েছে। বৈরাগ্য ও শৃঙ্খলার কঠিন পথে উত্তরণে কারোর আশ্রয় বা প্রশ্রয়ের প্রয়োজন ,এই বিবেচনা থেকে মুমুক্ষুকে সর্বকর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে নিষ্কম্প হৃদয়ে অগ্রসর হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ঈশ্বরবাদীরা নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ হিসাবে ঈশ্বর বিশ্বাস অপরিহার্য বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সাবেকি ঈশ্বরে বিশ্বাসের সঙ্গে এই ঈশ্বর বিশ্বাস এক নয়। সচরাচর ঈশ্বরবাদীরা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বভূ, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্তা, জীবের নিয়ন্তা, কর্মফলদাতা। কিন্তু যোগের ঈশ্বর পুরুষের অতিরিক্ত কিছু নয়। সেই পুরুষ হয়ত ক্লেশ কর্ম বিপাক ও আশয় থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে সাধারণ পুরুষ থেকে উচ্চস্তরে। কিন্তু জগতের সৃষ্টিতে তার কোনো ভূমিকা নেই। দুর্বল জীব যে আপন বিবেচনায় এবং স্থৈর্য্যে পথ চলতে অক্ষম তার ক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রণিধানের পথটি নির্দেশ করা হয়েছে। জার্মান দার্শনিক কান্ট যেমন নৈতিক জীবনের তিন পূর্বাঙ্গের মধ্যে আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতার পাশাপাশি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে রেখেছেন সেভাবে ইপ্সিত সমাধির পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বর প্রণিধানকে একটি পথ হিসাবে দেখা হয়েছে যোগ দর্শনে। এই পথ

[১] "ন কালযোগতা ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ।" *সাংখ্যপ্রবচন সূত্র-* ১২।

যে সকলের জন্য নয় মানসিক ও দৈহিকভাবে দুর্বল মুমুক্ষুর কাছে একটি বিকল্প হিসাবে পথটিকে রাখা হয়েছে তার একটি স্পষ্ট ঈঙ্গিত আমরা পাই পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদের ২৩ নম্বর সূত্রে।[২]

ওই সূত্রে বলা হয়েছে 'ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা'- এর যথার্থ মর্মার্থ গ্রহণ করলে বোঝা যায় শাস্ত্রীয় পথের পরিবর্তে কেউ যদি ঈশ্বরপ্রণিধানের পথ গ্রহণ করে তাহলে সে সফল হতে পারে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধের যে পথ তাই যোগ শাস্ত্রীয় সমাধির পথ। রাজস তামসবৃত্তি তিরোহিত হয়ে সাত্ত্বিক বৃত্তি স্থিত হওয়ার লক্ষ্যে যত্নবান হওয়াই অভ্যাস। যম নিয়মাদির দ্বারা এই প্রযত্নের সঞ্চার হয়। সমস্ত সুখের সামগ্রী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রতি আসক্ত না হওয়ার অবস্থা হল বৈরাগ্য। পর বৈরাগ্য দ্বারা নির্বিষয় হলে চিত্তবৃত্তির যে নিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এটি আসক্তির নিষেধ মাত্র নয় বরং জীবন মুক্তির এক অবস্থা। এই জ্ঞানের প্রসাদের অবস্থায় রজ ও তম গুণের সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটে। এই পথে যারা সমাধি লাভ করতে সক্ষম তাদের ঈশ্বরপ্রণিধানের পথ গ্রহণ করতে হয় না। কিন্তু একই পথে পরিক্রমা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। যে দুর্গম পথে অভিযাত্রী দল সহজে ভ্রমণ করেন সাধারণের কাছে সে পথ দুর্গম হতে পারে তাই বিকল্প পথের নির্দেশ থাকে। সেই হিসাবে পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রণিধানকে একটি বিকল্প পথ হিসাবে দেখিয়েছেন। এদিক থেকে দেখলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে নীতিনিষ্ঠ জীবন পালনের অপরিহার্য পূর্বাঙ্গ বলা যায় না।

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে তা থেকে এ কথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় যে নৈতিক জীবন যাপনের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের সম্বন্ধটি আপতিক। কিন্তু এই ধারণা সর্বসম্মত নয়। এমন বহু মনীষী রয়েছেন যারা ঐশী সত্তায় বিশ্বাস নিরপেক্ষ নৈতিকতা স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে

---

[২] "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা।"- পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, সূত্র- ২৩।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ কেন ধার্মিক বা নৈতিক হবে তার পটভূমি তিনি সন্ধান করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন মানুষ ধর্মের জীবনের শরিক হয় একটি আন্তরিক ইচ্ছা দ্বারা তাড়িত হয়ে। এই ইচ্ছাটি হলো ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়া। আজন্ম প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হলেও প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করা একটি মর্মন্তুদ বাসনা তার রয়েছে। শুধু বাহ্য প্রকৃতির বন্ধন থেকে নয়, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যের মত অন্তরের বন্ধন থেকে মুক্তি খোঁজে সে। এই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে গিয়ে সে এমন একটি সূত্রের সন্ধান করে যা ইন্দ্রিয়ের পরিধিকে অতিক্রম করে যায় যাকে এক কথায় অলৌকিক বলা যায়। এই অলৌকিকে বিশ্বাস বা আস্থা জ্ঞাপন না করে তারপক্ষে মুক্তিলাভ সেই সঙ্গে নৈতিক জীবনে পদার্পণ সম্ভব হয় না।

অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ছাড়া যে নৈতিক জীবন সার্থক হতে পারেনা সেই অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বৌদ্ধিক নৈতিকতার যে দাবি উপযোগবাদীরা করে থাকেন তাকে নস্যাৎ করেন স্বামীজি। পাশ্চাত্য উপযোগবাদীরা মনে করেন যে নৈতিক জীবন যাপনের জন্য কোন ঐশ্বরিক বা অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধিকে প্রয়োগ করে সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক মঙ্গল [Greatest good of the Greatest Number] এই নীতিকে খুঁজে পেতে পারে মানুষ। আর এভাবেই ক্ষুদ্র আত্মসুখের গণ্ডিকে অতিক্রম করে পরকল্যাণের মহান আদর্শে উপনীত হতে পারে সে। কিন্তু কোন অলৌকিকে বিশ্বাস ছাড়া পরকল্যাণের আদর্শে মানুষ উদ্বুদ্ধ হতে পারে না বলে স্বামীজীর বিশ্বাস। একথা স্পষ্ট করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন- ‘হিতবাদের (বা প্রয়োজনবাদের) আদর্শ মানুষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ প্রথমত প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না। অলৌকিক অনুমোদন

অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি, তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না'[৩]।

শুধু স্বামীজি নয় অরবিন্দ মনে করেন যে উচ্চভূমিতে উত্তরণের আদর্শ ছাড়া নৈতিক ক্রিয়াকর্ম মানুষের মধ্যে দেখা দিতে পারে না। সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ করার যে মহতী বাসনার কথা উপযোগবাদীরা বলে থাকেন সেই মহৎ বাসনার উৎসভূমি কী হবে? এ ব্যাপারে নিরীশ্বরবাদী ভারতীয় দার্শনিকরা হয়ত মুক্তিলাভের বাসনার কথা বলেন। কিন্তু শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে এই মুক্তির অবস্থা সুখের অবস্থারই রকমফের মাত্র। কাজেই মোক্ষকে নৈতিক জীবনে প্রণোদন হিসাবে দেখলে এক ধরনের সুখবাদকে আহ্বান করা হয়। এই সুখের অতিরিক্ত নৈতিক জীবনের অন্য কোন প্রণোদন থাকা দরকার। যে পর্যন্ত না আধ্যাত্মিক যাত্রার সঙ্গে এর যোগসূত্রটি উপলব্ধ হচ্ছে সে পর্যন্ত এই যাত্রা তার সার্থকতা লাভ করতে পারে না। বহুত্ববাদী ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেও এই আধ্যাত্মিক উত্তরণের যাত্রাটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে অরবিন্দের কাছে। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দের অভিমত হল- "অপূর্ণ হইলেও মানব মনে ধর্ম আধ্যাত্মিক আবেগের প্রাথমিক প্রকৃতিগত রূপ বলিয়া আধ্যাত্মিক আদর্শ স্থাপন এবং তদ্দ্বারা জীবনকে অধিকার করিবার প্রবল চেষ্টার প্রাবল্য উপস্থিত হইলে জীবনের প্রত্যেক ঘটনা ধর্মভাব দ্বারা পূর্ণ করিবার ভাবনা কার্য ধর্মের ছাঁচে ঢালাই করিবার প্রয়োজন ও প্রচেষ্টা আসিয়া পড়ে; তখন ধর্ম ও দর্শনের ব্যাপক মিলনজাত এক সংস্কৃতি স্থাপনের প্রয়োজন হয়"[৪]। তাঁর বিশ্বাস– "ভারতীয় মনের কাছে মতগত পার্থক্যগুলি, সকলের মধ্যস্থিত একই আত্মা ও ঈশ্বরকে দেখিবার বিভিন্ন

---

[৩] স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা* (তৃতীয় খন্ড), পৃ. ১২৪।

[৪] শ্রী অরবিন্দ, *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি*, পৃ. ১৫৬।

উপায় ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মোপলব্ধি একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু; অন্তরস্থ চিৎপুরুষের দিকে নিজেকে খুলিয়া ধরা, অনন্তের মধ্যে বাস করা, শাশ্বত বস্তুকে খোঁজা ও আবিষ্কার করা, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়া- ইহাই হইল ধর্মের সাধারণ ধারণা ও লক্ষ্য, ইহাই আধ্যাত্মিক মুক্তির অর্থ, ইহাই সেই জীবন্ত সত্য যাহা জীবকে মুক্ত ও সার্থক করিয়া তোলে"।[৫]

আত্ম উপলব্ধি ও অনন্তের অভিমুখে যাত্রা ছাড়া যে ধর্মাচার বা নৈতিক আচরণ সম্ভব হতে পারে না সেকথা বোঝাতে গিয়ে শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির উপরে গুরুত্ব দিয়ে যারা নৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা দিতে চান সেই উপযোগবাদীদের কঠোর মন্তব্যে বিদ্ধ করেন শ্রীঅরবিন্দ। মঙ্গলের যে ধারণা সর্বাধিক্য ঘটাতে তৎপর সেই মঙ্গলের ধারণাটিকে খ্রিস্টীয় পরম্পরা থেকে তাদের ধার করা বলে দাবি করেন অরবিন্দ।

এই অবধি যে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তা থেকে উপলব্ধ হয়েছে যে নৈতিকতাবোধ ও নৈতিক আচরণের উৎসভূমি বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মত রয়েছে। কেবল ঐশীতত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাস ছাড়াই নৈতিকতার পাঠ ও তার প্রয়োগ সম্ভব বলে যেমন কোন কোন সম্প্রদায় মনে করেন তেমনি আধ্যাত্মিক উত্তরণ এবং অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস ছাড়া নৈতিক জীবন যাপন ও তাঁর যুক্তিযুক্ততা খুঁজে পেতে পারে না বলে মনে করেন অনেকে। এমতাবস্থায় একতরফাভাবে কোন একটি পক্ষের দাবিকে মান্যতা দেওয়া সমস্যার। এ কথা ঠিক যে কোন অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে কেন একজন মানুষ ধর্মাচরণ করবে তার ব্যাখ্যা পাওয়া সহজ হয়। বিশেষত সাধারণ মানুষ যারা তত্ত্বের গভীর আলোচনায় অপটু বা অনাগ্রহী তাদের কাছে অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস নৈতিক জীবনে অনুসারী হওয়ার পথে যে একটা

[৫] তদেব, পৃ. ১৬৩।

বড় ভূমিকা পালন করে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মোহাবিষ্টের মত কোনরূপ বিচার ছাড়াই ঐশী সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠা বা কোন বিশেষ ধর্মসম্মত অনুশাসন আচরণে প্রকাশ করা নৈতিক বলে গণ্য হতে পারেনা। যদিও বিশ্বাসী মানুষের চোখে 'বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা' তথাপি বৌদ্ধিক বিচার ছাড়া ধর্মাচরণ সময় সময় অধর্মের অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরণের ধর্মকে মার্ক্সসের মত চিন্তাবিদরা 'জনগণের আফিম' বলে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই অবিচারিত ধর্মের অনুশীলনকে প্রকৃত ধর্ম বলে অনুমোদন করেননি তিনি লিখেছেন– "আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলে ভ্রম করি- কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহন মাত্র। এই প্রকার ধর্ম যখন সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্ত অসাড়তায় নয় অভ্যস্থ সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে"[৬]।

সুতরাং বিশ্বাসসর্বস্ব ধর্মের তথা নৈতিকতার যে একটা বিপদের দিক রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত তথাকথিত সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির অনুগামীরা ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই দিয়ে যে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত করে চলেছেন সেগুলি যে নৈতিক বিচারের অনুমোদনযোগ্য নয় তা সুধীজন মাত্র স্বীকার করবেন। আর এই বিষয়টি থেকে স্পষ্ট হয় যে শুধু আধ্যাত্মিক শক্তির দোহাই দিয়ে কোন কর্মকে নৈতিক বলে গণ্য করা যায় না। যা ঈশ্বরাবিষ্ট তাই যদি নৈতিক বলে বিশ্বাস করা হয় তাহলে হিংসা দ্বেষ,নিষ্ঠুরতা, পরশ্রীকাতরতা, কপটতা ইত্যাদি নৈতিক বলে গণ্য হয় না কেন? যদি ওইসব প্রবৃত্তি ঈশ্বর ইপ্সিত হয় বা তার অন্তরালে অতীন্দ্রিয়ের অনুমোদন থাকে তাহলে উল্লেখিত ক্রিয়া গুলি ধর্ম ও নীতিসম্মত বলে মেনে নিতে বাধা থাকার

[৬] রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪৪৮।

কথা নয়, অথচ বাধা তো থাকে। এখানে ঈশ্বরবাদীরা হয়তো বলবেন যে তথাকথিত অনৈতিক ক্রিয়াগুলি ঐশী সত্তার দ্বারা ইপ্সিত হতে পারে না। পরম মঙ্গলময় ন্যায় পরায়ণ যে ঈশ্বর তিনি নিষ্ঠুরতা, হিংসা এসব আচরণকে অনুমোদন করতে পারেন না। কিন্তু এ ধরনের সাফাই জনপ্রিয় হলেও ঘটনাসম্মত নয়। একটা সময় ছিল যখন মানুষ অতীন্দ্রিয় সত্তা হিসেবে ঈশ্বরের ধারণায় প্রত্যয়ী ছিল কিন্তু সেই ঈশ্বরকে দেখত নিজ গোষ্ঠীর দেবতা হিসেবে। এই গোষ্ঠীগুলো যে সব দৈবিক সত্তায় বিশ্বাসী ছিল সেই ঈশ্বর গোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায় অনুমোদন করলেও গোষ্ঠীর বহির্ভূত মানুষের কাছে এক ভয়ংকর বিভীষিকা হিসেবে প্রতিভাত হয়। পরবর্তীকালে মানুষ তার বিচারবোধ থেকেই এই উপলব্ধি লাভ করে যে অন্য গোষ্ঠীর প্রতি অন্যায় আচরণ কখনোই নৈতিক হতে পারেনা। এই বিচারবোধ পরবর্তীকালে সর্বতোভাবে মঙ্গলময় সর্বজন ন্যায়কারী ঈশ্বরের ধারণার জন্ম দেয়। সুতরাং বিচারবোধের সঙ্গে নৈতিকতার যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাসকে অবলম্বন করে নৈতিকতা পল্লবিত হওয়ার এই ঝোঁক কেন? এক বাক্যে এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে অধিকাংশ মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল। নিজেকে বিচারশীল প্রাণী বলে জানলেও জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সেই বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের দ্বারা পরিচালিত হতে সে পারেনা। প্রায় ক্ষেত্রেই তার আচরণ আবেগ অনুভূতি ও জনপ্রিয় বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন সাম্প্রদায়িক পরম্পরা মেনে সে কোন আচরণ করবে তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে এসে এমন একটা আখ্যান খাঁড়া করে যা তার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধির অনুমোদন করে না। শুধু সাধারণ মানুষ কেন দার্শনিক পরম্পরাতেও এমনটা ঘটেছে। জড়বাদ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবাদের যে ধারা চার্বাক প্রবর্তন করেছিল

তার অনেকখানি স্থিমিত হয়েছে তথাকথিত সুশিক্ষিত চার্বাকদের মধ্যে। নৈয়ায়িকদের ষোড়শতত্ত্ব ও বৈশেষিকদের সপ্তপদার্থ বিভাজনে পৃথকভাবে ঈশ্বরের উল্লেখ নেই অথচ টীকাকারদের রচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিচারসহ করে তোলার মরিয়া চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্যের দ্বৈতবাদে জগতকে বুদ্ধিস্থ করার যে বিশুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী প্রয়াস ছিল অদ্বৈতির সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে তাই অনেকখানি ঈশ্বরবাদী হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানভিক্ষুর হাতে। পদার্থবিদ নিউটনকে ঈশ্বরবাদী হিসেবে দেখার চেষ্টা, নিউট্রিনোকে ঈশ্বরকণা হিসেবে অভিহিত করা এসব থেকে স্পষ্ট হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকে অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ঘটনাকে আখ্যান্যের সঙ্গে যুক্ত করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বরবাদী নাকি নিরীশ্বরবাদী কোন ব্যাখ্যার সঙ্গে নৈতিক চিন্তা ও আচরণ বিশেষভাবে মানানসই? দার্শনিক বিচার এই দুইয়ের কোনটিকে সমর্থন করে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প এসে হাজির হয় তখন সচরাচর কোনটির ব্যাখ্যা ক্ষমতা বেশি তা খতিয়ে দেখা হয়। যে প্রকল্প অধিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে সেটি গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয় বিজ্ঞানে। সে দিক থেকে দেখলে নৈতিকতার ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যা জনপ্রিয় হওয়ায় এটি বেশী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশের স্বীকৃতি সব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার নির্ণায়ক হয় না। টলেমির ভুকেন্দ্রিক আবর্তনের তত্ত্ব তার প্রমাণ। তাছাড়া অন্তত কিছু ক্ষেত্রে যদি ঈশ্বরবিশ্বাস নিরপেক্ষ ভাবে নৈতিক বিচার উন্মেষিত হতে দেখা যায় তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাস কে আর নৈতিকতা বোধের অনিবার্য পূর্বাঙ্গ বলে গণ্য করা যায় না। ভারতীয় ঐতিহ্যে ব্যক্তি ভেদে মুক্তির নানা পথ স্বীকৃত হয়েছে কোথাও জ্ঞান, কোথাও কর্ম, কোথাও ভক্তি, কোথাও বা অন্য কোন পথে মোক্ষলাভ সম্ভব বলে গীতাকার থেকে শুরু করে স্বামীজি সকলেই

এই মত পোষণ করেছেন। এই পরম্পরাকে বজায় রাখলে ব্যক্তিভেদে নৈতিকতার ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দুটি ব্যাখ্যাই বৈকল্পিকভাবে গ্রহণ করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

অলকা তপস্বী, *থেরীগাথায় নারীজীবন*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৬।

ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা*, পুর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু শর্মা (অনুঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০০৭।

উমাস্বাতী, *তত্ত্বার্থসূত্র*, কে. কে দীক্ষিত (অনুঃ), আহমেদাবাদ, লালভাই দলপতভাই ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির, ২০০০।

কুমারিল ভট্ট, *শ্লোকবার্তিক*, গঙ্গানাথ ঝা (অনুঃ), শক্তিনগর, দিল্লী, শ্রীসদগুরু পাবলিকেশন, ১৯৮৩।

গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা, কলকাতা একাডেমি, ১৯৯৩।

ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, *শ্রীগীতা*, কলকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ২০২৪।

ঘোষাল, শিখা, *কান্টের নীতি দর্শন*, কলকাতা, ভারতীয় দর্শন পীঠ, ১৯৯৯।

চক্রবর্তী, মালবিকা, *নৈতিকতা এবং নিরীশ্বরবাদ*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৮।

চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ, *সমগ্র সাংখ্যসমীক্ষা*, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৯।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন*, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৫।

চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, *প্রসঙ্গ বৌদ্ধদর্শন*, কলকাতা সূত্রধর, ২০২৪।

চৌধুরী, সুকোমল, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৪।

চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদিত) *ভারতীয় ধর্মনীতি*, কলকাতা, এলাইড পাবলিশার্স সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী*, অমিত ভট্টাচার্য (অনুঃ), কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬।

ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ*, চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য (অনুঃ), কলকাতা, সাহিত্য একাডেমী, ২০০৭।

পুরকায়স্থ, বিজনবিহারী, *ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ*, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সী, ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ, *ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ*, অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ৬২বি হিন্দুস্থান পার্ক, ১৯৫৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩।

বসু, অরবিন্দ, *ধর্মদর্শন পরিচয়*, কলকাতা, মিত্রম, ২০১৪।

বসু, চারুচন্দ্র, *ধম্মপদ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১০।

ভট্টাচার্য, অভিজিৎ, *জৈন তত্ত্বচেতনায় দার্শনিক চিন্তার স্বরূপ*, কলকাতা, মিত্রম, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, অমলেশ, *মহাভারতের কথা*, কলকাতা, আর্যভারতী, ১৯৮৫।

ভট্টাচার্য, অমিত, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলকাতা, জেনারেল পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, কলিকাতা, কলকাতা প্রকাশক, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০২৪।

ভট্টাচার্য, সুখময়, *পূর্বমীমাংসা দর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০০৬।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *দেবতার মানবায়ন*, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৮।

ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাঃ), *দীঘনিকায়*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১১।

ভিক্ষু সুমনপাল (সম্পাঃ), *মধ্যম নিকায়*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৮।

মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪।

মহর্ষি কপিল, *সাংখ্যদর্শনম্* (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য সহিত), মহেশ্চন্দ্র পাল (সম্পাঃ), কলকাতা, উপনিষদ কার্যালয়, ১৮০৭ শকাব্দ।

মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ) কলকাতা, পঃ বঃ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

মহর্ষি পতঞ্জলি, *পাতঞ্জল দর্শন*, পূর্ণচন্দ্র শর্মা বেদান্তচুঞ্চু (সংকলিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা, *ব্যক্তিচরিত্র ও নৈতিকতা*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৫।

মোহান্ত, দিলীপকুমার, *কতিপয় দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী (সপ্তম খন্ড), বোলপুর, বিশ্বভারতী, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

লৌগাক্ষিভাস্কর, *অর্থসংগ্রহ,* স্বামী ভর্গানন্দ (অনুঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০২৩।

শ্রী অরবিন্দ, *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি,* পন্ডিচেরী, অরবিন্দ আশ্রম, ২০১৫।

সপ্ততীর্থ, ভূতনাথ, *মীমাংসা দর্শনম্* (প্রথম খন্ড), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৭।

সরখেল, রণজিত, *ভারতীয় দর্শনে অনীশ্বরবাদ,* কলকাতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (তৃতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১১।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (দ্বিতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৭।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সঞ্জিত কুমার সাধুখা (সম্পাঃ), কলকাতা, সদেশ, ২০১৬।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (সম্পাঃ), কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০২০।

সাহা, বিশ্বরূপ, *মীমাংসাপরিচয়,* কলকাতা, সংস্কৃতপুস্তক ভান্ডার, ২০০২।

সেন, অতুলচন্দ্র এবং মহেশ্চন্দ্র সেন (সম্পাঃ), উপনিষদ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ২০১৮।

সেনগুপ্তা, জ্যোতি, *সাংখ্যকারিকা,* কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪।

স্বামী বিদ্যারণ্য, *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৯।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা* (তৃতীয় ও সপ্তম খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬।

হালদার(দে), মণিকুন্তলা, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

Bhargava, Dayanand, *Jaina Ethics*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 1968.

Chaterjee, Satischandra, *An Introduction to Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 2016.

Olivelle, Patrick*, Dharma studies in its semantic, cultural and religious history,* Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 2004.

Prasad, Hari Sankar, *Ethics in Buddhism,* Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 2007.

S, Radhakrishnan, *Indian Philosophy* (Vol-1), J.N Mohanty (ed.), Delhi, Oxford university press, 2008.

Sharma, I. C*, Ethical Philosophies of India,* London, George Allen & Unwin LTD, 1965.